







ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭଣ୍ଡୋଭାର୍

ଶିଶୁମାରୀ ଅକାଦେମୀ । କମିକାଇୱା-୧

প্রথম প্রকাশ :

আবণ, ১৩৭৫

বিড়ীয় মূল্য :

অগ্রহাৱণ, ১৩৭৫

তৃতীয় মূল্য :

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬

প্রকাশক :

অজকিশোর মঙ্গল

বিদ্বানী প্রকাশনী

১১এ, বাগোগসী ঘোৰ স্ট্রিট

কলিকাতা-১

মুদ্রক :

শ্বেতমার ভাঙারী

রামকুণ্ঠ প্রেস

৬, শিব বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৬

প্রচন্দ শিল্পী :

অঙ্গীকৃত জুপ

আট টাকা

**There are two tragedies in life.  
One is to lose your heart's desire.  
The other is to gain it,**

**—G. B. S.**



‘ଥାରା କାହେ ଆହେ ତାରା କାହେ ଥାକ୍,  
ତାରା ତୋ ପାରେ ନା ଜାନିତେ  
ତାହାଦେର ଚେଯେ ତୁମି କାହେ ଆହ  
ଆମାର ହୃଦୟଖାନିତେ ।’

ଓଯ়েস্টାର୍ କୋର୍ଟ

ଅନପଥ

ନିଉଡିଲ୍ଲୀ

ଦୋଳାବୌଦ୍ଧ,

ତୋମାର ଚିଠି ପେଲାମ । ଅଶେ ଧର୍ମବାଦ । ତୁମି ଆମାକେ ଭାଲବାସ,  
ମେହ କର । ତାଇତୋ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖ ଆମି ସବ ବୀଧି, ସୁଧୀ ହିଁ । ଏକଟା  
ରାଙ୍ଗା ଟୁକ୍ଟକେ ବୋ ଆସୁକ ଆମାର ଘରେ । ଆମାକେ ଦେଖାଣ୍ମା କରୁକ,  
ଏକଟୁ ଭାଲବାସୁକ, ଆମାର ଜୀବନେର ଏକଟା ଅବଲମ୍ବନ ହୋକ । ତାଇ  
ନା ? ଭାବତେ ବେଶ ଲାଗେ । ଆମାର ଏହି ଛଞ୍ଚାଡ଼ା ଜୀବନେ ଏକଟା  
ଜୁନିଯର ଦୋଳା ଏସେ ଦୋଳା ଦିଲେ ମନ୍ଦ ହତୋ ନା ! ହୟତ ତୀର  
ଆବିର୍ଭାବ ହଲେ ନିଜେର ଜୀବନଟାକେ ନିଯେ ଏମନ ଜ୍ୟୋତିଷତାମ ନା,  
ଭବିଷ୍ୟତ ନିଯେ ଛିନିମିନି କରତାମ ନା । ହୟତ ତୀର ଛୋଯା ପେଲେ  
ବୁକେର ବ୍ୟଥାଟା ମେରେ ଯେତ, ହୟତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତେ ମୁସୌରୀ ବା  
ନୈନୀତାଲେର କୋନ ନାର୍ସିଂହୋମେ ଯାବାରାଓ ପ୍ରୟୋଜନ ହତୋ ନା । ହୟତ  
ଆରୋ ଅନେକ କିଛୁ ହତୋ । ନିଜେର କାହିଁ ଥିଲେ ନିଜେକେ ଏମନଭାବେ  
ଲୁକିଲେ ରେଖେ ପାଲିଲେ ପାଲିଲେ ବେଡ଼ାତାମ ନା । ତାଇ ନା  
ଥାରାବୌଦ୍ଧ ?

সত্য কথা বলতে কি, বিয়ে করতে আমার্স সম্মতি না থাকলেও যদি কোন মেয়ে আমাকে বিয়ে করে তাতে আমার বিশ্বেষ অসম্মতি নেই। বরং বেশ আগ্রহই আছে। আর তাহাড়া আগ্রহ না থাকার কি কারণ থাকতে পারে ?

তুমি তো নিজেই আঠারো কি উনিশ বছর বয়স থেকে খোকনদাকে দোলা দিতে শুরু করেছিলে। ইউনিভার্সিটির ছই গেট দিয়ে ছ'জনে বেরুতে। তুমি ইউনিভার্সিটির দোরগোড়া থেকে ২-বি বাসে চাপতে আর খোকনদা মেডিক্যাল কলেজের পিছন থেকে ন'মন্দর বাসে চাপত। ছ'জনে ছাটি বাসে চাপলে কি হয় ! ছ'জনেই তো মেমে পড়তে লিঙ্গসে স্লীট'এর মোড়ে। ডিসেম্বরের হাড়-কাঁপানো শীতে ফাঁকা দার্জিলিং উপতোগ করেছ তোমরা ছজনে। এসব আমি জানি। আরো জানি তুমি নিজের হাতের কঙ্গ আর গলার মোটা হারটা বিক্রী করেছিলে বলেই খোকনদা অত দিন ধরে রিম্বার্চ করে পি-এইচ-ডি হতে পারল। এমনি করে দোলা দিতে দিতে একদিন অকস্মাত নিজের দোলনায় তুলে নিলে খোকনদাকে।

এসবই তো নিজের চোখে দেখ। আরো অনেককেই তো দেখলাম। মঞ্জুরী, লিপি, কণিকারাই কি কম খেল দেখাল। আমার প্রথম যৌবনের সেই সবুজ কাঁচা দিনগুলিতে তোমরা সবাই আমাকে ঘথেষ্ট ইনফুয়েল করেছিলে। হয়ত আজো সে ইনফুয়েল শেষ হয় নি। আর ঐ অহুরাধা ? কত বড় বড় কথা, কত লেকচার, কত রক্ত-বিতর্ক ! বিয়ে ? সরি ! শেষ পর্যন্ত একটা পুরুষের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য আমাকে শিকার করবে ? নেতার, নেতার, নেতার !

মনে পড়ে দোলাবৌদি ? অহুরাধা শেষকালে চীৎকার করে হেনরি ফিল্ডিং'কে কোটি করে বলত, 'His designs were strictly honourable, as the saying is : that to rob a woman - " her fortune by way of marriage.'

আমাদের সেই অনুরাধাও একদিন বর্ষবানের নীতীশের গল্পালোচনা পরালো। আমি দিল্লীতে ছিলাম না। তাই অনুরাধার আমন্ত্রণ পেতে একটু দেরী হওয়ায় সে দৃশ্টি দেখার স্বয়েগ আমার হয় নি। কিন্তু তাঁর বৌভাত-ফুলশয়্যার দিন আমি বর্ষবান না গিয়ে পারিনি। প্রাচীন কাব্যে আছে অনন্তবৌবনা উর্বশীর ক্যাবারে ভাল্লের ঠেলায় স্বর্গরাজ্যের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের সব কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল। কিন্তু মুনি-খবিদের নাচে উর্বশীয় ধ্যানভঙ্গ? না, পড়িনি। তবে দেখলাম অনুরাধার বেশোয়। একটা ভাঙা জীপগাড়ি, ছটো কনেস্টবল আর একটা পেটমোটা সাব-ইল্সপেক্টরের ঘাড়ে চড়ে আই-পি-এস নীতীশ এমন নাচই নাচল যে, অনুরাধাও ক্লিন বোল্ড হয়ে গেল।

ঐ উৎসবের বাড়িতেই লোকজনের ভিড় একটু পাতলা হলে আমি কানে-কানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অনু, এ কি হলো? ছিঃ ছিঃ। শেষ পর্যন্ত পুরুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিকার হলো?

তুমি তো অনুরাধাকে ভালভাবেই জান। ও তাঙ্গবে কিন্তু মচকাবে না। তাই শেক্সপিয়ারের ‘অ্যান্টনি অ্যাণ্ড লিংগপেট্রা’ থেকে কোট করে বলল, ‘My salad days when I was green in judgement.’

চমৎকার! তোমাদের এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে আমার বিয়ে করার ইচ্ছা হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? মাঝে মাঝেই ভাবি আমিও যদি খোকনদা বা নীতীশের মত.....।

যাকগে ওসব। আছা দোলাবৌদ্ধি, তাছাড়া পাত্র হিসেবে কি আমি খুব খারাপ? বোধ হয় না, তাই না? লেখাপড়া না শিখলেও কলেজে—ইউনিভার্সিটিতে গেছি ক'বছর। খবরের কাগজের স্পেশ্যাল করস্পন্সরেটের চাকরিটাও নেহাত মন্দ নয়। বেশ চটক আছে। মাইনেও নেহাত কম পাই না। বাড়ি না থাকলেও গাড়ি আছে, নায়েব না থাকলেও স্টেনো তো আছে।

তাছাড়া শুনেছি আজকালকার মেয়েরা বিলেত-ফ্রেত হৃষ্ট ছেলেদের বেশ পছন্দ করে। মেয়েদের বাপ-মা স্মার্ট-সফিস্টিকেটেড বলে ঐসব হৃষ্ট ছেলেদের জামাই করতে আপত্তি করেন না। সেদিক থেকে আমি ওভার-কোয়ালিফায়েড! একবার নয়, বহুবার গেছি বিলেত। লোকে বলে হৃষ্টমিও নাকি করেছি।

আরো একটা ব্যাপার আছে। পটলডাঙ্গির গোবিন্দ বিলেত-ফ্রেত বলে বিয়েতে ফিল্মস্টারদের মত ইনক্যাম ট্যাক্স ক্রি দশ হাজার টাকা ব্র্যাকমানি পেয়েছিল। সুতরাং আমার ভবিষ্যতও বেশ উজ্জ্বল মনে হয়। আর তাছাড়া তোমার মত হাই ফার্স্ট-ক্লাশ পাওয়া এজেন্ট যখন আছে! পয়সাওয়ালা বোকা বোকা লোকের একটা উড়ু-উড়ু মেয়ে শিকার করা অধ্যাপিকা দোলা সরকারের পক্ষে নিশ্চয়ই খুব কষ্টকর নয়।

তবে তার আগে মেমসাহেব উপাধ্যানটা তোমাদের সবার জেনে নেওয়া দরকার। আমার ঠি কালো মেমসাহেবকে নিয়ে তোমরা অনেকদিন হাসি-ঠাণ্টা করেছ। হয়ত কিছু ধারণাও করেছ মনে মনে। শুধু তুমি কেন, অনেকের মনেই আমার মেমসাহেবকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন। কেউ-কেউ ভাবে মেমসাহেব বলে কেউ নেই। পুরোটাই গুল, ফোরটোয়েন্টি। আবার কেউ-কেউ ভাবেন মেমসাহেবকে আমি শুধু ভালবাসিনি, বিয়েও করেছি। নানা ধরনের নানা লোকজনের কাছ থেকে মেমসাহেব সম্পর্কে চিঠিপত্রও কম পাই না।

যার সঙ্গেই নতুন আলাপ হয়, তিনিই প্রশ্ন করেন, মেমসাহেব কে? ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ী সবারই ঠি এক প্রশ্ন। এইত কদিন আগে দিল্লী ইউনিভার্সিটির এক তত্ত্ব-শ্যামার সঙ্গে আলাপ হলো। বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ছটে থিন-এরাকুট বিস্কুট, একটা প্যাড়া সন্দেশ আর এক কাপ চা দিয়েই মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, মা জানতে চাইছিলেন মেমসাহেবের আসল নাম কি?

বছরখানেক আগে সিউড়ি থেকে এক বৃক্ষ পাশ্চেল করে একটা  
লাল টুকুটকে সিঙ্গের শাড়ী পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে একটা ছোট  
চিঠি ছিল। লিখেছিলেন, তোমার মেমৰোকে এই শাড়ীটা আশীর্বাদ  
পাঠাচ্ছি। বিদেশী মেমকে এই শাড়ীটা পরলে ভালই লাগবে।  
মাত্তুল্য স্নেহাতুর বৃক্ষাকে আমি লিখেছিলাম, মা, শাড়ীটা আপনি  
সাবধানে রেখে দিন। সময় মত আপনার মেমৰোকে নিয়ে শুধানে  
গিয়েই শাড়ীটা গ্রহণ করব।

মেমসাহেবকে নিয়ে আরো কত কি কাণ্ডই হয়! তাইতো  
এবার ভেবেছি তোমাদের সঙ্গে এমন করে আর লুকোচুরি না থেকে  
পুরো ব্যাপারটাই খুলে বলব। তাছাড়া আমার জীবনের এইসব  
ইতিহাস না জানলে তোমার পক্ষে ঘটকালি করারও অস্বিধা হতে  
পারে। তোমাকে সব কিছু লেখার আগে নৈতিক দিক থেকে  
মেমসাহেবের একটা অভ্যন্তি নেওয়া দরকার। কিন্তু আজ সে  
এতদূরে চলে গেছে যে, তাঁর অভ্যন্তি যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব।  
আর হ্যাঁ, তাছাড়া ঠিকানাটাও ঠিক আমার জানা নেই।

## তুই

মনে হলো তুমি আমার চিঠি পড়ে ঘাবড়ে গেছ। গত চিঠিতে  
বিশেষ কিছুই লিখি নি, এমন কি গৌরচন্দ্রিকাও পূর্ণ হয় নি।  
স্বতরাং এখনই নার্ভাস হবার কি আছে? তাছাড়া তুমি না মেঝে?  
অন্যের প্রেমের ব্যাপারে তোমাদের তো আগ্রহের শেষ নেই।  
শিক্ষিতাই হোক, আর অশিক্ষিতাই হোক, প্রেমপত্র সেলুর করতে  
মেঝেরা তো শিরোমণি! ইউনিভার্সিটির জীবনে তো দেখেছ  
লেকচার শোনা, কফিহাউসে আজ্ঞা দেবার মত অস্তদের প্রেমপত্র  
হাত করাও প্রায় সব মেঝেদের নিত্যকার কাজ ছিল। গুণ্ঠামে

যাও, সেখানেও দেখবে পারল-বৌদির চিঠি অঞ্জপূর্ণা-ঠাকুরবি না পড়ে কিছুতেই ছাড়বে না। শুনেছি স্কুল-কলেজে মেয়েদের চিঠি এলে দিদিমণিরা একবার চোখ না বুলিয়ে ছাড়েন না। ছাত্রীদের অভিভাবকত্ব করবার অচিলায় চুরি করে প্রেমপত্র পড়াকে কিছুটা আইনসম্মত করা যেতে পারে মাত্র ; কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

তাছাড়া প্রেমের কাহিনী জানতে মেয়েদের অরুচি ? কলিকালে না জানি আরো কত কি দেখব, শুনব। মেয়ের বিষে হলে মা পর্যন্ত জানতে চান, হঁয়ের খুকী, জামাই আদর-টাদর করেছিল তো ? হাজার হোক মা তো ! ঠিক খোলাখুলিভাবে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। তাই যুরিয়ে আদর-টাদর করার খবর নেন। বাসরঘর তো মাসি-খুড়ি থেকে দিদিদের তিড়ে গিজ-গিজ করে।

আর সেই সতী-সাবিত্রী সীতা-দময়ন্তী থেকে শুরু করে আমাদের মা-মাসিরা যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধর্জা বহন করে এনেছেন, শত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ করে যে ঐতিহ্যের ধারা অঞ্চল রেখেছেন, আজ তুমি সেই মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে, আমি তাবতে পারিনি।

সর্বোপরি আমি যখন নিজে স্বেচ্ছায় তোমাকে সব কথা বলছি, তখন তোমার লজ্জা বা সঙ্কোচের কি কারণ থাকতে পারে ? আর তোমাকে ছাড়া আমার এই ইতিহাস কাকে জানাব বলতে পারো ? তুমি আমার থেকে মাত্র এক বছরের সিনিয়র হলেও তোমাকে আমি সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি। খোকন্দার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা যেদিন থেকে আবিষ্কার করেছি সেইদিন থেকেই তুমি আমার দোলাবৌদি হয়েছ। ছাত্রজীবনের সেই শেষ দিনগুলিতে আর আমার কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে তুমি আর খোকন্দা যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছ, সহাহৃতি জানিয়েছ, তার তুলনা হয় না। তাইতো জীবনের সমস্ত সুখে-দুঃখে প্রথমেই মনে পড়ে তোমাদের।

মেষসাহেবের ব্যাপারটা ইচ্ছা করেই জানাই নি। তোমরা অবশ্য কিছু কিছু আঁচ করেছিলে কিন্তু খুব বেশী জানতে পার নি। ভগবানের দয়ায় আমি দিল্লী চলে আসায় নাটকটা আরো বেশী জমে উঠেছিল। আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে আর খোকনদাকে একটা সারগ্রাইজ দেব। তাই কিছু জানাই নি। কিন্তু আর দেরি করা ঠিক হবে না। তুমি যখন আমার বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ তখন সব কিছু না জানান অঙ্গায় হবে।

আর শুধু মেষসাহেবের কথাই নয়, আমার জীবনে খেসব মেয়েরা এসেছে, তাদের সবার কথাই তোমাকে লিখব। সব কিছু তোমাকে জানাব। কিছু লুকাব না। আর কিছু না হোক, তোমাকে হলপ করে এইটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি যে, আমার এই কাহিনী তোমার খুব খারাপ লাগবে না। যদি ভাষ্টাচারে একটু এডিট করো, তাহলে হয়ত ছাপা হয়ে বই বেরতে পারে।

স্মৃতরাং হে আমার দোলাবৌদি। ধৈর্য ধর! হে আমার খোকনদার প্রাণের প্রিয় ‘দোলে দোহুল দোলে দোলনা’ দোলা। তোমার ভ্রাতুসম লক্ষণ-দেবরের প্রতি কৃপা কর, তার ইচ্ছা পূর্ণ কর।

### তিনি

সেদিন কি তিথি, কি নক্ষত্র, কি লক্ষ ছিল, তা আমি জানি না। জীবন-মদীতে এত দীর্ঘদিন উজ্জান বইবার পর বেশ বুঝতে পারছি যে সেদিন বিশেষ শুভজগ্নে আমি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখিনি। এই পৃথিবীর বিরাট স্টেজে বিচ্চির পরিবেশে অভিনয় করার জন্য আমার প্রবেশের কিছুকালের মধ্যেই মাতৃদেবী প্রস্থান করলেন। একমাত্র দিদিও আমার জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কেই জামাইবাবুর হাত ধরে শুনুরবাড়ি কেটে পড়ল। আমার জীবনের সেই প্রাগৈতিহাসিক

তিনিটে কপিও পাওয়া গিয়েছিল। নিয়মিত বাসাবদলের দৌলতে ছুটি কপি নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়। তৃতীয় কপিটি দিদির সংসারে কুখ্যাত উইপোকার উদরের জাল। মেটাচ্ছে। মাহুশের জীবনে প্রথম ও প্রধান নারী হচ্ছে মা। তাঁর স্বেহ, তাঁর ভালবাসা, তাঁর চরিত্র, আদর্শ প্রতি পুত্রের জীবনেই প্রথম ও প্রধান সম্পদ। আমি সেই স্বেহস্পর্শ, ভালবাসা ও সম্পদ থেকে চিরবঞ্চিত থেকে গেছি। তাইতো আমার জীবনে নারীর প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধিতে অনেক সময় লেগেছে।

ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে ও আশপাশে কোন বোন বা অন্য কোন নারীচরিত্র না থাকায় মেয়েদের সম্পর্কে আমার শক্তি ও সঙ্কোচ বহুদিন কাটিয়ে শোষণ সম্ভব হয় নি। আমার কৈশোরের সেই সেদিনের কথা মনে হলে আজও হাসি পায়।।।।

তখন ক্লাশ নাইন থেকে টেন'এ উঠেছি। সবে পাখনা গজান শুরু হয়েছে। হাফ প্যাট ছেড়ে মালকেঁচা দিয়ে খুতি পরা থরেছি। ফুলহাতা শাটের হাতা না শুটিয়ে পরলে বোকা বোকা মনে হয়। অঙ্কানন্দ পার্কে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল পেটাতে বেশ আসমানে লাগে। বিকেলবেলার একমাত্র 'রিক্রিয়েশন' হ'চারজন বন্ধু মিলে পাড়ার এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে আড়া দেওয়া। মণ্টুদার বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল, হৃষ্টতা ছিল। ছু'একবার পৌষ-সংক্রান্তির দিন মণ্টুদার মা আমাকে আদর করে পিঠে-পায়েসও খাইয়েছেন। শুনেছি দিদির বিয়ের সময় মণ্টুদাদের বাড়ির সবাই খুব সাহায্য করেছিলেন। ঐ বাড়ির সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল, ওদের পরিবারের অনেক খবরই আমি জানতাম। জানতাম না শুধু নল্লিনীর কথা। ছেটনাগপুরের মালভূমি থেকে মণ্টুদার এই চকলা কিশোরী ভাইবি কবে আকস্মাত মহানগরীতে আবিষ্ট তা হয়েছিলেন, সে খবর আমি রাখিনি। তিনিও যে নাইন থেকে

টেন'এ উঠে মীর্জাপুরের বৌগাপাণি বালিকা বিঠালয়কে ধস্ত করার  
অস্থ কলকাতা এসেছেন, তাও জানতাম না। জানতাম না আরো  
অনেক কিছু। জানতে পারিনি যে চোদ্দ বছর বয়সেই তিনি তার  
জীবন-নাট্যের নায়ক খুঁজতে বেরিয়েছেন। এসব কিছুই আমি  
জানতাম না।

একদিন মণ্টুদাদের বাড়ি থেকে হু' একটা গল্লের বই নিয়ে  
বেঙ্গবার সময় মাথার ওপর একটা কাগজের প্যাকেট এসে পড়ায়  
চমকে গেলাম। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম একটা খাম। নাম ঠিকানা  
কিছুই লেখা ছিল না। শুধু লেখা ছিল, ‘তোমার চিঠি’। তোমার  
চিঠি! মানে আমার চিঠি! মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে গেলাম। হু'এক  
মিনিট বোধহয় থমকে দাঢ়িয়ে ছিলাম। আর একটু হলেই ঢীংকার  
করে মণ্টুদাকে ডাক দিতাম। কিন্তু হঠাতে যেন কে আমার মাথায়  
বুদ্ধি জোগাল। চারপাশটা একনজরে দেখে নিলাম। শুধু বুড়ো  
কাকাতুয়া পাথীটা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। খামটা  
নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলাম। উপরের লেখাটা বারকয়েক  
পড়লাম, তোমার চিঠি। তারপর দৃষ্টিটা দোতলার দিকে শুরিয়ে  
নিতেই কোনার ঘরের জানলায় হাসিখুশিভরা একটা সুন্দরী  
কিশোরীকে দেখলাম।

অনেকদিন আগেকার কথা সবকিছু ঠিক মনে নেই। তবে  
আবছা আবছা মনে পড়ে কি যেন একটা ইশারা করে নব্দিনী  
লুকিয়েছিল। নারী চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা না ধাকলেও  
আমার বুদ্ধতে কষ্ট হয়নি চিঠিটি নব্দিনীরই লেখা।

প্রায় ছুটতে ছুটতে বাসায় এলাম। ঘরের খিল বন্ধ করে চিঠিটা  
একবার নয়, অনেক বার পড়লাম। চিঠির ভাষাটা আজ আর মনে  
নেই কিন্তু ভাবটা একটু একটু মনে পড়ে। কিছুটা উচ্ছ্বাস, কিছুটা  
আবেগ ছিল চপলা কিশোরী নব্দিনীর ঐ চিঠিতে। চিঠিটা পেয়ে  
তালও লেগেছিল, তয়ও লেগেছিল। তার চাইতে আরো বেশী

ଲେଗେଛିଲ ଅବାକ । ଧନୀର ହୁଲାଲୀର ଜୀବନ-ଉତ୍ସବେ ଆମାର ଆମଞ୍ଚଳ ! ଆମାର ମତ ଏକଟା ଭାଙ୍ଗି ଡିଙ୍ଗି ନୌକା ଚଢ଼େ. ନନ୍ଦିନୀ ଜୀବନ-ସାଗର ପାଡ଼ି ଦେବେ ? ଆମି କଲନାଓ କରତେ ପାରିନି ।

ନନ୍ଦିନୀ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଚେଯେଛିଲ କିନ୍ତୁ ଆମାର ସାହସ ହୟ ନି । ଉତ୍ସାହଓ ଆସେ ନି । ଉତ୍ତର ଦିଇନି, ତବୁଓ ଆବାର ଚିଠି ପେଯେଛିଲାମ । ଇନ୍ଦ୍ରି ପେଯେଛିଲାମ, ଆମି ନାକି ତାର ମାନସରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ! ପଞ୍ଚରାଜ ଘୋଡ଼ାଯ ଚଢ଼େ ନନ୍ଦିନୀକେ ନିଯେ ଅଭିଷିକ୍ତା କରବ ଆମାର ଜୀବନ-ସଙ୍ଗିନୀଙ୍କପେ । ଆରୋ ଅନେକ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖେଛିଲ ସେ । ଜୀବନ ଧାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା, ବିଲାସିତା କରା ଯାର ସ୍ଵଭାବ, ତାର ପକ୍ଷେ ଏମନ ଅହେତୁକ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖା ହୟତ ସ୍ଵାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ମତ ଦୈଶ୍ୟଭରା କିଶୋରେ ପକ୍ଷେ ଏମନ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖା ସମ୍ଭବ ଛିଲ ନା । ତାହିତୋ ତାର ସେ ଆମଞ୍ଚଳ ଆମି ଗ୍ରହଣ କରତେ ପାରିନି । ସେ ଆମଞ୍ଚଳ ଗ୍ରହଣ କରାର କ୍ଷମତା ବା ସାହସ ଆମାର ଛିଲ ନା ।

ନନ୍ଦିନୀକେ ଆମି ଭାଲବାସିନି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣଚକ୍ରଲା ଏହି କିଶୋରୀକେ ଭୁଲବ ନା କୋନଦିନ । ସେ ଆମାର ଜୀବନସଜ୍ଜେର ଉଦ୍ବୋଧନ-ସଙ୍ଗୀତ ଗେଯେଛିଲ । ଏହି କିଶୋରୀ ଆମାର ଜୀବନ-ନାଟ୍ୟମଧ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟ୍ ଉକି ଦିଯେଇ ସରେ ଗିଯେଛିଲ, ବିଶେଷ କୋନ ଗୁରୁତ୍ପର୍ବ ଭୂମିକାଯ ଅଭିନ୍ୟା କରାର ଅବକାଶ ପାଇ ନି, କିନ୍ତୁ ତବୁ ତାର ଏକ ଅନ୍ତର ଭୂମିକା ରଯେ ଗେହେ ଆମାର କାହେ । ବି-ଏ ବା ଏମ-ଏ ପାଶ କରାର ପର ଜୀବନେର ବୃଦ୍ଧତା ପଟଭୂମିକାଯ ଅତୀତେ ଅନେକ ଶୁତି ହାରିଯେ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ହାରିଯେ ଯାଇ ନା ପାଠଶାଳାର ଗୁରୁମଶାୟେର ଶୁତି । ନନ୍ଦିନୀ ଆମାର ତେମନି ଏକଟି ଅମୂଳ୍ୟ ଶୁତି । ସେ ଆମାର ତୋରେ ଆକାଶେ ଏକଟି ତାରା । ସେ ତାରାର ଜ୍ୟୋତିତେ ଆମି ଆମାର ଜୀବନ-ପଥ ଚଲାତେ ପାରିନି ବା ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୟ ନି । ତା ନା ହୋକ । ତବୁଓ ସେ ଆମାର ଜୀବନ ଦିଗଦର୍ଶନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଛିଲ । ସର୍ବୋପରି ସେ ଆମାକେ ଆମାର ଆମିତ ଆବିଷ୍କାରେ ଶାହାୟ କରେଛିଲ ।

ଭାଲବାସା କି ଏବଂ ତାର କି ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଦିନ ଆମି ବୁଝିନି,

জানিনি। নন্দিনী কেন আমাকে ভালবেসেছিল, কি সে চেয়েছিল, কি পেয়েছিল—কিছুই আমি জানি না। শুধু এইটকুই জানি আমার শুখে সে স্থূলি হতো, আমার হৃষে সে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জলও ফেলেছে। ছন্দোবন্ধুভাবে এইসব অহুভূতির প্রকাশ করবার সুযোগ কোনদিনই সে পায় নি। কিন্তু যখনই সে সুযোগ এসেছে, নন্দিনী তার পূর্ণ সম্ম্বৃহার করেছে।

সরস্বতী পূজার আগের ক'দিন মরবার অবকাশ থাকত না। খাওয়া-দাওয়া তো দূরের কথা ঘুমুবার পর্যন্ত সময় পেতাম না। সারা দিন-রাত্তিরই রিপন স্কুলে কাটাতাম। নন্দিনী ঠিক জানত আমি কোন গরম জামা নিয়ে যাই নি। সন্ধ্যার পর এক ঝাঁকে একটা আলোয়ান নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে আসত। বলত, তোমার কি ঠাণ্ডাও লাগে না? যদি জ্বরে পড়, তাহলে কি হবে বল তো!

একবার সত্ত্ব সত্ত্বই আমি খুব অসুস্থ হয়েছিলাম। ন'টা বাজতে না বাজতেই বাবা বিদায় নিতেন। ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা! অথিল মিঞ্জী লেনের ঈ বিখ্যাত ভাঙা বাড়িটার অঙ্ককার কক্ষে আমি একলা থেকেছি। মণ্টুদাদের বাড়ি থেকে আমার পথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল নন্দিনীর আগ্রহেই। হ'বেলা স্কুলে যাতায়াতের পথে নন্দিনী আমাকে দেখে যেত। হয়ত একটু সেবা-যত্নও করত।

এসব অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। শুধু আমার জন্য একজন পথ চেয়ে বসে থাকবে, আমাকে ভালবেসে, সেবা করে, যত্ন করে, কেউ মনে মনে তৃপ্তি পাবে, আমি ভাবতে পারতাম না। নন্দিনী আমার জীবনে সেই অভাবিত অধ্যায়ের সূচনা করে।

ম্যাট্রিক পাশ করার পরই নন্দিনী বোম্বে চলে গেল। আমার জীবনের সেই ক্ষণস্থায়ী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তবুও সে আমার জীবন থেকে একেবারে বিদায় নিল না। চিঠিপত্র

নিয়মিত আসত। আর আসত আমার জন্মদিনে একটা শুভেচ্ছা। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা নেতাজী নই। আমার মত সাধারণ মাঝুমের জন্মদিনে যে কোন উৎসব বা অঙ্গুষ্ঠান হতে পারে, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। আমার জন্মদিনে বাবা ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেই অফিসে দৌড় দিতেন। সেবারেও এই নিয়মের ব্যক্তিক্রম হয় নি। বিকেলবেলায় নদিনী টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে আমার জন্ম সামাজ্ঞ কিছু উপহার এনে চমকে দিয়েছিল।

নদিনী আজ অনেক দূরে চলে গেছে। স্বর্খ-শাস্তিতে স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘরসংসার করছে। তার আজ কত কাজ, কত দায়িত্ব। কিন্তু তবুও একটা গ্রৌটিংস টেলিগ্রাম পাঠাতে ভোলে না আমার জন্মদিনে।

কলকাতা থেকে বিদায় নেবার পর আমার সঙ্গে নদিনীর আর দেখা হয় নি। এম-এ পড়ার সময় ওর বিয়ে হলো এক আই-এ-এস পাত্রের সঙ্গে। নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ-পত্রও এসেছিল। কিন্তু আমার পক্ষে তখন বোম্বে ঘাওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। টিউশানির টাকা আগাম নিয়ে পনের টাকা দামের একটা তাঁতের শাড়ী পাঠিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমি আমার জীবন-যুক্ত এমন মেতে উঠেছিলাম যে নদিনীকে মনে করার পর্যন্ত ফুরসত পেতাম না।

আয় বছর দশেক পরে আমি গ্যাংটক গিয়েছিলাম কি একটা কাজে। তিন-চারদিন পরে কলকাতার পথে শিলিঙ্গড়ি ফিরেছিলাম। পথে আটকে পড়লাম। সেবক ব্রীজের কাছে কিছুটা ধূস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়েছিল। কুণি-মজুরের দল রাস্তা পরিষ্কারে ব্যস্ত। আমার মত অনেকেই প্রকৃতির এই খামখেয়ালীপনায় বিস্তু হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিলেন। রাস্তা পরিষ্কার হতে আরো ঘন্টা দুয়েক লাগবে। এই দীর্ঘ অবসরে অনেকের

সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হলো। কার্শিয়াং-এর তরঙ্গ এস-ডি-ও'র  
সঙ্গেও বেশ ভাব হয়ে গেল।

মাসকয়েক পর আবার কর্মব্যপদেশে দার্জিলিং ঘাস্তিলাম।  
পথে কার্শিয়াং পড়বে। মনে মনে ঠিক করেছিলাম এস-ডি-ও  
সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং এলাম।  
হঠাতে অফিসে গিয়ে হাজির হওয়ায় এস-ডি-ও সাহেব চমকে  
গেলেন। পর পর ছ'কাপ কফি গিলেই পালাবার উপকৃতি করছিলাম  
কিন্তু এস-ডি-ও সাহেব বললেন, তা কি হয়। আমার কোয়ার্টারে  
যাবেন, লাঞ্ছ থাবেন। তারপর বিকেলের দিকে দার্জিলিং যাবেন।

আমার কোন উন্নতির অপেক্ষা না করেই এস-ডি-ও সাহেব  
কোয়ার্টারে টেলিফোনে ছীকে জানালেন, নলা, আমার এক বছু  
এসেছেন কলকাতা থেকে। লাঞ্ছে নিয়ে আসছি। তুমি একটু  
ব্যবস্থা করো।

গোটা বারো নাগাদ এস-ডি-ও সাহেব আমাকে নিয়ে কোয়ার্টারে  
গেলেন। ড্রইংরুমে আমাকে বসিয়ে রেখে স্নান করবার জন্য বিদ্যায়  
নিলেন। মিনিট কয়েক পরে আর কেউ নয়, স্বয়ং নন্দিনী কফির  
কাপ হাতে নিয়ে আমার সামনে হাজির হলো। ছ'জনেই একসঙ্গে  
বলেছিলাম, তুমি?

সেদিন কার্শিয়াং পাহাড়ের সমস্ত কুয়াশা ভেদ করেও মন্দিনীর  
চোখেমুখে যে উজ্জলতা, যে আনন্দ দেখেছিলাম, তা কোনদিন ভুলব  
না। এস-ডি-ও সাহেবকে বলেছিলাম, আপনি যে মন্টুদাদের  
বাড়ির জামাই, তা তো জানতাম না। সংক্ষেপে জানালাম ওর  
খ' শুরবাড়ির সঙ্গে আমাদের হৃষ্টতার কথা। গোপন করিনি যে  
তাঁর ছীর সঙ্গে ছোটবেলায় খেলাধূলা করেছি।

এস-ডি-ও আমাকে খ'শুরবাড়ির দূত মনে করে আনলে মেতে  
উঠলেন। লাঞ্ছের টেবিলে এক গেলাস স্কোয়াস হাতে নিয়ে আমার  
হেলথ' এর জন্য প্রণোজ করতে গিয়ে ঘোষণা করলেন, মিস্টার

কার্নিলিস্ট আজ রাত্রে এক স্পেশ্যাল ডিনারে চীফ গেস্ট হবেন এবং  
কার্শিয়াংএ রাত্রিবাস করবেন।

আমি বললাম, তা কি হয়।

এস-ডি-ও সাহেব বললেন, ভুলে যাবেন না আমি শুধু  
আত্মনিষ্ঠেশন চালাই তা নয়, বিচারও করি। আমি কার্শিয়াং-  
এর চীফ জাস্টিস কাম প্রাইম মিনিস্টার।

নন্দিনী বলল, এতদিন পর যখন দেখা হলো, একটা দিন থাকলে  
কি জোমার খুব স্মৃতি বা কষ্ট হবে?

সত্যি খুব আনন্দ করে সেই দিনটি কাটিয়েছিলাম। নন্দিনী  
ঠিক এতটা আদর-যত্ন করবে, ভাবতে পারিনি।

কর্মজীবনের পাকচকে আমি ছিটকে পড়েছি বহুদূরে। নন্দিনীর  
সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি, ভবিষ্যতে কোনদিন দেখা হবে কিনা,  
তাও জানি না। তবে ভুলব না তার স্মৃতি।

জান দোলাবৌদি, আমি কার্শিয়াং ত্যাগের আগে নন্দিনী  
বলেছিল, একটা অভ্যর্থনাধ করব?

আমি বলেছিলাম, তার জন্য কি অভ্যর্থনাধ প্রয়োজন?

‘না তা নয়। তবে বলো আমার অভ্যর্থনাধটা রাখবে।’

বিদায় নেবার প্রাকালে মনটা নরম হয়েছিল। কোনকিছু তর্ক  
করার প্রয়োজন ছিল না। বললাম, নিষ্যয়ই রাখব।

‘তোমার পুত্রবধুর নাম রেখো নন্দিতা। রাখবে তো?’

আমি স্তুপ্তি হয়েছিলাম শুর ঐ বিচ্ছি অভ্যর্থনাধ করার জন্য।  
ঠোট্টা কামড়াতে কামড়াতে কথা বলতে পারিনি। শুধু মাথা  
নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

এই চিঠি আর দীর্ঘ করব না। তাছাড়া তুমি জো আমার চিঠি  
একবার পড়ে ক্ষান্ত হও না। আর যাই কর আমার এসব চিঠি  
তুমি কলেজে নিয়ে ক্লাশে বসে পড়ো না। তিন-চারদিনের জন্য  
এলাহাবাদে যাচ্ছি। ফিরে এসে আবার চিঠি দেব।

## চার

তেবেছিলাম তিন-চার দিনের মধ্যেই এলাহাবাদ-বাস শেষ হবে। আশা করেছিলাম এই ক'দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের ভাষা সমস্তার একটা হিল্পে হবে। দেশটা এমন একটা স্থানে এসে পৌঁছেছে যে আমাদের কোন আশাই যেন আর কোনদিন পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। ভাষা নিয়েও তাই আমাদের আশা পূর্ণ হলো না এবং আমার এলাহাবাদ ত্যাগ করাও সন্তুষ্ট হয় নি। আমি আজও এলাহাবাদে আছি; আগামী কাল ও পরশুও আছি। হয়ত আরো অনেক দিন থাকতে পারি।

ক'দিন শুধু টাইপরাইটার খটখট করে প্রায় অ্যালার্জি হবার উপক্রম হয়েছে। তাইতো একটু মুখ পার্শ্বে নেবার জন্য তোমাকে আমার মেমসাহেব কাহিনী আবার লিখতে শুরু করলাম।

নন্দিনীর বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবন সংগ্রাম শুরু হলো। তুমি তো জান বাংলাদেশটা হ'টুকরো হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মত লক্ষ লক্ষ বাঙালী যুবক-যুবতীদের অদৃষ্টও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোনদিন স্বপ্নেও তাবিনি কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এমন করে কালৈবেশাথী দেখা দেবে। তাবিনি জীবনের সমস্ত দিগন্ত এমনভাবে অঙ্ককারে ভরে যাবে।

রিপন স্কুল ত্যাগ করে রিপন কলেজে ভর্তি হলাম। সবার মুখেই শুনছিলাম আর্টস পড়লে কোন ভবিষ্যত নেই; সায়েন্স না পড়লে দেশ ও দেশের যুবকদের মুক্তির কোন উপায় নেই। বাপ-ঠাকুর্দার সঙ্গে জ্ঞানের পরিচয় থাকলেও চোদ্দপুরুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তবুও আমি বিজ্ঞান সাধনা শুরু করলাম। তবে দেশের অবস্থা এমন অনুভূত অট্টিল

হয়েছিল যে শুধু বিজ্ঞান সাধনা করেই হিন কাটান সম্ভব ছিল না,  
লক্ষ্মীর সাধনাও শুরু করলাম।

কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করা মুখ্য হলেও সকাল-সক্যাম  
টিউশানি করে রসদ ঘোগাড় করার কাজটাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।  
এই দোটানার মধ্যে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। নিজের  
দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পাচ্ছিলাম না। ছোটবেলায় কলেজ  
জীবন সম্পর্কে অনেক রূপকথার কাহিনী শুনতাম। স্কুলে পড়বার  
সময় তাই অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্ন দেখতাম, ধৃতি-পাঞ্জাবি  
পরে হাতে খাতা দোলাতে দোলাতে কলেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, মাস্টার  
মশাইদের মত প্রফেসাররা অথবা ছাত্রদের বকাবকি করছেন না,  
ঝাশ ঝাঁকি দেবার অবাধ স্বাধীনতা এবং আরো অনেক কিছু।  
আশা করেছিলাম কলেজ জীবন সাফল্যপূর্ণ বৃহত্তর জীবনের  
পাশপোর্ট তুলে দেবে আমার হাতে। এই ক'বছরের শিক্ষা-দীক্ষা  
ও সর্বোপরি অভিজ্ঞতা আমার চোখে নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা এনে  
দেবে, সম্ভব করে তুলবে তাদের বাস্তব রূপায়ণ। লুকিয়ে লুকিয়ে  
মনে মনে হয়ত এ আশাও করেছিলাম আমি সার্থক, সাফল্যপূর্ণ ও  
পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে সগর্বে এগিয়ে যাব আগামী দিনের দিকে।

সেদিন জ্ঞানতাম না বাংলা দেশের সব যুবকই কলেজ জীবনের  
শুরুতে এমনি অনেক স্বপ্ন দেখে এবং সে স্বপ্ন চিরকাল শুধু স্বপ্নই  
থেকে যায়। বৌধহ্য একজনের জীবনেও এসব স্বপ্ন বাস্তব হয়ে দেখা  
দেয় নি। তবুও বাঙালীর ছেলে স্বপ্ন দেখে; স্বপ্ন দেখে হাসিতে গানে  
ভরে উঠবে তার জীবন। জীবন পথের ঢ়াই উত্তরাই পার করতে  
সাহায্য করবে আদর্শবতী জীবন-সঙ্গিনী এবং আরো অনেক কিছু।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাঙালী যুবকদের মত হয়ত আমিও এমনি  
স্বপ্ন দেখেছিলাম কোন দুর্বল মূহূর্তে। অতীতের ব্যর্থতার ইতিহাস  
থেকে শিক্ষা নিইনি, পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা আমাকে শাসন করতে  
পারে নি, সংযত করতে পারে নি।

তবে আমি আমার কল্পনার উড়োজাহাজ উড়িয়ে বেশিদূর উড়ে যাই নি। রিপন কলেজের এয়ারপোর্ট থেকে টেক্ অফ করার পরপরই ক্রাশ ল্যাণ্ড করে সম্মিলিত ফিরে পেয়েছিলাম।

একদিকে অর্থ চিন্তা ও অগ্রদিকে ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি এমন প্রমত্ত থাকতাম যে আশপাশে কোন অমর আমার মধ্য থাবার জন্য উড়ছে কিনা, সে খেয়াল করার স্থূলতা পেতাম না। জীবনটার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। আমার সীমিত জীবনের মধ্যে যে ক'টি নারী-পুরুষের আনাগোনা ছিল তাদের দিকে ফিরে তাকাবারও কোন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না।

কিন্তু কি আশ্চর্য, কিছুকাল পর হঠাতে আবিকার করলাম কে যেন আমার মনোবীণার তারে মাঝে মাঝে ঝক্কায় দিচ্ছে। চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন একটু রঙীন মনে হলো। ক'দিন আগে পর্যন্ত যে আমার মুহূর্তের ফুরসত ছিল না নিজের দিকে তাকাবার, সেই আমি নিজের দিকে ফিরে তাকান শুরু করলাম। আরো একটা গেরুয়া-পাঞ্জাবি তৈরী করলাম। কায়দা করে ধূতি পরাও ধরলাম। পাড়ার সেলুনে চুল কাটা আর রুচিসম্পত্তি মনে হলো না। পরের মাসে টিউশানির মাইনে পাবার পর একজোড়া হাল ফ্যাশানের কোলাপুরী চট্টও কিনলাম।

এমনি আরো অনেক ছোটখাটো পরিবর্তন এলো আমার দৈনন্দিন জীবনে। আগে ছুটো একটা বই আর খাতা নিয়ে কলেজে যেতাম। এখন বই হাতে করে কলেজে যেতে আত্মসম্মানে বাধতে লাগল। বই নেওয়া ত্যাগ করে শুধু খাতা হাতে করে কলেজ যাওয়ার নিয়মটা পাকাপাকি করে নিলাম। মোদা কথা আমি এক নতুন ধর্মে দীক্ষিত হলাম। বাসাংসি জীর্ণানি করে আমি এক নতুন আমি হলাম।

অদৃষ্ট নেহাতই তাল। বেশিদূর এগুতে হলো না। হঁচুট খেয়ে পড়ে গেলাম। আজ আত্মজীবনীর সেই রঙীন দিনগুলোর

কথা মনে হলে হাসি পায়। সেদিন কিন্তু হাসি পায় নি।  
মরীচিকাকেই সেদিন জীবনের চরম সত্য বলে মনে করে  
ছুটেছিলাম। ঘটনাটা নেহাতই সামান্য।

বারাকপুর-টিটাগড় বা খিদিরপুরের বড় বড় কলকারখানার মত  
তখন আমাদের কলেজও তিন শিক্ষ্ট'এ হতো। সকালে মেয়েদের,  
চৃপুরে ছেলেদের, রাত্রিতে প্রৌঢ়দের ক্লাশ হতো। বেধুন বা লেডী  
আবোন্নের ছাত্রীদের মধ্যে যুবতী কুমারীদের মেজরিটি থাকলেও  
আমাদের কলেজের মর্নিং সেক্সনের চেহারা ছিল আলাদা। নৌলিমা  
সরকারের মত সত্ত প্রস্কৃতিত গোলাপের সংখ্যা ধূব বেশী ছিল না।  
দেশটা স্বাধীন হবার পর অনেকের সংসারেই আগুন লাগল। এক  
টুকরো বন্ধু আর এক মুষ্টি অন্নের জন্য, ঝগ্গ শিশুর একটু পথের  
জন্য, জীবনধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দাবী মেটাবার জন্য বাংলা  
দেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ বধুদের ভালহোসী ক্ষোঁয়ারের  
রঙমঞ্চে নামতে হলো। তাইতো এই ভালহোসী রঙমঞ্চে আসবাব  
পাশপোর্ট যোগাড় করার জন্য অনেক বৌদি আর ছেট মাসিমারাই  
আবার কলেজে পড়া শুরু করলেন। তাছাড়া আর একদল মেয়েরা  
নতুন করে উচ্চ শিক্ষা নিতে সে সময় শুরু করলেন। দেশটা  
স্বাধীন হবার পর অনেক অঙ্ককার ঘরেই হঠাত বিংশ শতাব্দীর  
আলো ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের কলেজের বীণামাসির মত ধাঁরা  
কোন অস্থায় না করেও স্বামী ও শঙ্গুর-বাড়ির অকথ্য অত্যাচার  
দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সহ করেছেন, ধাঁরা বিবাহিতা  
হয়েও স্ত্রীর মর্যাদা পাননি, স্বামীর ভালবাসা পাননি, সন্তানের  
জননী হয়েও ধাঁরা মা হবার গোরব থেকে বধিতা হয়েছিলেন,  
তাঁদের অনেকেই বন্দীশালার অঙ্ককুপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন।  
অজ্ঞানা, অজ্ঞাত, ভবিষ্যতের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য এঁদের  
অনেকেই আবার কলেজে ভর্তি হলেন। আমাদের কলেজেও  
অনেকে ভর্তি হয়েছিলেন।

দিনের বেলায় হাফ্‌ আর্দ্রবাদী, হাফ্‌ ভাবুক, হাফ্‌ পলিটিসিয়ান, হাফ্‌ অভিনেতা, হাফ্‌ গায়ক, হাফ্‌ খেলোয়াড়দেরই সংখ্যা ছিল বেশী। সন্ধ্যার পর যারা আসতেন তাদের অধিকাংশই ডালহোসী-ক্যানিং স্ট্রীট-ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে অর্ধমৃত অবস্থায় ছুটতে ছুটতে কলেজে আসতেন।

সওয়া দশটায় মেয়েদের ক্লাশ শেষ হতো আর ছেলেদের ক্লাশ শুরু হতো। আমার ক্লাশ কোনদিন সওয়া দশটায়, কোনদিন এগারটায় শুরু হতো। সওয়া দশটায় ক্লাশ থাকলে ছেলেরা কোনদিন লেট করত না। বরং দশটা বাজতে বাজতেই কমনরুম ছেড়ে দোতালা-তিনতলার দিকে পা বাঢ়াত। সওয়া দশটার সন্ধিলঞ্চের প্রতি অশ্বান্ত ছাত্রদের মত আমারও আকর্ষণ ছিল কিন্তু সকালবেলায় দু'ছটো টিউশানি করে কলেজে আসতে আসতে প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে যেত। তাইতো সওয়া দশটার ক্ষণিক বসন্তের হাওয়া আমার উপভোগ করার স্থযোগ নিয়মিত হতো না।

বীণামাসির সঙ্গে প্রায়ই পূরবী সিনেমার কাছাকাছি দেখা হতো। বীণামাসি বিবাহিতা যুবতী কিন্তু সিঁহুর পরত না। বীণামাসি বলত, বিয়ে করেও যখন স্বামীকে পেলাম না, যশুরবাড়িতেও স্থান পেলাম না, তখন সিঁহুর পরব কার জন্য? কিসের জন্য? ফুটপাথের এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দু'চার মিনিট কথাবার্তা বলতাম। কলেজের ছোকরা অধ্যাপক ও ছাত্রদের কেউ কেউ পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু সরস দৃষ্টি দিয়ে চাইতেন। বীণামাসি ও আমি হজনেই তা লক্ষ্য করতাম কিন্তু গোছ করতাম না।

পর পর ক'দিন বীণামাসির সঙ্গে দেখা হলো না। প্রথম ক'দিন বিশেষ কিছু ভাবিনি। পুরো একটা সপ্তাহ দেখা না হবার পর একটু চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। অথচ বীণামাসিদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ করব সে সময়ও হয় না। কলেজ শেষ হতে না হতেই আবার টিউশানি করতে ছুটতে হয়।

বেদিনও কলেজে আসবার পথে বীণামাসির দেখা পেলাম না। কিন্তু ঐ পূরবী সিনেমার কাছাকাছিই হঠাতে একটা জীবন্ত বাক্সের স্তুপ আমার সামনে থমকে দাঢ়াল। বললো, শুন। বীণাদির খুব অস্মৃতি। আপনাকে যেতে বলেছেন।

সকাল সাড়ে দশটার সময় হারিসন রোডের পর পূরবী সিনেমার পাশে এমনভাবে একজন সুন্দরী আমাকে বীণামাসির সমন জারী করবে, কল্পনাও করতে পারিনি। মুহূর্তের জন্য ভড়কে চমকে গিয়েছিলাম। একটু সামলে নেবার পর অনেক প্রশ্ন মনে এসেছিল কিন্তু গলা দিয়ে সেসব প্রশ্ন বেরতে সাহস পায় নি। শুধু বলেছিলাম, আপনি জানলেন কি করে?

—আমি বীণাদির বাড়ি গিয়েছিলাম।

সেই দিনই বিকেলবেলা বীণামাসিকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমি যেতেই বীণামাসি আমাকে প্রশ্ন করল, ‘নৌলিমার কাছে খবর পেয়েছিস বুঝি?’

আমি বললাম, ‘কোন् নৌলিমা?’

‘ঐ যে আমাদের সঙ্গে পড়ে নৌলিমা সরকার.....’

‘তা জানিনে, তবে আজ সকালেই পূরবীর কাছে একটা সুন্দর ধরনের মেয়ে.....’

বীণামাসি আর এগুতে দিল না। বললো, ‘হঁয়া, হঁয়া ঐ তো নৌলিমা।’

আমি বললাম, ‘তাই বুঝি?’

বীণামাসির কাছে আমি আমার চিঞ্চাধ্যল্যের বিন্দুমাত্র আভাস দিলাম না। নিজেকে সংযত করে নিলাম। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে সেদিনের মত বিদায় নেবার আগে বীণামাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কলেজ থেকে কেউ তোমাকে দেখতে আসেন না?’

‘হঁয়া, অনেকেই আসে।’

তিন-চারদিন পরে আবার বীণামাসিকে দেখতে গেলাম। গিয়ে  
দেখি সেদিনের সেই নীলিমা সরকারও বসে আছেন। নমস্কার  
বিনিময় করে আম পাশের মোড়টায় বসলাম। বীণামাসি চাদরটা  
গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে পাশ ফিরে বললো, ‘জানিস নীলিমা, বাচ্চু  
আগে আমাদের পাড়াতেই থাকত। আমাদের এই পাড়ায় থাকবার  
সময়ই শুরু মা মারা যান.....’

নীলিমা বললো, ‘তাই নাকি ?’

আমি বললাম, ‘আমার জীবন কাহিনী শোনার অনেক অবকাশ  
পাবেন, আজ থাক। যদি লিখতে পারত তবে বীণামাসি আমার  
জীবন নিয়ে একটা রামায়ণ লিখত। ভাগ্য ভাল বীণামাসির কলম  
চলে না, শুধু মুখ চলে। কিন্তু তার ঠেলাতেই আমি অঙ্গীর !’

নীলিমার সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ-পরিচয় হলো।  
দশ-বারো দিন পরে বীণামাসির ওখানেই আমাদের আবার দেখা।  
সেদিন ছুঁজনেই একসঙ্গে বেরলাম। তারপর কলেজ ক্ষেত্রের পর্যন্ত  
একসঙ্গে হেঁটে গিয়ে ছুঁজনে ছুঁদিকে চলে গেলাম।

ঞি সামান্য আলাপ-পরিচয়তেই আমি যেন কেমন পালটে  
গেলাম। সকালবেলার টিউশানিতে একটু একটু ফাঁকি দিয়ে ও স্নান-  
আহারের পর্ব কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি করে দৌড়ে দৌড়ে সওয়া দশটার  
আগেই কলেজে আসা শুরু করলাম। কোনদিন দেখা হয়, কোন-  
দিন হয় না; কোনদিন কথা হয়, কোনদিন হয় না। কোনদিন  
আবার দূর থেকে একটু ত্যর্ক দৃষ্টি আর মুচকি হাসি-বিনিময়।  
তার বেশী আর কিছু নয় কিন্তু তবুও আমি কেমন স্পন্দাতুর হয়ে  
পড়লাম। নীলিমাকে কো-পাইলট করে আমি আমার কলমার  
উড়ো-জাহাজ নিয়ে টেক অফ করলাম। ভাব-সমুদ্রে ভেসে  
বেড়ালাম।

ঞি শুধু একটু মুচকি হাসি ও ক্ষণিকের দৃষ্টি-বিনিময়কে মূলধন  
করে আমি অনেক, অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। টোপর মাথায়

দিয়ে নীলিমার গলায় মালা পরিয়েছিলাম, পাশে বসে বাসর জেগেছিলাম। বৌভাত-ফুলশয্যার দিন গভীর রাত্রে অতিথিদের বিদায় জানিয়ে আমি নীলিমার ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করলাম। নীলিমার পাশে বসে একটু আদর করলাম। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে স্থইচ্চটা অঙ্ক করতে গিয়েই দাক্কণ শক্ত লাগল। আমার কল্পনার জাহাজ ক্রাশ ল্যাণ্ড করল। কো-পাইলট নীলিমাকে আর কোথাও খুঁজে পেলাম না।

সাহস করে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। মহা উৎকর্ষায় দিন কাটছিল। নীলিমা-বিহীন জীবন প্রায় অসহ হয়ে উঠল। বৈরাগ্যের ভাব মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই উকি দিতে লাগল। আর কয়েক দিনের মধ্যে খবর না পেলে হয়ত কেদার-বজীর পথেই পা বাঢ়াতাম। ভগবান করণাময়। তাই সে যাত্রায় আর সংসার ত্যাগ করতে হলো না, নীলিমার দেখা পেয়ে গেলাম।

দেখা পেলাম বীণামাসির বাড়িতেই। নীলিমার কপালে অত বড় একটা সিঁহরের টিপ দেখে বেশ আঘাত পেয়েছিলাম মনে মনে। অথবে ঠিক সহজ হয়ে কথাবার্তাও বলতে পারিনি। নীলিমা বোধহয় আমার মানসিক দম্বের তাবা বুঁৰেছিল। তাই সে নিজেই বেশ সহজ সরল হয়েছিল আমার সঙ্গে।

জান দোলাবৌদি, নীলিমার বিয়ে হবার পরই আমাদের দুঃখনের বহুত হলো। কোন কাজে-কর্মে সাউথে গেলেই কালীঘাটে নীলিমার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। নীলিমার স্বামী সন্তোষবাবু আজ আমার অগ্রতম বিশেষ বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। গুরা এখন আমেদাবাদে আছেন। সন্তোষবাবু একটা বিরাট টেক্সটাইল মিলের চৌক অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এক গাদা টাকা মাইনে পান। নীলিমা আমেদাবাদ টেগোর সোসাইটির সেক্রেটারী। তোমার বোধহয় মনে আছে সেবার গোয়া অপারেশনস্ কভার করে দিলী ফেরার পথে দমন গিয়েছিলাম এবং আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। গত্যন্তর না পেয়ে

সম্পোষিত হুকেই একটা আঞ্জেট টেলিগ্রাম পাঠাই। আমী-ঢ্বী  
হজনেই ছুটে এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। হ'-সপ্তাহ  
গুদের সেবা-যত্নে আমি শুশ্র হবার পর নীলিমা মেমসাহেবকে  
আমেদাবাদ আনিয়েছিল। হ'-সপ্তাহ অশুশ্র থাকা সঙ্গেও কোন  
খবর না দেবার জন্য মেমসাহেব ভৌবণ রেগে গিয়েছিল। আমি  
কিছু জবাব দিতে পারিনি। নীলিমা ওর ছাঁটি হাত ধরে বলেছিল,  
'তোমার সেবা পাবার মত অশুশ্র হলে নিশ্চয়ই খবর দিতাম।  
ডক্টর মৈত্রকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম।' উনি বললেন, তাড়াছড়ো  
করে ওকে আনাবার কোন কারণ দেখি না। একটু শুশ্র হলেই  
খবর দেবেন।'

একটু থেমে হ'-হাত দিয়ে মেমসাহেবের মুখটি তুলে ধরে নীলিমা  
বলেছিল, 'তাছাড়া ভাই, আমি বা তোমার দাদাও বাচ্চুকে  
ভালবাসি। তোমার অভাব আমাদের দ্বারা না মিটলেও ওর  
সেবাযত্তের কোন ক্রটি করিনি আমরা।'

মেমসাহেব তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে হাসিতে ভরিয়ে তুললো  
নিজের মুখটা। বললো, নীলিমাদি, আমি তো আপনাদের হংখ দিতে  
চাইনি। তবে আগে এলে হয়ত নিজে মনে মনে একটু শান্তি পেতাম,  
ভাই আর কি...'

নীলিমা আর এগুতে দেয় নি। ঐ অধ্যায়ের ঝীখানেই সমাপ্তি  
হলো।

তারপর আরো এক সপ্তাহ ছিলাম আমেদাবাদে। কাকারিয়ার  
লেকের ধারে রোজ বেড়িয়েছি আমরা। কত আনন্দ, কত হৈ-চৈ  
করেছি আমরা। যাকগে সেসব কথা।

নন্দিনী যখন আমার জীবনে উকি দিয়েছিল, তখন আমি চম্কে  
গিয়েছিলাম। ভাবতে পারিনি, ভাববার সাহস হয় নি যে একটি  
মেয়ে আমার জীবনে আসতে পারে বা আমাকে কোন মেয়ে তার  
জীবনরথের সারথী করতে পারে। যেদিন নীলিমার দেখা পেলাম,

সেদিন কি করে এই সংশয়ের মেষ কেটে গেল জানি না। তবে একথা সত্য যে ক্লপকথার রাজকুমারীর মত নৌলিমার ছেঁয়ায় আমার ঘূম ভেঙেছিল, আমি ক্রৈশোর থেকে সভ্য সভ্যই ঘোবনের সিংহ-দ্বারে এসে উপস্থিত হলাম।

নৌলিমার কথা আজ পর্যন্ত কাউকে জানাই নি। এসব জানাবার নয়। এ আমার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। এমন কি নৌলিমাও জানে না, হয়ত ভবিষ্যতেও জানতে পারবে না।

তবে মেমসাহেবকে বলেছিলাম। মেমসাহেব কি বলেছিল জান? বলেছিল, ‘মুন্দরী মেয়ে দেখলে যে তোমার মাথাটা ঘুরে থায়, তা আমি জানি। আমার মত কালো কুচ্ছিৎ মেয়েকে যে তোমার পছন্দ হয় না, সে কথাটা অত ঘুরিয়ে বলার কি দরকার?’

আমি শুধু বলেছিলাম :

“প্রহর শেষের আলোয় রাঙ্গা সেদিন চৈত্র মাস—

তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।

এ সংসারের নিত্য খেলায় প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়

বাটে ঘাটে হাজার লোকের হাস্য-পরিহাস—

মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ।”

একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিলাম, ‘তোমার পোড়া কপাল। কি করবে বল। যদি পার পালটে নেবার চেষ্টা কর।’

আলোচনা আর দীর্ঘ না করে মেমসাহেব মুচকি হেসে জিভ ভেংচি কেটে পালিয়ে যেত।

## পাঁচ

আমি দিল্লী ফিরে এসেছি, কিন্তু ক'দিন এমন অপ্রত্যাশিত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটালাম যে, কিছুতেই তোমাকে চিঠি সেখার সময় পাইনি। তাছাড়া ইতিমধ্যে হ'দিনের জন্য তোমাদের বক্ষ মাধুরী চ্যাটার্জি আর তাঁর স্বামী এসেছিলেন। মাধুরীকে মনে পড়ছে তোমার ? প্রেসিডেন্সীতে ফিলসফি নিয়ে পড়ত ! পার্ক-সার্কাস-বেগবাগানের মোড়ে থাকত ।

দিল্লীতে আসার পর নিয়-নৈমিত্তিক পরিচিত আধা-পরিচিত অনেকেই আসেন আমার আস্তানায়। কেউ ইন্টারভিউ দিতে, কেউ অফিসের কাজে, কেউ বা আবার ডেরাডুন-মুর্সৌরী-হরিদ্বারের পথে লালকেল্লা-কৃতুবমিনার আর রাজঘাট-শাস্তিবন দেখার অভিপ্রায়ে। মাধুরী চালাক মেয়ে। হাজার হোক তোমাদেরই বক্ষ তো ! স্বামী এসেছিলেন অফিসের কাজে ; আর উনি এসেছিলেন স্বামীকে অমুপ্রেরণ দিতে। এখনও সেই আগের মতনই হৈ-ছল্লোড় করে। স্বামীকে সকাল বেলায় অফিসে রওনা করিয়ে দিয়ে সারা দিন নিজে হৈ-হৈ করে চকর কেটে বেড়াত আমার সঙ্গে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম কিন্তু মাধুরী হতো না। বিকেল বেলায় স্বামী এলে আমাদের সেকেণ্ড ইনিংস শুরু হতো।

যাই হোক বেশ কাটল ছটো দিন। মাধুরীর কাছে তোমার একটা শাড়ী আর পেটুক খোকনদার জন্য খানিকটা শোনহালুয়া পাঠিয়োছ। শাড়ীটা তোমার পছন্দ হলো কিনা জানিও ।

এদিকে আমার মনের শুরু নীলিমার ঝড় বয়ে যাবার পর পরই হঠাত সাংবাদিকতা শুরু করলাম। আমার জীবনের সে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট

হয়ে গেল। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে আই-এ পড়ে, আই-এ গাশ করে বি-এ পড়ে। তারপর ইউনিভার্সিটির দেওয়া পাশপোর্ট নিয়ে চোদ্দ আনা ছেলে নেমে পড়ত জীবনযুদ্ধের পাওয়ার লীগ খেলতে। বাকি তু' আনা আরো এগিয়ে যেত। তাদের মধ্যে কেউ ফার্স্টডিভিশনে, কেউ আই-এফ-এ শীল্ড বা রোভার্স খেলত। কেউ কেউ আবার আরো এগিয়ে যেত।

আমি পাওয়ার লীগে খেলবার জন্যই জন্মেছিলাম ও তারই অস্তিত্ব করছিলাম। মাঝে মাঝে অবশ্য স্বপ্ন দেখতাম ডাক্তার হবো, ইঞ্জিনিয়ার হবো। অথবা অধ্যাপক হয়ে কঁচা ছলিয়ে কলেজে আসব, মেয়েদের পড়াব, ছেলেদের পড়াব। ছাত্রীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার জন্য মন আকুল ব্যাকুল হলেও আমি কিছুতেই তার প্রকাশ করব না। কিন্তু তবু ছাত্রীরা আমার কাছে ছুটে আসবে নানা কারণে, নানা প্রয়োজনে। ইলোরাদের বাড়ি একদিন ঢায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করায় অনেক সরস কাহিনী ছড়াবে সমগ্র নারী-জগতের মধ্যে। তারপর ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি আর কি!

আমাদের আশ্রীয়-বন্ধুদের মধ্যে কেউ কোনদিন খবরের কাগজে চাকরি করা তো দূরের কথা, খবরের কাগজের অফিসে পর্যন্ত যান নি। তাইতো কেউ কলনা করেন নি তাদের বংশের এই কুলাঙ্গার খবরের কাগজে চাকরি করবে। দেশটা ছ'টক্ৰো হৰাৰ আগে আমাদের সমাজজীবন কয়েকটা পরিচিত ধাৰায় বয়ে গেছে। পরিচিত সৌমানার বাইৱে ধাৰার প্রয়োজন বা তাপিদ বিশেষ কেউই বোধ করেন নি। দেশটা স্বাধীন হৰাৰ সঙ্গে সঙ্গেই অতীত দিনেৰ সে সব রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন প্রয়োজন কোথায় যেন তলিয়ে গেল। এই শাস্ত-স্মিক্ষ পৃথিবীটা যেন কোটি কোটি বছৰ পেছিয়ে অগ্নি-বলয়ে পরিণত হলো। জৈব প্রয়োজনটা চৰম নগ্নভাবে প্রকাশ কৱল। ইতিহাসের বলি হয়ে মানুষগুলো

বাঁচবার প্রয়োজনে উদ্ধাদের মত ছুটে বেড়াল চারদিকে। সেদিনের সে অগ্নি-বস্ত্র পৃথিবীর যে যেখানে পারল আস্তানা করে নিল। লক্ষপতির ছেলে “কলেজ স্ট্রাটে হকার হলো, আমার-তোমার চাইতেও বনেদী ঘরের অনেক মেয়ে-বৌ বৌবাজার আর লিশেস স্ট্রাটের ম্যাসেজ-বাথে গিয়ে দেহ বিক্রয় করতে বাধ্য হলো।

বৌবাজারের রথের মেলায় বা বিজয়া দশমীর দিন কুমুরটুলীর ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট বাঁচাদের দেখেছ? দেখেছ কেমন হাউ হাউ করে কাঁদে? লক্ষ্য করেছ বাবা-মা’কে হারিয়ে অসহায় হয়ে, ব্যাকুল হয়ে অর্থহীন ভাষায় সবার দিকেই কেমন তাকায়? আমিও সেদিন এমনি করে অর্থহীন ভাষায় চারদিকে তাকাচ্ছিলাম একটু ভবিষ্যতের আশায়। কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ, কোন্টা সহজ, কোন্টা কঠিন—তা ভাববার সময় বা ক্ষমতা কোনটাই সেদিন আমার ছিল না। তাইতো অপ্রত্যাশিতভাবে খবরের কাগজের রিপোর্টার হবার সুযোগ পেয়ে আমি আর দিখা না করে এগিয়ে গেলাম।

রামায়ণে পড়েছি সীতীছের প্রমাণ দেবার জন্য সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও স্বামীর পাশে সীতার স্থান হয় নি। রাজরাজেশ্বরী সন্তানসন্ত্বা সীতাকে প্রিয়হীন বন্ধুহীন নিঃস্ব হয়ে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। জান দোলাবৌদি, আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় সীতার গর্ভেই বোধহয় বাঙালীর পূর্বপুরুষদের জন্ম। তা না হলে সমগ্র বাঙালী জাতটা এমন অভিশাপগ্রস্ত কেন হলো? স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চরম অগ্নি-পরীক্ষা দেবার পরও কেন তার রাহমুক্তি হলো না? স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও কেন তাদের চোখের জল পড়া বন্ধ হলো না?

সত্যি দোলাবৌদি, সেদিনের কথা মনে হলে আজও শরীরটা শিঙ্গেরে শোঁ, মাথাটা ঘুরে ঘায়, দৃষ্টিটা বাপসা হয়। সেই ছুর্দিনের

মধ্যেই আমি নতুন পথে যাত্রা শুরু করলাম। সকালবেলার টিউশানি ছটো ছাড়লাম না; কিন্তু বিকেলের ছাত্র পড়ান বন্ধ করলাম। হপুরে কলেজ করে সাড়ে তিনটে কি চারটে বাজতে বাজতেই নোট-বই পেলিল নিয়ে চলে যেতাম সভাসমিতি বা কোন প্রেস কলফারেলে। তারপর অফিস। রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত রোজই কাজ করতে হতো। কোন কোনদিন আবার বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত তিনটে-চারটেও হয়ে যেত।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমনি করে চালিয়েছি। বিনিময়ে কি পেয়েছি? প্রথম বছর একটি পয়সাও পাইনি। নিজের টিউশানির রোজগার দিয়ে ট্রাম-বাসের খরচ চালিয়েছি। পরের বছর থেকে মাসিক দশ-টাকা। রোজগার শুরু করলাম। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান সাধনার প্রথম পর্ব শেষ করলাম। পিছদের ফতোয়া জারী করলেন, সাংবাদিকতার খেলা শেষ করে একটা রাস্তা ধর। সত্য তখন অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতি এমন সঙ্কটাপন্থ ছিল যে, কিছু একটা না করলে চলছিল না। আমার বন্ধু-বন্ধবরাও এই একই সমস্তার সম্মুখীন হলো। সবাই উপলক্ষ্য করছিল কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে—তা কেউই জানত না। ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার মত রসদ কারুরই ছিল না। তাই ওদিকে আর কেউ পা বাড়াল না। আর্মি রিক্রুটিং অফিস থেকে শুরু করে খিদিরপুর বারাক-পুরের সমন্ত কল-কারখানার দরজায় দরজায় ঘূরে বেড়লাম একটা পঞ্চাশ টাকার অ্যাপ্রেনটিসশিপের জন্য। জুটল না। তাই এবার বিজ্ঞান সাধনায় ইস্তফা দিয়ে সাহিত্যসাধন। আর সাংবাদিকতা নিয়েই পরবর্তী অধ্যায় শুরু করলাম।

তোমাকে এত কথা লিখতাম না। তাছাড়া হয়ত কিছু কিছু তুমি শুনেছ বা জেনেছ। কিন্তু এই জগতই এসব জানাচ্ছি যে, আমার জীবনের কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মেমসাহেবকে

পেয়েছিলাম, তা না জানালে তুমি ঠিক গুরুত্বটা উপলব্ধি করবে না।

যৌবনে প্রায় সব ছেলেমেয়েই প্রেমে গড়ে। এটা ভাদের ধর্ম, কর্ম। অয়োজনও বটে কিছুটা। তাছাড়া শৈশব-ক্ষেত্রের পেরিয়ে পূর্ণতা লাভ করার এটা সব চাইতে বড় প্রমাণ। কলেজের কমনরুমে বা থিয়েটারের গ্রীনরুমে অনেক প্রেমের কাহিনীরই আদি-পর্ব রচিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মেয়াদ ক্ষণ-স্থায়ী। সামান্য একটু হাসি, সামান্য একটু গল্প, একটু মেলামেশার পর অনেক ছেলেমেয়েই প্রেমের নেশায় মশগুল হয়ে ওঠে। জীবনকে উপলব্ধি না করে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের অগ্নি-পরীক্ষায় উন্নীর্ণ না হয়ে যারা প্রেম করে বলে দাবী করে, তারা হয় বোকা, নয় মিথ্যাবাদী। ছাটি মন, ছাটি প্রাণ, ছাটি ধারা, ছাটি অপরিচিত মানুষ একই সঙ্গে কোরাস গাইবে অথচ তার পরিবেশ ধাকবে না, প্রস্তুতি ধাকবে না, তা হতে পারে না। এই পরিবেশ আর প্রস্তুতি ধাকে না বলেই আমাদের দেশের কলেজ রেস্টোরাঁর প্রেম প্রায়ই ব্যর্থ হয়। হৃৎ জমিয়ে ভাল মিষ্টি দই খেতে হলে, অনেক তদ্বির, তদারক ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। একটু হিসাব-নিকাশ বা তদ্বির-তদারকের গঙ্গোলে হয় দই জমে না, অথবা জমলেও দইটা টক হয়ে যায়।

ছাটি নারীপুরুষকে নিয়ে একটা সুন্দর ছন্দোবন্ধ জীবন গড়ে তুলতে হলে শুধু চোখের নেশা আর দেহের ক্ষুধাই যথেষ্ট নয়। আরো অনেক কিছু চাই। তাছাড়া জীবনে এই পরম চাঞ্চল্য চাইবারও একটা সময় আছে। কিছু পেতে হলেও সে পাওয়ার অধিকার অর্জন করতে হয়।

বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে অনেককেই অনেক সময় ভাল লাগে। হাসপাতালে হাসিখুশি ভরা নার্সদের কত আপন, কত প্রিয় মনে হয়। কিন্তু হাসপাতালের বাইরে? সমাজ-

জীবনের মুহূর্ত পরিবেশে ? ক'জন পারে তাদের আপন জ্ঞানে  
সমাদর করতে ?

আমার জীবনটা যদি শূলৰ, স্বাভাবিক ও ছলময় হয়ে এগিয়ে  
থেক তাহলে হয়ত যে কোন মেয়েকে দিয়েই আমার জীবনের  
প্রয়োজন মিটত । কিন্তু আমি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য তিলে  
তিলে দক্ষ হচ্ছিলাম । একটু সন্ধিমের সঙ্গে বাঁচবার জন্যে অসংখ্য  
মাঝুষের হারে হারে ঘুরে ঘুরেও কোন ফল হয় নি । মাত্র একশ'  
পঁচিশ টাকার একটা সামাজিক রিপোর্টারের চাকরির জন্য কতজনকে  
যে দিনের পর দিন তৈল-মর্দন করেছি, তার ইয়েন্টা নেই । তবুও  
বিষ্ণুসাগর-বিবেকানন্দের যোগ্য বংশধরদের মন গলে নি ।

কেন, আজীয়-বন্ধুর দল ? পঁচিশ বা পঁঠাশ টাকা মাইনের  
রিপোর্টারের সঙ্গে আবার আজীয়তা কিসের ? নিতান্ত ছ'চারজন  
মূর্খ বন্ধু ছাড়া আর সবার কাছেই আমি অস্পৃশ্য হয়ে গেলাম ।

দোলাবৌদি, আমার সে চৱম হুর্দিনের ইতিহাস তোমাকে আর  
বেশী লিখব না । তুমি হঃখ পাবে । তবে জেনে রাখ তোমাদের  
ঐ কলকাতার রাজপথে আমি দীর্ঘদিন ধরে উদ্ঘাদের মত ঘুরে  
বেড়িয়েছি, একটি পয়সার অভাবে সেকেও ক্লাশ ট্রামে পর্যন্ত চড়তে  
পারিনি । ছ'চারজন নিকট আজীয়ের প্রতি কর্তব্য পালন করে  
বছদিন নিজের অদৃষ্টে ছ'বেলা অন্ধ জোটাতেও পারিনি । কিন্তু  
কি আশ্চর্য ! বিধাতাপুরুষ যত নির্দুর হয়েছেন আমার প্রতিজ্ঞাও  
তত প্রবল হয়েছে । বিধাতার কাছে কিছুতেই হার মানতে চায় নি  
আমার মন ।

এমনি করে বিধাতাপুরুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে  
প্রায় সাত-আট বছর কেটে গেল । তবুও কোন কুল-কিনারা  
নজরে পড়ল না । এই সাত-আট বছরে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক  
পরিবর্তন হয়েছিল । সাত-আট বছর আগে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য  
আমি কর্মজীবন শুরু করেছিলাম, কিন্তু সাত-আট বছর পরে আমি

শুধু বাঁচতে চাইনি। সক্ষ সক্ষ মাঝুরের অরণ্যের মধ্যে আমি হারিয়ে যেতে চাইনি। চাইনি শুধু অঙ্গ-বন্ধ-বাসস্থানের সমস্তার সমাধান করতে। মনে মনে আরো কিছু আশা করছিলাম।

কিন্তু আশা করলেই তো আর সবকিছু পাওয়া যায় না। তাছাড়া শুধু আশা করে আর কতদিন নিরবচ্ছিন্নতাবে সংগ্রাম করা যায়? আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। মনের শক্তি, দেহের তেজ যেন আস্তে আস্তে হারাতে শুরু করলাম। হাজার হোক ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে।

কাজকর্মে ফাঁকি দিতে শুরু করলাম। ঘুরে-ফিরে নিভ্য-নতুন খবর যোগাড় করার চাইতে নিউজ ডিপার্টমেন্টে সাব-এডিটরদের সঙ্গে আড়তা দেওয়াই আমার কাছে বেশী আর্কিফীয় হলো। শুধু আমাদের অফিসে নয়, আরো অনেক আড়তাখানায় যাতায়াত শুরু করলাম। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেমন যেন দার্শনিকস্থলভূত ঔদাসীন্য দেখা দিল। মোদ্দা-কথায় আমি বেশ পাঁটাতে শুরু করলাম।

বেশীদিন নয়, আর কিছুকাল এমনি করে চললে আমি নিশ্চয়ই চিরকালের মত চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতাম। ঠিক এমনি এক চরম মুহূর্তে ঘটে গেল সেই অব্যটন।

শাস্তিনিকেতন থেকে ফিরছিলাম কলকাতা। বোলপুর স্টেশনে দানাপুর প্যাসেঞ্জারে আমার কামরায় আরো অনেকে উঠলেন। ভিড়ের মধ্যে কোনমতে এক পাশে জায়গা করে আমি বসে পড়লাম। জানলার পাশে মাথাটা রেখে আনমনা হয়ে কিছুক্ষণ কি যে দেখছিলাম। হ'চারটে স্টেশনও পার হয়ে গেল। বীরভূমের লালমাটি আর তালগাছ কখন যে পিছনে ফেলে এসেছি, তাও খেয়াল করলাম না। বাইরে অঙ্ককার নেমে গেলো। উদাস দৃষ্টিকাকে ঘুরিয়ে কামরার মধ্যে নিয়ে এলাম। ভাবছিলাম

কামরাটাকে একটু ভাল করে দেখে নেব। কিন্তু পারলাম না। দৃষ্টিজ্ঞ সামনের দিকে এগতে গিয়েই আটকে পড়ল। এমন বুদ্ধিমুণ্ড উজ্জ্বল গভীর ঘৰকালো টানা-টানা হৃতি চোখ আগে কখনও দেখিনি। একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার দেখলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে আবার দেখলাম। আপাদ-মস্তক ভাল করে দেখলাম। অসভ্যের মত, হাঁচার মত আমি শুধু ঐ দিকেই চেয়ে রইলাম।

আমি যদি খোকনদার মত সাহিত্যের ভাল ছাত্র হতাম ও সংস্কৃত সাহিত্য পড়া থাকত, তাহলে হয়ত কালিদাসের মেষদূতের উত্তরমেঘ থেকে ‘কোট’ করে বলতাম—‘তন্মী শ্রামা শিখরিদশনা পকবিষ্ঠাধরোষ্টি, মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্নমাভিঃ।’ কালিদাসের মত আমি আর এগিয়ে যেতে পারিনি। এইখানেই আটকে গেলাম। তাছাড়া দানাপুর প্যাসেঞ্জারের ঐ কামরায় অতগুলো প্যাসেন্জারের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এর চাইতে বেশী কি এগতে পারা যায়?

পরে অবশ্য মেমসাহেবকে আমি আমার সেদিনের মনের ইচ্ছার কথা বলেছিলাম। ক'মাস পর আমি আর মেমসাহেব দানাপুর প্যাসেঞ্জারেই শাস্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফিরছিলাম। বর্ধমানে এসে কামরাটা প্রায় খালি হয়ে গেল। ও পাশের বেঞ্চিতে শুধু এক বৃক্ষ-বৃক্ষ ছাড়া আর কোন যাত্রী ছিল না। মেমসাহেব আমার হাতের ‘পর মুখটা রেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। আমিও ঘেন কি ভাবছিলাম। হঠাৎ মেমসাহেব আমাকে একটু নাড়া দিয়ে বলল, শোন।

আমি ঠিক খেয়াল করিনি। মেমসাহেব আবার আমাকে ডাক দিল, শোন না।

‘কিছু বলছ?’

মেমসাহেব হাত দিয়ে আমার মুখটাকে নিজের দিকে সুরিয়ে মিল। আঙুল দিয়ে আমার কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে

দিল। ছ'চার মিনিট শুধু চেয়ে রইল আমার দিকে। একটু হাসল। সলজ্জ দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে।

এবার আমি ওর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম আমার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কিছু বলবে ?

আমার দিকে তাকাতে পারল না। ট্রেনের কামরার ঐ স্বল্প আলোয় ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মনে হলো যেন লজ্জায় ওর মুখটা লাল হয়ে গেছে। দেখতে বেশ লাগছিল। ছ'চার মিনিট আমি ওকে প্রাণভরে দেখে নিলাম। তারপর কানে কানে ফিসফিস করে বললাম, লজ্জা করছে ?

মেমসাহেব জবাব দিল না। শুধু হাসল। একটু পরে আমার কানে কানে বলল, একটা কথা বলবে ?

‘বল।’

‘প্রথম যেদিন তুমি আমাকে এমনি ট্রেনে যাবার সময় দেখেছিলে, সেদিন আমাকে তোমার ভাল লেগেছিল ?’

‘মনে হয়েছিল—

তঙ্গী শ্বামা শিখরিদশনা পক্ষবিশ্বাধরোষী,  
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।  
ঙ্গীতারাদলসগমনা স্তোকনত্বা স্তনাভ্যাঃ,  
যা তত্ত্ব শান্ত্যবিষয়ে স্থিতাত্ত্বে ধাতৃঃ।’

মেমসাহেব ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মেরে বলল, অসভ্য কোথাকার !

‘ছি, ছি, মেমসাহেব, তুমি আমাকে অসভ্য বললে। অসভ্য বলতে হলে কালিদাসকে অসভ্য বলো।’

আমি একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি রামায়ণ পড়েছ ?

‘কেন ? এবার বুঝি রামায়ণের একটা কোটিশন শোনাবে ?’

‘আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।’

‘পড়েছি।’

‘যুল রামায়ণ বা তার অমুবাদ পড়েছি?’

‘যুল সংস্কৃত রামায়ণ পড়িনি, কিন্তু অমুবাদ পড়েছি।’

‘তেরী গুড় ! দণ্ডকারণ্যে সীতাকে প্রথম দেখার পর রাবণ কি বলেছিলেন জান ?’

‘সীতার কাপের তারিফ করেছিলেন, কিন্তু ঠিক কি বলেছিলেন, তা মনে নেই।’

‘বেশ তো আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। রাবণ সীতাকে বলেছিলেন—’

মেমসাহেব বাধা দিয়ে বললো, ‘তোমার আর শোনাতে হবে না। ঠিক লাইনগুলো মনে না থাকলেও আমি জানি রাবণ কি ধরনের সংঘাতিক বর্ণনা করেছিলেন।’

একটু থেমে দৃষ্টিটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আমার মুখের কাছে মুখটা এনে বলল, তুমিও তো আর এক রাবণ। ডাকাত কোথাকার ! দিনে ছপুরে কলকাতা শহরের মধ্যে আমাকে চুরি করলে।

যাকগে সেসব কথা। সেদিন শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছিলাম। চুরি করে দেখতে দেখতে একবার ধরা পড়লাম। চোখে চোখ পড়তেই আমি দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু মিনিটখানেক পরেই আবার চেয়েছি। আবার ধরা পড়েছি। আবার চেয়েছি, আবার ধরা পড়েছি।

‘মেমসাহেবের আর ছাঁটি বস্তু কিছু ধরতে না পারলেও হাওড়া স্টেশনে পৌছবার পর কামরা থেকে বেঙ্গবার সময় আমার মনটা যে ঝারাপ হয়ে গিয়েছিল, তা ও বেশ বুরতে পেরেছিল। কিন্তু কি করা যাবে ? দুজনের কেউই কিছু বলতে পারিনি। জীবনের বর্ষণমুখের পথ চলতে গিয়ে এমনি একটু-আধটু বিহ্যাতের চমকানি তো সবার জীবনেই দেখা দিতে পারে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অস্বাভাবিকতাও কিছু নেই।

ওরা তিনি বস্তু কামরা থেকে নামবার বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি  
নামলাম। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিলাম গেটের দিকে।  
আরেকবার তাকিয়ে নিলাম শুর দিকে। মনে মনে ভাবছিলাম,  
এইত এক্সুনি গেট পার হলেই তুজনে হারিয়ে যাব কলকাতা শহরের  
জনাবণ্যের মধ্যে। আর হয়ত জীবনেও কোনদিন দেখা হবে না।  
হয়ত কেন? নিশ্চয়ই কোনদিন দেখা হবে না। হঠাত গেটের  
দিকে তাকাতে নজর পড়ল, মেমসাহেব একবার মুহূর্তের জন্য থম্কে  
ঢাঢ়িয়ে পিছন ফিরল। আমি দূর থেকে হাত নেড়ে শুকে বিদায়  
জানলাম।

কেউ বুল না, কেউ জানল না, কি ঘটে গেল। এমন কি  
আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি কি হয়ে গেল। আমি তো এর আগে  
কোনদিন কোন মেয়ের দিকে অমন করে দেখিনি, কোন মেয়েও  
তো অমন করে আমাকে মাতাল করে তোলে নি। কেন এমন  
হলো? শুধু বুঝেছিলাম, বিধাতাপুরষের নিশ্চয়ই কোন ইঙ্গিত  
আছে। আর মনে মনে জেনেছিলাম, দেখা আমাদের হবেই।

বিশ্বাস কর দোলাবৌদি, শুধু আমার চোখের নেশা নয়, শুধু  
মেমসাহেবের দেহের আকর্ষণও নয়, আরো কি যেন একটা অশ্র্য  
টান অনুভব করেছিলাম মনের মধ্যে। মনে মনে বেশ উপলক্ষ  
করলাম যে, আমার জীবনযুক্তের নতুন সেনাপতি হাজির! এই নতুন  
সেনাপতি আমাকে সহজে পরাজয় বরণ করতে দেবে না, আমাকে  
পিছিয়ে যেতে দেবে না। আমাকে হারিয়ে যেতে দেবে না ভবিষ্যতের  
অঙ্ককারে।

অদৃষ্ট যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, কি অশ্র্যভাবে  
হচ্ছি অপরিচিত মানুষকে নিবিড় করে এক সূত্রে বেঁধে দেয়, তা  
তাবলে চমকে উঠি।

পরের দিন বেশ দেরি করে অফিসে গেলাম। চীফ রিপোর্টার  
আশা করেন নি আমি অফিসে আসব। তাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের

মিটিং আৰু গোটা তিনেক প্ৰেস কনফাৰেন্স কভাই কৱাৰ ব্যবহাৰ  
আগেই কৱেছিলেন। তবুও আমি যেতেই উনি লাকয়ে উঠলেন  
দেখে আশ্চৰ্য হলাম। জিজ্ঞাসা কৱলাম, কি ব্যাপার?

‘তুমি দৌড়ে একবাৰ পাৰ্ক স্ট্ৰীট আৰ্ট ইন ইণ্ডিষ্ট্ৰীল গিয়ে  
যামিনী রায়ের একজিবিশনটি দেখে এসো। আজই শেষ দিন।  
ওৱ একটা রিভিউ না বেঁকলে দোতলায় উঠতে পাৱছি না।’

বুৰুলাম উপরওয়ালারা বার বার বলা সত্ত্বেও একজিবিশনটিৰ  
রিভিউ ছাপা হয় নি এবং এডিটৰ সাহেব বেশ অসন্তুষ্ট।

কলকাতাৰ অন্যান্য রিপোর্টাৰদেৱ মত আমিও মৃত্যু-গীত বা  
শিল্পকলা বুৰুলাম না, কিন্তু প্ৰয়োজনবোধে কলমেৱ পৱ কলম  
রিপোর্ট লিখতে পাৰতাম ওসব নিয়ে। কেন তানসেন-সদাৱডও  
তো কভাই কৱেছি। বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব গাইবাৰ আগে  
স্টেজেৱ পাশে ঝ্যাকবোৰ্ডে ‘রাগ’ ইত্যাদি লিখে দিত। আমাৰ মত  
সঙ্গীতবিশ্বাৰদ রিপোর্টাৰেৱ দল সেই ফৰ্মুলা ভাণ্ডিয়েই বেশ এক  
প্যারা লিখে দিতাম। শেষে আবাৰ বাছাহুৰী কৱে হয়ত মন্তব্য  
লিখতাম, গতবাৱেৱ চাইতেও এবাৱেৱ খাঁ সাহেবেৱ গান অনেক  
বেশী মেজাজী হয়েছিল। অথবা লিখেছি, রাগ রাগেখৰীতে  
সেতাৱ বাজিয়ে মুক্ষ কৱলেন রবিশক্ত। অনেক ভিন্নমত পোষণ  
কৱলেও আমাৰ মনে হয় রাগ রাগেখৰীতেই রবিশক্ত তাঁৰ  
শিল্পীসন্তাকে সব চাইতে বেশী প্ৰকাশ কৱতে পাৱেন।

কেন মহাজাতি সদনেৱ রবিশক্ত সম্মেলনে? রোজ অন্তত  
এক কলম লিখতেই হতো। লিখেছি, আজকেৱ অধিবেশনেৱ  
সব চাইতে উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন দ্বিজেন মুখার্জি। বিশেষ  
কৱে তাঁৰ শেষ গানখানি ‘ভৱা থাক ভৱা থাক শৃতি-শুধায় বিদায়েৱ  
পাত্ৰখানি’ বছদিন ভুলতে পাৱব না। গত বছৱেৱ সম্মেলনে এই  
গানখানিই আৱ একজন থ্যাতনামা শিল্পী গেয়েছিলেন। ভালই  
গেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও যেন এত ভাল লাগে নি। বোধ কৱি

দূরদের অভাব ছিল। তাহাড়া কিছু কিছু গান আছে বা বিশেষ বিশেষ শিল্পীর কাছেই তাল লাগে। ‘চেত্র দিনের বরা পাতার পথে’ অনেকেই গাইতে পারেন, কিন্তু পঙ্কজ মল্লিকের মত কি আর কেউ গাইতে পারবেন? কেন সায়গলের গাওয়া ‘আমি তোমায় ধন্ত’ বা কানন দেবীর ‘সেদিন তুঞ্জনে তুলেছিলু বনে’?...

এমনি করে কিছুটা কমনসেল আর কলমের জোরে রিপোর্টারের দল বেশ কাজ চালিয়ে যান। খবরের কাগজের রিপোর্টারদ্বা অনেকটা মফস্বলের ডাক্তারবাবুদের মত। কিছুতেই বিশেষজ্ঞ নন, অথচ সব কিছু রোগেরই চিকিৎসা করেন। প্রয়োজনবোধে ছুরি-কাঁচি নিয়ে একটা ছেঁড়া অ্যাপ্রন গায় চাপিয়ে পঞ্চানন চাঁচ্জে বা মুরারী মুখার্জির ভূমিকায় অবর্তীর্ণ হতেও দ্বিধা করেন না।

সুতরাং আমিও দ্বিধা না করে চলে গেলাম যামিনী রায়ের একজিবিশন রিভিউ করতে।

একেই একজিবিশনের শেষ দিন, তারপর আর্ট ইন ইণ্ডিয়ার ছোট ঘর। বেশ ভিড় হয়েছিল। তবুও আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে কিছু কিছু নেট নিছিলাম। একটা হলের দেখা শেষ করে পাশের হলটায় যাবার মুখে অক্ষাৎ দেখা গেলাম মেমসাহেবের। তাবলে আশ্চর্য লাগে, কিন্তু হাজার হোক Truth is stranger than fiction. তাই না দোলাবৌদি?

প্রায় তুঞ্জনেই একসঙ্গে বললাম, আরে আপনি?

‘আপনি বুঝি যামিনী রায়ের ভক্ত?’—আমাকে প্রশ্ন করে মেমসাহেব।

‘পঞ্চাশ টাকা মাইনের রিপোর্টারী করি বলে এই আধ-ঘণ্টার জন্য ভক্ত হয়েছি।’

‘আপনি বুঝি রিপোর্টার?’

‘নির্লজ্জ আর বেহায়াপনা দেখে এখনও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে?’

‘ছি, ছি, ওকথা কেন বলছেন?’ পাশের পেন্টিংটা এক

নজর দেখে মেমসাহেব মন্তব্য করল, রিপোর্টারদের তো ভাবী  
মজা।

আমি দীর্ঘনিঃখাস ফেলে বললাম, ‘নদীর এপার কহে ছাড়িয়া  
নিঃখাস...’

শেষ করতে হয় না। তার আগেই বলল, আপনি দেখছি  
রবীন্দ্রনাথেরও তত্ত্ব।

হঠাতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ‘আর একটু পরে দেখবেন আমি  
আপনারও তত্ত্ব।’

লোকের ভিড়ের মধ্যে আর কথা হলো না। এই ছ’এক  
মিনিটের মধ্যেই কিছু কিছু কলারসিক বেশ এক ঝলক আমাদের  
দেখে নিলেন।

পাশের হলটা চটপট ঘূরে দেখে নিয়ে আমরা হজনেই একসঙ্গে  
বেরিয়ে এলাম।

এখন রাত প্রায় দেড়টা বাজে। তাই আজ আর লিখছি না।  
কালকে সকাল সকাল উঠতে হবে। নটার সময় প্রাইম-  
মিনিস্টারের মাহলি প্রেস কনফারেন্স। সুতরাং তুমি বেশ বুঝতে  
পারছ কাল সকালে আমার কি হৃর্ষেগ আছে।

কাল তো তোমাদের হজনেরই ছুটি। তোমরা নিশ্চয়ই এখনও  
শুমোগুনি। বেশ কল্পনা করতে পারছি খোকনদা তোমার কোলের ‘পর  
মাথা। দিয়ে শুয়ে আছে আর তুমি তোমার ঐ বিখ্যাত বেস্তুরো  
গলায় তাঁকে একটা পচা প্রেমের গান শোনাচ্ছ। তাই না?

ତୁମି ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଖୋକନଦାର ଦେଖା ପେଯେଛିଲେ, ସେଦିନ ଖୋକନଦାରେମାତ୍ରାକେ କି ବଲେ ସମ୍ମୋଧନ କରେଛିଲ, କି ଭାଷାଯ କଥା ବଲେଛିଲ, କି ମେ ବଲେଛିଲ, ଆମି ମେସବ କିଛୁଇ ଜାନି ନା । ସେଦିନ ତୁମି କିଭାବେ ଓକେ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେ, ତାଓ ଜାନି ନା । ତବେ ବେଶ କଲାନା କରେ ନିତେ ପାରି ତୁମିଇ ଆଗେ ଖୋକନଦାର ମାଥାଟା ଥେଯେଛ । କିଛୁ କବଚ-ମାତ୍ରଳୀ ଧାରଣ କରେଛିଲେ କିନା ଜାନି ନା ; ତବେ କିଛୁ ନା କିଛୁ ଏକଟା ନିଶ୍ଚଯିତା କରେଛିଲେ । ନୟତ ଖୋକନଦାର ମତ ହେଲେ...

ତୁମି ରାଗ କରଛ ? ରାଗ କରୋ ନା । ତବେ ତୋମାଦେର ସ୍ଵାପାରଟାର ଏହି ରହନ୍ତରା ଆଦି ପର୍ବଟା ଜାନା ଥାକଲେ ଆମାର ଅନେକ ଶୁଭିଧେ ହତୋ । ତାଇତୋ ସେଦିନ ଆର୍ଟ ଇନ ଇଣ୍ଡାସ୍ଟ୍ରି ଥେକେ ବେଳବାର ପର କି ବଲବ, କି କରବ କୋଥାଯ ଯାବ, କିଛୁଇ ତେବେ ପାଞ୍ଚିଲାମ ନା । ପାର୍କ ସ୍ଟ୍ରିଟ ଛେଡେ ଚୌରଙ୍ଗୀ ଧରେ ଏସପ୍ଲାନେଡେର ଦିକେ ଏଗୁତେ ଏଗୁତେ ଶୁଦ୍ଧ ବଲେଛିଲାମ, ଆମି ଜାନତାମ ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଆମାର ଦେଖା ହବେ ।

‘ସତିୟ ?’

‘ସତିୟ ।’

‘ଆଜଇ ଦେଖା ହବେ, ଏକଥା ଜାନତେନ ?’

‘ନା, ତା ଜାନତାମ ନା । ତବେ ଜାନତାମ ଦେଖା ହବେଇ ।’

ମେମ୍‌ସାହେବ ଥମକେ ଦ୍ଵାରିଯେ ପଡ଼ିଲ । ଘାଡ଼ ବେଁକିଯେ ଆମାର ଦିକେ ଫିରେ ବେଶ ଏକଟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲ, କି କରେ ଜାନତେନ ଯେ ଆମାଦେର ଦେଖା ହବେଇ ?

ଆମି ସରାସରି ଉତ୍ତର ନା ଦିଯେ ପାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରି, ଆପନାର ବାବା କି ଲିଗ୍‌ଜ୍‌ଯାଲ ପ୍ରାକ୍‌ଟିଶନାର ?

‘ইঠাঁ’ একথা জিজ্ঞাসা করছেন?’ সন্দেহের রেখা ফুটে উঠল  
মেমসাহেবের কপালে।

‘তয় পাবেন না, আমি দশ্য মোহন বা ডিটেক্টিভ কিরীটী রায়  
নই।’

কিড স্ট্রাইট পার হলাম। বেশ বুঝতে পারলাম মেমসাহেবের মন  
থেকে সন্দেহের মেঘ কেটে যায় নি। তাইতো বললাম, আপনি  
যে ল’ পড়েন নি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে যেভাবে  
জেরা করতে শুরু করেছিলেন, তাতেই মনে হলো, আপনি বোধহয়  
ল-ইয়ারের মেয়ে।’

মেমসাহেব এবার হেসে ফেললো। বোধহয় মনটাও একটু  
হালকা হলো।

মিনিট কয়েক ছজনেই চুপচাপ। মিউজিয়াম পার হয়ে এলাম,  
শ্বাই-এম-সি-এ পিছনে ফেললাম। লিঙ্গসে স্ট্রাইটের মোড়ে এসে  
পড়লাম। আরো এগিয়ে গেলাম। ফিরপো পার হয়ে আর  
সোজা না গিয়ে রঞ্জীর দিকে ঘূরলাম। সৌনত। ভাঙলাম আমি,  
চা খাবেন?

‘চা? বিশেষ খাই না, তবে চলুন খাওয়া যাক।’

পাশের রেস্টোরাঁর একটা কেবিনে বসলাম। বেয়ারা এলো।  
হাতের তোয়ালে দিয়ে পরিষ্কার টেবিলটা আর একবার মুছে দিল।  
নোংরা মেঘু কার্ডটা আমার সামনে দিয়ে এক নজর দেখে নিল  
মেমসাহেবকে।

‘ছ’টো ফিস ঝাই, ছ’টো চা।’

বেয়ারা বিদায় নিল। কিছু বলব বলব ভাবতেই ক’ মিনিট  
কেটে গেল। ইতিমধ্যে বেয়ারা ছটো ফর্ক আর ছটো ছুরি এনে  
আমাদের ছজনের সামনে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল। আবার  
তাবছি কিছু বলব। কিন্তু বলা হলো না। বেয়ারাটা আবার  
এলো। এক শিশি সস্ত আর ছ’ গেলাস জল দিয়ে গেল। বুঝলাম-

বেয়ারাটা। বুবোহে নতুন জুড়ী এবং সেজন্ট ইম্প্রিমেন্টে কাজ করছে। কিস ক্রাই'এর প্লেট ছুটো নিয়ে বেয়ারাটা আসবাব আগেই জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু ভাবছেন?

‘আচলটা টেনে নিয়ে মেমসাহেব বলল, ‘না, তেমন কিছু না।’

‘তেমন কিছু না হলেও কিছু তো ভাবছেন?’

কিস ক্রাই এসে গেল। আমি একটা টুকরো মুখে পুরলাম কিন্তু ফর্কটা হাতে নিয়ে মেমসাহেব কি যেন ভাবছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কিছু বলবেন?’

‘একটা কথা বলবেন?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘আমাদের দেখা হবে, একথা আপনি জানলেন কি করে?’

‘কি করে জানলাম তা জানি না, তবে মনের অধ্যে স্থির বিশ্বাস ছিল যে আপনার সঙ্গে দেখা হবেই।’

‘শুধু মনের বিশ্বাস?’

‘হ্যাঁ।’

সেদিন একে প্রথম সাক্ষাৎকার তারপর ঐ ছোকরা বেয়ারাটার অতিরিক্ত কর্তব্যপরায়ণতার জন্য আর বিশেষ কথা হলো না। তবে ঐ কেবিন থেকে বেরুবার আগে আমার নোটবই-এর একটা পাতা ছিঁড়ে অফিসের টেলিফোন নম্বরটা লিখে দিলাম। শুধু বলেছিলাম, সম্ভব হলে টেলিফোন করবেন।

কিছুটা লজ্জায় আর কিছুটা ইচ্ছা করেই আমি ওর নাম-ধার ঠিকানা কিছুই জানতে চাইলাম না। মনে মনে অনেক কিছু ইচ্ছা করছিল। ইচ্ছা করছিল বলি, ‘তুম মুখাতিব ভী হো, করিব ভী হো, তুমকে। দেখু, কী তুমসে বাত করু।’—তুমি আমার কাছে বসে আছ, কথা বলছ। তুমই বল, তোমাকে দেখব, না তোমার সঙ্গে কথা বলব।

আবার ভাবছিলাম, না, না! তার চাইতে বরং প্রশ্ন করি,

আখে মেঁ হি রহে হো, দিলসে নেহি গ্যায়ে হো, হয়রান হুঁ সকী  
আই তুমে কাহাসে ?—সব সময় তুমি আমার চোখে, তুমি আমার  
হৃদয়ে রয়েছ। ভাবতে পারি না কি ভাবে তুমি আমার হৃদয়-বাবে  
এমন ভাবে নিজের আসন বিছিয়ে নিলে।

সত্যি বলছি দোলার্বোদি, ওকে কাছে পেয়ে, পাশে দেখে বেশ  
অচুভব করছিলাম, এ তো সেই, যার দেখা পাবার জন্য আমি এত  
দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছি, এত দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছি। মনে  
মনে বেশ অচুভব করছিলাম এবার আমার দিন আগত ত্রি।

আরো অনেক অনেক কিছু ভেবেছিলাম। সে সব কথা আজ  
আর লিখে এই চিঠি অথবা দীর্ঘ করব না। তবে শুধু জেনে রাখ,  
মেমসাহেব এক এবং অবিভীয়। এই পৃথিবীতে আরো অসংখ্য  
কোটি কোটি মেয়ে আছেন, তাঁদের প্রেম-ভালবাসায় কোটি কোটি  
পুরুষের জীবন ধন্য হয়েছে। তাঁদের স্পর্শে অনেকেরই ঘূর্ম ভেঙেছে।  
আমি তাঁদের সবার উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা জানাই, ক্ষতজ্ঞতা জানাই।  
আমি জানি আমার কালো মেমসাহেবের চাইতে অনেক মেয়েই  
সুন্দরী, অনেকেই ওর চাইতে অনেক বেশী শিক্ষিত। তবে  
একথাও জানি আমার জন্য এই পৃথিবীতে একটিমাত্র মেয়েই  
এসেছে এবং সে আমার ত্রি মেমসাহেব। মেমসাহেব ছাড়া আর  
কেউ পারত না আমাকে এমন করে গড়ে স্টুলতে। মাটি দিয়ে  
তো সব শিল্পীই পুতুল গড়ে। কিন্তু সব শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য কি  
সমান ? মেমসাহেব আমার সেই অনগ্রা জীবন-শিল্পী যে কাদা-  
মাটি দিয়ে আমার খেকে আজ একটা প্রাণবন্ত পুতুল গড়ে তুলেছে।

তুমি শুনলে অবাক হবে আমি সেদিন ওর বাসে পর্যন্ত ঝঠার  
অপেক্ষা করলাম না। আমি আগেই একটা বাসে ঢঢ়ে অফিসে  
চলে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমি তো ওর জন্য অনেক  
ভেবেছি, ভাবছি। এবার না-হয় রেকর্ডের উল্লেখ দিকটা দেখা যাক।  
দেখা যাক না ও আমার জন্য ভাবে কিনা !

বাত্রে অফিসে কিরেই দেখি বেশ চাঁধল্য। সক্ষ্যার পরই টেলিপ্রিন্টারে নিউজ এজেন্সীর খবর এসেছে পূর্ব-পাকিস্থানের বাগেরহাটে খুব গঙ্গোল হয়েছে। কি ধরনের গঙ্গোল হলো এবং কলকাতায় কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেই চিন্তায় সবাই উৎকৃষ্ট। পরের দিন আমার ডিউটি পড়ল শিয়ালদহ স্টেশনে। পূর্ব-পাকিস্থানের ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করে সেখানকার পরিস্থিতি জানতে হবে। রিপোর্ট করতে হবে। পরের দিন খুলনার ট্রেনটি এসেছিল, তবে অনেক দেরি করে। প্লাটকর্ম থেকে আজে-বাজে লোক আগে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছু সরকারী কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। বাগেরহাটের পরিস্থিতি জানবার পর ওরা সবাই আগত যাত্রীদের ছেঁশিয়ার করে দিলেন, অথবা বা মিথ্যা গুজব ছড়াবেন না।

যাত্রীদের কথাবার্তা শুনে বেশ বুঝতে পারলাম অবস্থা বেশ গুরুতর। কোথা থেকে কিভাবে যে গঙ্গোল হলো, সেকথা কেউ বলতে পারলেন না। তবে যাত্রাপুরের এক ভদ্রলোক জানালেন যে, বাগেরহাটের এক জনসভায় পশ্চিম-পাকিস্থানের এক নেতা বকৃতা দেবার পরই ওখানে প্রথমে কিছু লুটপাট শুরু হয়। তৃতীয় দিন পরে ছুরির খেলা শুরু হলো। গুণাদের হাতে প্রথম দিনেই প্রাণ দিলেন লুৎফুর রহমন।

শিয়ালদহ স্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে ছটো ট্রাঙ্কের 'পর' বসে আমরা দুজনে কথা বলছিলাম। কথা বলছিলাম নয়, কথা শুনছিলাম। ভদ্রলোক আগে একটা ছোট স্কুলে মাস্টারী করতেন। অনেকদিন মাস্টারী করেছেন ঐ একই স্কুলে। বাগেরহাটের সবাই ওকে চিনতেন, ভালবাসতেন। অধিকাংশ ছাত্রই মুসলমান ছিল কিন্তু তা হোক। ওরাও ওকে বেশ শ্রদ্ধা করত। লুৎফুর সাহেব যখন ঐ স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন, তখন স্কুলবাড়ি দোতলা হলো, ছেলেদের ভলিবল খেলার ব্যবস্থা হলো, দশ-পনের টাকা করে

মাস্টার ইশাইদের মাইনেও বাড়ল। কি জানি কি কারণে পরের বছর  
সরকার স্কুল-কমিটি বাতিল করে দিলেন। ক' মাস পরে স্কুলের  
তহবিল তচক্কপের অভিযোগে লুৎফর সাহেবকে গ্রেপ্তার করা  
হয়, কিন্তু কোটে দেসব কিছুই প্রমাণিত হলো না।

ইতিমধ্যে স্কুলের নতুন কর্তৃপক্ষ ভদ্রজোকের চাকরি খতম করে  
দিলেন অযোগ্যতার অভিযোগে। অনঙ্গোপায় হয়ে একটা দোকান  
খুললেন। প্রথম প্রথম বিক্রী লাগত দোকানদারী করতে। কিন্তু  
কি করবেন? পরে অবশ্য মন লেগেছিল ব্যবসায়ে। ব্যবসাটাও  
বেশ জমে উঠেছিল। পোড়া কপালে তাও টিকল না। এবারের  
গুণগোলে দোকানটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এসব কাহিনী আমার না জানলেও চলত, কিন্তু কি করব।  
আর এমন কোন যাত্রী পেলাম না যার কথায় ভরসা করে রিপোর্ট  
লেখা যায়। তাই চুপচাপ বসে শুনছিলাম। তবে এতক্ষণ ধৈর্য  
ধরে এত কথা শোনার পূরক্ষার পেলাম পরে।

লুৎফর সাহেব ছাত্র-কংগ্রেসে ছিলেন। পরে  
গুকালতি করার সময় রাজনীতি প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব-  
পাকিস্থানের রাজনৈতিক আবহাওয়া জটিল হবার সঙ্গে সঙ্গে লুৎফর  
সাহেব আবার রাজনীতি শুরু করলেন। সারা খুলনা জেলা লুৎফর  
সাহেবের কথায় উঠত, বসত। সারা জেলার মধ্যে কোন অভ্যাস  
অবিচারের কথা শুনলেই গর্জে উঠেছেন। খুলনা ডকের কয়েক  
হাজার বাঙালী মুসলমান প্রমিক অনেক দিনের অনেক অত্যাচার  
আর অপমানের বিকল্পে প্রথম গর্জে উঠেছিল লুৎফর সাহেবেরই  
নেতৃত্বে।

পূর্ব-পাকিস্থানের মসনদ থেকে ফজলুল হক সাহেবকে অপসারিত  
করে ইন্ডিয়ার মির্জা পূর্ব বাংলাকে শৌয়েন্টা করবার জন্য ঢাকায়  
আসার কিছুকালের মধ্যেই লুৎফর সাহেবকে ডেকে পাঠান  
লুৎফর সাহেব লাটিসাহেবের নেমস্টন্স খেতে ঢাকা গিয়েছিলেন।

তবে একবেলা বৃক্ষগজার ইলিশ খাইয়েই সে নেমস্তন্ত্র থাওয়া শেষ হয় নি। ছাঁটি বছর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বিভাগ মেবার পর লুৎফুর সাহেব খুলনা আসার অনুমতি পানি।

খুলনা ফেরার পর লুৎফুর সাহেব আরো বেশী কথে দাঢ়ালেন।

আমার অফিসে ফিরে রিপোর্ট লিখতে হবে। এত দীর্ঘ কাহিনী শোনার অবসর ছিল না। তাই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, লুৎফুর সাহেব আজকাল কি করেন?

—লুৎফুর সাহেব আর নেই। এই দাঙ্গায় বাগেরহাটের প্রথম বলি হলেন লুৎফুর।

‘সে কি বলছেন?’

‘আমাদেরও তো এই একই প্রশ্ন।’

‘তবুও কি মনে হয়?’

‘বাগেরহাটের লাহোর কটন মিলে অনেকদিন ধরেই অমিক ধর্মঘট চলছে। লুৎফুর সাহেব ওদের লৌড়ার। কিছুদিন ধরেই আমরা শুনছিলাম লুৎফুর সাহেবকে শায়েস্তা করার জন্য শহরে নাকি বাইরের অনেক গুণ্ডা এসেছে। আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি; কারণ—বাগেরহাট শহরে লুৎফুর সাহেবের গায় হাত দেবার সাহস স্বয়ং ইঙ্কান্দার মির্জারও হয় নি। কিন্তু এরই মধ্যে সর্বনাশ দাঙ্গা শুরু হলো বুধবার সক্ষ্যার দিকে। পরের দিন বাড়ির থেকে বাইরে যাইনি। শুক্রবার সকালে দোকানটা দেখতে গিয়ে শুনি লুৎফুর সাহেব শেষ।’

আমি বেশ বুঝতে পারলাম লুৎফুর সাহেবকে সরাবার জগতে লাহোর কটন মিলের মালিকদের চক্রান্তে বাগেরহাটে গণগোল বাধানো হয়েছে। কেননা, শহরের অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে লুৎফুর সাহেবকে শেষ করা যেত না।

অফিসে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হলো। বেশ ক্লান্ত বোধ

করছিলৰম। তবুও চটপট করে ‘বাগেরহাটে’র দাঙাৰ নেপথ্য কাহিনী লিখে ফেলাম।

তাই সাবাদিন মেমসাহেবেৰ কথা ভাববাৰ ঠিক সময় পেলাম না।

পৰৱেৰ দিন আমাৰ উইকলি অফ ছিল। অফিসে গেলাম না। তাৰ পৰৱেৰ দিন আমাৰ টেলিফোন ডিউটি ছিল। তাই একটু দেৱি কৰেই অফিসে গেলাম।

এখনকাৰ মত তখন ডায়াল ঘূৰালেই নসৱ পাওয়া যেত না। অপাৱেটৱেৰ ওপৱ নিৰ্ভৱ কৱতে হতো। খবৱেৰ কাগজেৰ রিপোর্টৱেৰ নাইট-টেলিফোন ডিউটি একটা বিচ্ছি ব্যাপার। পুলিস, হাসপাতাল, এ্যাম্বুলেন্স, ডক, ৱেল-পুলিস, ৱেল স্টেশন, দমদম এয়াৱপোর্ট ইত্যাদি জায়গার থেকে দৈনন্দিন টুকটাক ‘লোকাল’ নিউজ পাবাৰ জন্মে প্ৰায় শতখানেক টেলিফোন কৱতে হতো। আমাদেৱ কাগজেৰ পাঢ়াতে এবং একই টেলিফোন একচেঞ্জে আৱো চাৰ-পঁচটি কাগজেৰ অফিস ছিল। একচেঞ্জেৰ অপাৱেটৱৰা প্ৰতি রাত্ৰে এই লাইন দিতে দিতে প্ৰায় রিপোর্টৰ হয়ে উঠেছিলেন। নাস্তাৰ বলবাৰ প্ৰয়োজনও হতো না; শুধু বললেই হতো, রিভাৱ পুলিস দেবেন নাকি?

উত্তৱ আসত, রিভাৱ পুলিস এনগেজ। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া কথা বলছে।

এখনকাৰ মত তখন এৱাবপোর্ট রিপোর্টৰ বলে কিছু ছিল না। তাই সাধাৱণ ছোটখাটো খবৱেৰ জন্ম এয়াৱপোর্ট পুলিস-সিকি-টুরিটিতে রোজ রাত্তিৱে ফোন কৱতে হতো। তাইতো রিভাৱ পুলিস না পেয়ে বলতাম, এয়াৱপোর্ট দিন।

অপাৱেটৱ সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতেন, সিকিমেৱ মহাৱাজাৱ এ্যারাইভাল ছাড়া আজ আৱ কিছু নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই আবাৰ হয়ত বলতেন, এবাৱ নৌলৱতনেৱ

সঙ্গে কথা বলুন। কি একটা সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্টের খবর আছে।

সব অপারেটরই যে এইরকম সাহায্য করতেন, তা নয়। তবে অধিকাংশ মেয়েই খুব সহযোগিতা করতেন। রাত্রে টেলিফোন ডিউটি করতে করতে বহু অপারেটরের সঙ্গে অনেক রিপোর্টারেরই বেশ মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নানা অবস্থায় রিপোর্টাররাও যেমন অপারেটরদের সাহায্য করতেন, তেমনি অপারেটররাও রিপোর্টারদের যথেষ্ট উপকার করতেন।

কোন কোনদিন খবরের চাপ বিশেষ বা থাকলে অনেক সময় আমরা নিজেদের মুখ-চূঁথের কথা বলতাম। এইরকম কথাবার্তা বলতে বলতেই আমরা টেলিফোন এক্সচেণ্জের অনেক কাহিনী শুনেছিলাম। জানতে পেরেছিলাম অনেক অফিসারের ‘আনটোল্ড স্টোরি’। কিছু কিছু কাগজে ছাপিয়ে ফাস করেও দেওয়া হয়েছিল। অপারেটরদের উপর অনেক অফিসারের খাম-খেয়ালিপনা বন্ধ হয়েছিল।

অপারেটররাও আমাদের কম উপকার করতেন না। কৈলাশনাথ কাটজু তখন পশ্চিম বাংলার গভর্নর আর ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী। কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ঢজনের মধ্যে তৌর মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে নানা মহলে গুজব শোনা গিয়েছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মত-বিরোধের সঠিক কারণগুলো কেউই জানতে পারছিলাম না। শেষে একদিন অকস্মাত এক টেলিফোন অপারেটর জানালেন, জানেন, আজ একটু আগে টেলিফোনে গভর্নরের সঙ্গে চীক মিনিস্টারের খুব একচোট...

তৃদিন বাদে এই বাগড়ার কাহিনীই আমাদের কাগজের ব্যানার স্টোরি হলো। মোটা মোটা অঙ্করে চার-কলম সামারিতে লেখা হলো, রাজ্যবনের সহিত সংঘর্ষ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মহলের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে রাজ্য পরিচালনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্ষেপালের সহিত মুখ্যমন্ত্রীর মত-বিরোধ দেখা দিয়াছে।...

তথ্য বাংলা দেশের অনসাধারণ বা রাইটার্স বিঙ্গিস-এর কিছু অফিসার নয়, স্বয়ং ডাঃ রায় ও কাটকু সাহেব পর্যন্ত চরকে গিয়েছিলেন এই খবরে। অনেক তদন্ত করেও উরা জানতে পারেন নি কি করে এই চরম গোপনীয় খবর ফাঁস হয়ে গেল।

আমরা অফিসে বসে শুধু হেসেছিলাম। আর ভাবছিলাম ইচ্ছা করলে আরো কত কি আমরা ছাপতে পারতাম কিন্তু ছাপিনি!

এইরকম আরো অনেক চমকপ্রদ খবর পেতাম আমাদের অপারেটর বান্ধবীদের মারফত ও মাঝে মাঝেই বাজার গরম করে তোলা হতো। মন্ত্রী আর অফিসারের দল কানামাছি ভোঁ-ভোঁ করে মিছেই হাতড়ে বেড়াতেন, আর আমরা মুচকি হাসতে হাসতে ঐ মন্ত্রী ও অফিসারদের ঘরে বসে উদের পয়সায় কফি খেয়ে বেড়াতাম।

সেদিন রাতে অফিসে এসে যথারীতি টেলিফোনটা তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, কে কথা বলছেন?

কষ্টহর অপরিচিত নয়। তাই উত্তর আসে, আমি গার্গী।

এক মুহূর্ত পরেই আমাকে শ্রেণি করেন মিস গার্গী চক্রবর্তী, অনেকদিন পর আজ আপনার টেলিফোন ডিউটি পড়ল, তাই না?

উত্তর দিই, না অনেকদিন কোথায়...

গার্গী মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জানতে চায়, কাল আর পরশু আপনি অফিসে আসেন নি?

‘কেন বলুন তো।’

‘আগে বলুন কোথায় ছিলেন দু’দিন।’

‘কোথায় আবার থাকব, কলকাতাতেই ছিলাম। তবে কালকে আমার অফ ছিল। আর পরশু অনেক রাতে অফিসে এসেছিলাম।’

‘তাই বুঝি?’

‘আজ্জে হঁয়া।’

গার্গী চক্ৰবৰ্তী টেলিফোন ছাড়ে না। ইনিয়ে-বিনিয়ে দু'চারটে আলতু-ফালতু কথার পৰ জিজ্ঞাসা কৱল, তাৰপৰ আপনি কেমন আছেন?

‘হঠাতে আজ পঞ্চাশ টাকা মাইনের রিপোর্টারের এত খবৰ নিচ্ছেন, কি ব্যাপার?’

‘যাস্ট এ মিনিট’ বলে গার্গী অঙ্গ কাউকে লাইন দিতে গেল। আমি টেলিফোন ধৰে রইলাম। একটু পৱেই ফিৰে এসো আমাৰ লাইনে। বলল, কাল-পৱশু আপনাৰ অনেক টেলিফোন এসেছিল।

আমি গার্গীকে দেখতে পাই না কিন্তু বেশ অহুভূত কৱতে পারছিলাম ওৱা হাসিখুশী ভৱা মুখখানা। আমি এবাৰ একটু ঠাট্টা কৱে বললাম, ‘আমি তো মিস গার্গী চক্ৰবৰ্তী নই যে আমাৰ অনেক টেলিফোন আসবে।’

‘তাই বুঝি?’

‘আজ্জে হঁয়া।’

গলাৰ স্বৰে একটু অভিনবত্ব এনে গার্গী বলে, ‘অনেকে না হোক একজনও তো অনেকবাৰ টেলিফোন কৱতে পাৱে...যাস্ট এ মিনিট...’

গার্গী আবাৰ লাইন দিতে চলে যায়।

আমি ভাবি কে আপনাকে অনেকবাৰ টেলিফোন কৱতে পাৱে। মেমসাহেব হয়ত একবাৰ টেলিফোন কৱতে পাৱে কিন্তু অনেকবাৰ কে কৱল?

গার্গী এবাৰ ফিৰে এসে বলল, সত্যি বলছি একজন আপনাকে অনেকবাৰ...

‘কিন্তু তাতে আপনাকে এত ইষ্টারেন্ট?’

‘কিছুই না। তবে এতদিন আপনাৰ এই ধৰনেৰ টেলিফোন আসত না বলেই আৱ কি...’

এবার আমার মনে সঙ্গে দেখা দিল। তবে কি মেমসাহেবই ?  
গার্গী বলল, ধরন, আমি তার সঙ্গে কানেকশন করে দিচ্ছি।  
'আপনি বুঝি নাহারটাও জেনে নিয়েছেন ?'

ওদিক থেকে গার্গীর গলার ঘর শুনতে পেলাম না। একটু  
পরেই বলল, নিন, স্পৌত হিয়ার।

আমি বেশ সংযত হয়ে শুধু সম্মোধন করলাম, নমস্কার।  
'নমস্কার !'

'কি খবর বলুন ?'

'কি আর খবর ! আপনারই তো ছদ্মিন পাঞ্জা নেই !'

মেমসাহেব ছদ্মিন ধরে আমাকে খোজ করেছে জেনে বেশ সুন্দী  
হলাম। তবুও আকামি করে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি টেলিফোন  
করেছিলেন ?

'কি আশ্চর্য ! আপনাকে কেউ বলেন নি ?'

আমাদের অফিস আর হরি ষোষের গোয়ালের মধ্যে যে কোন  
পার্থক্য নেই সেকথা মেমসাহেবকে কি করে বোঝাই। তাই  
বললাম, খবরের কাগজের অফিসে এত টেলিফোন আসে যে কারুর  
পক্ষেই মনে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া রোজই তো ডিউটি বদলে  
যাচ্ছে।

মেমসাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কেন ঐ অপারেটর তত্ত্বমহিলা  
আপনাকে বলেন নি ?'

গার্গী হঠাতে আমাদের ছজনের লাইনে এসে বলে গেল, বলেছি।

মেমসাহেব চমকে গেল। আমি কিন্তু জানতাম গার্গী আমাদের  
লাইন ছেড়ে পালাবার পাত্রী নয়।

মেমসাহেব ঘাবড়ে প্রশ্ন করল, কে উনি ?

'মিস গার্গী চক্রবর্তী !'

হাজার হোক মেয়ে তো ! গার্গীর নাম শুনেই মেমসাহেবের  
মনটা সলিঙ্গ হয়ে ওঠে। হয়ত বা ঈর্ষাও। তাই হেঁয়ালি করে

জানতে চাই, আপনার সঙ্গে বুঝি মিস চক্রবর্তীর বিশেষ পরিচয় আছে ?

আমি আপন মনেই একটু হেসে নিই। আর বলি, অধিকাংশ অপারেটরের সঙ্গেই আমাদের প্রায় সব রিপোর্টারদেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে।

আমি আবার টিপ্পনী কেটে জিজ্ঞাসা করি, কোন ছোট প্রেমের গল্পের প্রট এলো নাকি আপনার মাথায় ?

বোধ করি মেমসাহেব বুঝেছিল, গার্গীর বিষয়ে আর প্রশ্ন করার অয়োজন নেই। বললো, ‘কালকে আপনার সঙ্গে দেখা করে প্রটটা ঠিক করব।’

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করি, কাল দেখা হবে ?

‘বিকেলের দিকে হতে পারে।’

‘বিকেল পাঁচটায় লিঙ্গসে স্ট্রাটের মোড়ে আমি আপনার অন্ত অপেক্ষা করব। আসবেন।’

‘হ্যাঁ, আসব।’

দোলাবৌদ্ধি, তুমি তো জান কলকাতার শহরে মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের একটু প্রেম করা কি হুরাহ ব্যাপার। প্রেম করা তো দূরের কথা, একটা গোপন কথা কইবার পর্যন্ত জায়গা নেই কলকাতায়। আমাদের শৈশবে লেকে গিয়ে প্রেম করার পথ চালু ছিল, কিন্তু পরে লেকের জলে এতগুলো ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকা আঘাত্যা করল যে লেকে গিয়ে প্রেম করা তো দূরের কথা, একটু বেড়ানও অসম্ভব হলো।

এমন একটা আশ্চর্য শহর তুমি ছনিয়াতে কোথাও পাবে না। শুধু কলকাতা বাদ দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত শহরে-নগরে কত সুন্দর সুন্দর বেড়াবার জায়গা আছে। নিত্যনতুন আরো সুন্দর সুন্দর বেড়াবার জায়গা তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমাদের কলকাতা ? সেই জব চার্নক আর ক্লাইভ সাহেবের উভারসিয়ারবাবুরা যা করে গেছেন,

আমাদের আমলে তাও চিরকলি না । কলকাতার মাঝৰ গুলোকে বেল় একটা অঙ্কুপের মধ্যে ভরে দিয়ে চাবুক লাগান হচ্ছে অথচ তাদের চোখের জন্য ফেলার একটু সুযোগ বা অবকাশ নেই ।

সমস্ত যুগে সমস্ত দেশের মাঝৰই যৌবন প্রেম করেছে ও করবে । যৌবনের সেই রঙীন দিনগুলোতে তারা সবার থেকে একটু দূরে ধাকবে, একটু আড়াল দিয়ে চলবে । কিন্তু কলকাতায় তা কি সম্ভব ? নতুন বিয়ে করার পর স্বামী-স্ত্রীতে একটু নিভৃতে মনের কথা কইবার জায়গা কোথায় ? মাতৃহারা শিশু বা সন্তানহারা পিতামাতা গলা কাটিয়ে প্রাণ ছেড়ে কাঁদতে পারে না কলকাতায় । এর চাইতে আর কি বড় ট্র্যাজেডী ধাকতে পারে মাঝৰের জীবনে ?

কেতাবে পড়েছি ও নেতাদের বক্তৃতায় শুনেছি বাঙালী নাকি সোন্দর্যের পূজারী, কালচারের ম্যানেজিং এজেন্টস । রুচিবোধ নাকি শুধু বাঙালীরই আছে । কিন্তু হলপ করে বলতে পারি কোন নিরপেক্ষ বিচারক কলকাতা শহর দেখে বাঙালীকে এ অপবাদ নিশ্চয়ই দেবেন না । রবীন্দ্রনাথ যে কিভাবে চিংপুর-জোড়াসাঁকোয় বসে কবিতা লিখেন, তা ভেবে কুলকিনারা পাই না । শেরপিয়র বা বায়রন বা অধুনাকালের টি এস ইলিয়টকে চিংপুরে ছেড়ে দিলে কাব্য করা তো দূরের কথা একটা পোস্টকার্ড লিখতে পারতেন না ।

আশ্চর্য, তবুও বাঙালীর ছেলেমেয়েরা আজো প্রেম করে, কাব্য-চর্চা করে, শিল্প-সাধনা করে । যেখানে একটা কুকুচূড়ার গাছ নেই, যেখানে একটা কোকিলের ডাক শোনা যায় না, দিগন্তের দিকে তাকালে যেখানে শুধু পাটকলের চিমনি আর ধোঁয়া চোখে পড়ে, সেই বিশ্বকর্মার তীর্থক্ষেত্রে আমি আর মেমসাহেবও নতুন জীবন শুরু করলাম ।

## সাত

আমি ভাবছি চিঠিগুলো বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি  
লিখেছ আরো অনেক বড় করে লিখতে। অথবা কদিন ছুটি নিয়ে  
কলকাতায় গিয়ে মুখোয়ুখি সব কিছু বলতে প্রস্তাব করেছে। প্রথম  
কথা, এখন পার্লামেণ্টের বাজেট সেসন চলছে। ছুটি নিয়ে কলকাতা  
যাবার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া নিজের মুখে তোমাকে এ  
কাহিনী আমি শোনাতে পারব না। মেমসাহেব আমাকে কত ভাল-  
বাসত, কত আদর করত, কত রকম করে আদর করত, কেমন করে  
হজনে রাত জেগেছি, সে সব কথা তোমাকে বলব কেমন করে?  
লজ্জায় আমার গলা দিয়ে স্বর বেরণবে না। ভগবান সবাইকে  
কষ্টস্বর দিয়েছেন। কিন্তু সবার কষ্টেই কি সুর আছে? আছে মিষ্টি?  
নেই। কষ্ট থাকলেই কি সব কথা বলা যায়? সুখ-দুঃখ, হাসি-কাঙ্কা,  
আনন্দ-বেদনার সব অঙ্গুভূতিই কি বলা যায়? হয়ত অঙ্গেরা বলতে  
পারে কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সময় থাকলে চিঠিগুলো হয়ত আরো দীর্ঘ হতো। তাছাড়া  
চিঠি লিখতে বসেও কলম থেমে যায় মাঝে মাঝেই। আমাকে  
ফাঁকি দিয়ে মনটা কখন যে অতীত দিনের স্মরণীয় স্মৃতির অরণ্যে  
লুকিয়ে পড়ে, বুঝতে পারি না। অনেকক্ষণ ধরে খোঞ্জাখুঁজির পরে  
দেখি মেমসাহেবের আঁচলের তলায় মন লুকিয়ে আছে। তোমাকে  
এই চিঠিগুলো লিখতে বসে বার বার মনে পড়ে সেসব দিনের স্মৃতি।  
আপন মনে কখনো হাসি, কখনো লজ্জা পাই। কখনো আবার  
মনে হয় মেমসাহেব গান গাইছে এবং বেস্তুরো গলায় আমি  
কোরাস গাইতে চেষ্টা করছি। এই চিঠি লিখতে বসেই আবার  
মনে রিভলবিং স্টেজ ঘুরে যায়, দৃশ্য বদলে যায়। আমার চোখটা

বাপ্সা হয়ে ওঠে। কলমটা খেমে যায়। একটু পরে ছঁচোখ  
বেয়ে জল নিমে আসে।

দোলাবৌদি, তোমাকে চিঠি লিখতে বসে এমনি করে প্রতি  
পদক্ষেপে নিজেকে হায়িয়ে ফেলি। নিজেকেই নিজে হারিয়ে  
ফেলি। কিন্তু তবুও অনেক কষ্টে ফিরে যাই অভীতে এবং আবার  
তোমাকে চিঠি লিখতে বসি।

আগে থেকে তোমাকে দুঃখ দেবার ইচ্ছা আমার নেই।  
যথাসময়ে তুমি আমার চোখের জলের ইতিহাস জানবে। তবে  
জেনে রেখো, আজ সোজা হয়ে দাঢ়াবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত আমার  
নেই। ইঁটবার সাহস নেই, কোনমতে যেন হামাগুড়ি দিয়ে গড়িয়ে  
চলেছি।

তোমার নিশ্চয়ই এসব পড়তে ভাল লাগছে না। মনটা  
হটক্ট করছে আমাদের প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা শুনতে।  
তাই না? শুধু প্রথম দিনের কথাই নয়, আরো অনেক কিছুই  
তোমাকে বলব। তবে অনেক দিন হয়ে গেল। কিছু কথা, কিছু  
স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

সেদিন ছপুরের দিকে অফিসে গিয়ে কিছুক্ষণ কাজ করে জরুরী  
কাজের অঙ্গায় বাসায় চলে এলাম। ভাল করে সাবান দিয়ে  
স্নান করলাম। ধোপাবাড়ির কাচানো ধূতি-পাঞ্চাবি পরলাম।  
বোধহয় মুখে একটু পাউডারও বুলিয়েছিলাম। তারপর মা কালীর  
ফটোয় বার কয়েক প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। দেরি হয়ে  
যাবার ভয়ে আগে আগেই বেরিয়ে পড়লাম।

সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই এসপ্লানেড পৌছে গেলাম। অফিস  
ছুটির সময় অনেক পরিচিত মাঝুমের সঙ্গে দেখা হবার সন্তাবনা।  
তাই চৌরঙ্গী ছেড়ে রঞ্জী সিনেমার পাশ দিয়ে যুৱে ফিরে নিউ  
মার্কেট চলে গেলাম। মার্কেটের সামনের কিছু স্টলের সামনে  
কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করে এলাম লিঙ্গসে ষ্ট্রাইটের মোড়ে।

দেরি করতে হলো না। মেমসাহেবও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো। একবালক দেখে নিলাম। চমৎকার লাগল। বড় পৰিত মনে হলো। আমাৰ মেমসাহেবকে। খুব সাধাৰণ সাজগোছ কৱে এসেছিল। ঝি বিৱাট গোছা-ভৱা চুলগুলোকে দিয়ে নিছকই একটা সাধাৰণ খোপা বেঁধেছিল। মুখে কোথাও প্ৰসাধনেৰ ছোওয়া ছিল না। পৱনে সাদা খোলেৰ একটা মাঝাৰি ধৱনেৰ ঠাঁতেৰ শাড়ী। গায়ে একটা লঞ্জো চিকনেৰ ব্রাউজ। ডান হাতে একটা কঙ্গ, বাঁ হাতে স্টেনলেস স্টিলেৰ ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা একটা ঘড়ি। হাতে ছটো-একটা খাতা বই আৰ ছোট্ট একটা পার্স।

প্ৰথমে কে কথা বলেছিল, তা আৰ আজ মনে নেই। ঠিক কি কথা হয়েছিল, তাৰ মনে নেই। তবে মনে আছে আমি জিজ্ঞাসা কৱেছিলাম, চা খাবেন ?

মেমসাহেব বলেছিল, না, চা আৰ খাব না। তাৰ চাইতে চলুন একটু বসা যাক।

ৱাস্তা পার হয়ে ময়দানেৰ দিকে এলাম। তাৰপৰ কিছুদূৰ হেঁটে ময়দানেৰ এক কোণায় বসলাম দৃজনে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলাম দৃজনেই। মাৰে মাৰে একবাৰ ওৱ দিকে তাকিয়েছি আৰ তৃপ্তিতে ভৱে গেছে মন। মেমসাহেবও মাৰে মাৰে আমাকে দেখছিল। কয়েকবাৰ দৃজনেৰ দৃষ্টিতে ধাক্কা লেগেছে। হেসেছি দৃজনেই।

এক সেকেণ্ড পৱে আবাৰ আমি তাকিয়েছি মেমসাহেবেৰ দিকে। এবাৰ আৰ মেমসাহেব চুপ কৱে থাকতে পাৱে না। অশ্ব কৱে, ‘কি দেখছেন ?’

প্ৰথমে আমি উত্তৰ দিতে পাৱিনি। লজ্জা কৱেছে, দ্বিধা এসেছে।

মেমসাহেব একটু পৱে আবাৰ অশ্ব কৱে, ‘কি হলো ? উত্তৰ দিচ্ছেন না যে ?’

‘সব সময় কি সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, না দেবার অমজ্ঞা থাকে ?’

‘আমার প্রশ্নটা কি খুব কঠিন ?’

‘কদিন বাদে ইয়ত এ প্রশ্ন কঠিন থাকবে না, তবে আজ বেশ কঠিন মনে হচ্ছে ।’

হজনের দৃষ্টিই চারপাশ ঘূরে যায়। আমি আবার চুরি করে মেমসাহেবকে দেখে নিই। ধরা গড়লাম না। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না, ধরা পড়ে গেলাম।

একটু হাসতে হাসতে মেমসাহেব আবার জানতে চায়, ‘অমন করে কি দেখছেন ?’

আমি কয়েকবার আজেবাজে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

আমি বললাম, ‘আপনি জানেন না আমি কি দেখছি ?’

‘না।’

‘সত্য তা ?’

মেমসাহেব আবার হাসে। বলে, ‘প্রথম দিনেই কিভাবে বুঝলেন আমি মিথ্যে কথা বলি ?’

‘না, তা ঠিক না।’

‘তবে বলুন কি দেখছেন ?’ মেমসাহেব যেন দাবী জানাল।

আমি আর দেরি করি না। মেমসাহেবকে দেখতে দেখতেই বললাম, ‘আপনার চোখ ছাটি বড় স্মৃদ্র...’

ঠোটটা কামড়াতে কামড়াতে মুখ ঘুরিয়ে নেয় মেমসাহেব। একটু নৌচু গলায় বলল, ‘ঘোড়ার ডিম স্মৃদ্র !’

আবার কয়েক মুহূর্ত হজনেই চুপচাপ থাকি। তারপর মেমসাহেব আবার বলে, ‘আমি কালো কুচিৎ বলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন ?’

জান দোলাবৌদি, কোন কারণ ছিল না কিন্তু তবুও হজনে মুচকি

হাসতে হাসতে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক করলাম। প্রথম প্রথম প্রেমে  
পড়লে এমন অকারণ অনেক কিছুই করতে হয়, তাই না? তবে  
শেষে আমি বলেছিলাম, ‘সত্যি আপনার চোখ ছটো বড় সুন্দর।’

পরে বিদায় নেবার আগে বলেছিলাম, ‘প্রথম পরিচয়ের দিনই  
আপনার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনার জন্য যদি কোন অঙ্গায় হয়ে  
থাকে তো মাপ করবেন।’

তুমি তো মেমসাহেবকে দেখেছ। সত্যি করে বল তো, ওর  
চোখ ছটো সুন্দর কিনা। অত কালো টানা টানা ঘন গভীর  
বৃক্ষদীপ্ত চোখ আমি তো জীবনে কোথাও দেখিনি। ঐ চোখ  
ছটো আমাকে চুম্বকের মত টেনে নিয়েছিল। সেই সেদিন  
দানাপুর প্যাসেঞ্জারের কামরায় মেমসাহেবের প্রথম দেখা পাবার  
সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ উপলক্ষ্মি করেছিলাম আমার নিঃসঙ্গ জীবনের  
শেষ হতে চলেছে। ময়দানে মেমসাহেবের পাশে বসে আমার সে  
উপলক্ষ্মি আরো দৃঢ় হলো। বেশ বুঝতে পারলাম জীবনদেবতা  
আমাকে জনারণ্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেবেন না। নিঃশব্দে  
নিভৃতে তিনি আমার কাছে মেমসাহেবকে পাঠিয়েছেন আমার  
জীবনযুক্তের সেনাপতিরূপে।

আমার নতুন সেনাপতির বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে  
বিধাতাপুরুষ শুধু একটু হাসি, একটু গান, একটু সুখ, একটু আনন্দ,  
একটু ভাললাগার জন্য তাকে আমার কাছে টেনে আনেন নি।

হ'চারদিন আরো দেখাশোনা হবার পর একদিন সন্ধ্যায়  
পার্ক সার্কাস ময়দানের এক কোণায় বসে মেমসাহেবকে আমার  
জীবনকাহিনী শোনালাম। সব কিছু শুনে মেমসাহেব বলেছিল,  
‘ধাতুটা ভাল তবে খাদ মিশে গেছে। গহনা গড়বার জন্য একটু  
বেশী পোড়াতে হবে, একটু বেশী পেটাতে হবে।’

‘কাকে পোড়াবেন? কাকে পেটাবেন?’

‘বুঝতে পারছেন না?’

‘বুঝি থাকলে তো বুঝব ।’

এবার একটু হেসে একটু জোর গঙ্গায় বললো, ‘আপনাকে ।’

আমি অবাক হয়ে বলি, ‘সে কি সর্বনাশের কথা ।’

ଆঝি তোৎসামী করে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি আমাকে পোড়াবেন, পেটাবেন ?’

মেমসাহেব গান্ধীর্ঘ আনার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বলল, ‘তবে কি আপনাকে পূজা করব ?’

একটু পরে বলেছিল, ‘দেখবেন, আপনাকে কেমন জব করি, কেমন শাসন করি ।’

‘সত্ত্ব ?’

‘নিশ্চয়ই ।’

‘পাইবেন ?’

‘নিশ্চয়ই ।’ বেশ আঞ্চলিক সঙ্গে মেমসাহেব জবাব দেয়।

‘পাছে হেরে যান, সেই ভয়ে মা পর্যন্ত আগে আগেই পালিয়েছেন, স্বতরাং আপনি কি... ।’

আরো কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। ইতিমধ্যে মেমসাহেব নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল আমি পরীক্ষা দিয়ে কোনমতে পাশ করেছি কিন্তু ঠিক লেখাপড়া বিশেষ কিছু করিনি। তাই বলল, রোজ একটু পড়াশুনা করবেন।

‘সে কি ? এই বুড়ো বয়সে আবার পড়াশুনা করব ?’

সোজা জবাব আসে, ‘বাজে তর্ক করবেন না। নিশ্চয়ই রোজ একটু পড়াশুনা করবেন ।’

‘ডজন খানেক খবরের কাগজ আর ডজন খানেক জার্নাল তো রেণ্টলার পড়ি ।’

‘খবরের কাগজে কাজ করতে হলে শুধু খবরের কাগজ পড়লে চলে না, আরো কিছু পড়া দরকার

আমি চুপ করে থাকি। বসে বসে ভাবি মেমসাহেবের কথা।

মেমসাহেব বলে, ‘একটা কথা বলবেন ?’

‘বলব ।’

‘আপনি আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন, তাই না ?’

‘না, না, বিরক্ত হবো কেন ?’

‘তবে এত গভীর হয়ে ভাবছেন কি ?’

দৃষ্টিটা উদাস হয়ে যায়। মনটা উড়ে বেড়ায় অতীত-বর্তমানের  
সমস্ত আকাশ জুড়ে। শুধু বলি, ‘একটুও বিরক্ত হচ্ছি না। শুধু  
ভাবছি কেউ তো আমাকে এসব কথা আগে বলে নি...’

‘তাতে কি হলো ?’

এমনি করে এগিয়ে চলে আমাদের কথা। শেষে মেমসাহেব  
বলে, ‘চিরকালই কি আপনি একটা অর্ডিনারী রিপোর্টার থাকবেন ?’

‘মাত্র একশ’ পঁচিশ টাকা মাইনের সেই রিপোর্টার হবার  
সুযোগই আজ পর্যন্ত পেলাম না ; সুতরাং কল্পনা করে আর কতদুর  
যাব ?’

স্পষ্ট জানিয়ে দেয় মেমসাহেব, ‘ওসব কথা বাদ দিন। অতীত  
আর বর্তমান নিয়েই তো জীবন নয়, তবিষ্যতই জীবন !’

‘অতীত আর বর্তমানের ক্ষয়রোগে ভুগতে ভুগতে মেরুদণ্ডটা  
তেজে গেছে। তাই তবিষ্যতে সোজা হয়ে দাঢ়াতে পারব বলে  
তরসা পাই না।’

‘কথাটা ঠিক হলো না। অতীত-বর্তমান হচ্ছে ক্যানভাস আর  
ব্যাকগ্রাউণ্ড মাত্র, ছবিটা এখনও আৰু বাকি।

যাই হোক শেষে মেমসাহেব বলল, ‘অতীত-বর্তমান নিয়ে অত  
মাথা ধামাবেন না, তবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরি করুন।  
ক্লাসিকস পড়ুন, ভাল ভাল লিটারেচার পড়ুন।’

সাধারণত ছেলেমেয়েরা ছাত্রজীবনে পড়াশুনা করে। প্রথম  
কথা, আমাকে গাইড করার কেউ ছিল না। দ্বিতীয়ত ছাত্রজীবনে  
সে সুযোগ বা অবসরও পাইনি। পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য কিছু

ইংরেজি-বাংলা সাহিত্য পড়তে বাধ্য হয়েছি। তাহারা মহিমচন্দ্র-  
বৰীশ্বৰনাথ-শ্রুৎচন্দ্র ইত্যাদি কোন না কোন কারণে বা উপলক্ষে  
পড়েছি। কদাচিৎ কখনও কোন ছবিটিনার জন্য জনসন বা টি এস  
ইলিয়টও হয়ত পড়েছি। কিন্তু ঠিক পড়াশুনা বলতে যা বোঝায়,  
তা আমি করতে পারিনি। মেমসাহেবের পালায় পড়ে এবার আমি  
সত্য সত্যই একটু পড়াশুনা করা শুরু করলাম।

কোনদিন নিজেদের বাড়ি থেকে কোনদিন আবার ইউনিভার্সিটি  
লাইব্রেরী থেকে মেমসাহেব আমার জন্য বই আনা শুরু করল।  
আমিও ধীরে ধীরে পড়াশুনা শুরু করলাম। ইংরেজি-বাংলা ছইই  
পড়লাম। বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মাইকেল আবার  
পড়লাম। রমেশচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিও বাদ পড়লেন না।  
তারপর মোহিতলাল থেকে জীবানন্দও মেমসাহেব প্রেসক্রিপশন  
করল। ওদিকে ডরোথী পার্কারকে পড়লাম, পড়লাম রবার্ট  
ক্রস্ট—টি এস ইলিয়ট—এজরা পাউণ্ডের কবিতা। আমার মন  
ছটফট করে ওঠে। মেমসাহেবকে বললাম, ‘মেমসাহেব, এবার  
তোমার পাঠশালা বক্স কর’।

মেমসাহেব কি বলল জান? বলল, ‘বাজে বকো না। কিছু  
লেখাপড়া না করে জার্নালিজম করতে তোমার লজ্জা করে না?’

‘লজ্জা? জার্নালিস্টদের লজ্জা! তুমি হাসালে মেমসাহেব!’

মেমসাহেবের দাবড় খেয়ে হাঙ্গলে, হেনরি গ্রীন, হেমিংওয়ে,  
লরেন্স ডুরেল, অ্যানি পর্টার, মেরী ম্যাকার্থির এক গাদা বই  
পড়লাম।

এর পর একদিন আমাকে গীতবিতান প্রেজেন্ট করল। আমি  
অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম, মেমসাহেব কি এবার আমাকে  
গানের স্কুলে ভর্তি করবে? জিজাসা করলাম, ‘তানপুরা পাব  
না?’

মেমসাহেব রেগে গেল। ‘আমার মুগু পাবে।’

পরে বলেছিল, যখন হাতে কাজ থাকবে না, চুপচাপ  
শীতবিভানের পাতা উল্টিয়ে যেও। খুব ভাল জাগবে। দেখবে  
তুমি অনেক কিছু ভাবতে পারছ, কল্পনা করতে পারছ।

ইতিমধ্যে এম. এ. পাশ করে মেমসাহেব একটা গার্লস কলেজে  
অস্থায়ীভাবে অধ্যাপনা শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে আরো অনেক  
কিছু হয়ে গেছে। মেমসাহেব উপলক্ষ্মি করল আমার অন্তরের  
শৃঙ্গতা, জীবনের ব্যর্থতা, ভবিষ্যতের আশঙ্কা। উপলক্ষ্মি করল আমার  
জীবন-যজ্ঞে তাঁর অনন্য প্রয়োজনীয়তা। আমি নিজেই একদিন  
বললাম, জান মেমসাহেব, প্রথমে শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম কিন্তু  
পরে এক দুর্বল মুহূর্তে স্বপ্ন দেখলাম আমি এগিয়ে চলেছি। দশজনের  
মধ্যে একজন হবার স্বপ্ন দেখলাম। সেই স্বপ্নের ঘোরে বেশ  
কিছুকাল কেটে গেল। যখন সম্মিলিত ফিরে পেলাম, তখন নিজের  
হৃরবক্ষা দেখে নিজেই চমকে গেলাম, ঘাবড়ে গেলাম, হতাশ হলাম।  
একটু থামি।

আবার বলি, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধনা বিসর্জন দিয়ে  
নিজেকে তুলে দিলাম অদৃষ্টের হাতে। কিন্তু তোমাকে দেখে  
আমার সব হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট হয়ে গেল। মুহূর্তের  
মধ্যে আবার সমস্ত স্বপ্ন উড়ে এসে জড়ো হলো মনের আকাশে।

মেমসাহেবের হাতটা চেপে ধরে বললাম, ভগবানের নামে শপথ  
করে বলছি, মেমসাহেব। তোমাকে দেখেই যেন মনে হলো তুমি  
তো আমারই। এই অঙ্কুর থেকে আমাকে মুক্তি দেবার জন্যই  
যেন ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন।

আমার মত মেমসাহেব কোনদিনই বেশী কথা বলত না। শুধু  
বলল, হয়ত তাই। তা না হলে তোমার সঙ্গে অমন অপ্রত্যাশিত-  
তাবে পরের দিনই আবার দেখা হবে কেন?

অদৃষ্টের ইঙ্গিত, নিয়তির নির্দেশ মেমসাহেবও বুঝতে পেরেছিল।  
আমি অনেক কথা বলার পরই ছ'হাত তুলে মেমসাহেবের কাছে

আজ্ঞসমর্পণ করেছিলাম। মেমসাহেবের অঙ্গুষ্ঠান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছিল।

প্রতিদিনের মত সেদিন বেলা দেড়টা-হাটোর সময় অফিস গিয়েছিলাম। টেলিপ্রিন্টারের কয়েকটা লোক্যাল কপি দেখতে দেখতেই টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে অভ্যাস মত বললাম, রিপোর্টার্স !

‘কখন অফিসে এলে ?’

‘এইত একটু আগে।’

‘একটা কথা বলব ?’

‘বলো।’

‘শুনবে ?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘চলো না একটু বেড়িয়ে আসি।’

আমি একটু অবাক হয়ে জানতে চাই, ‘এখন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘কি ব্যাপার বল তো।’

‘বল না ধারে কিনা ?’

চীফ রিপোর্টার বা নিউজ এডিটর তখনও অফিসে আসেন নি। কি করব, তা বছিলাম। মেমসাহেব টেলিফোন ধরে থাকল। আমি ডায়েরীতে দেখে নিলাম হৃষ্টো প্রেস কনফারেন্স ছাড়া আর কিছু নেই। একটা চারটের সময় আর দ্বিতীয়টা সন্ধ্যা সাতটায়।

মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সাতটার মধ্যে ফিরতে পারব ?’

‘সাতটা ? বোধহয় না।’

‘কখন ফিরবে ?’

‘আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরব।’

চীফ রিপোর্টারকে একটা প্লিপ লিখে রেখে গেলাম, একটা জরুরী

নিউজের সোতে বেরিয়ে থাক্কি। রাত্রে ক্ষিরে টেলিফোন ডিউটি  
দেব।

অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এসপ্লানেডের মোড়ে হজমে  
মীট করে সোজা চলে গেলাম দক্ষিণেশ্বর। মন্দিরের দরজা বন্ধ  
হিল। তাই একাধিক-ওদিক ঘূরে পঞ্চবটী ছাড়িয়ে আরো ধানিকটা  
দক্ষিণে গঙ্গার ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম হজমে।

মেমসাহেব বলল, ‘চোখ বন্ধ কর।’

‘কেন?’

‘আঃ। সব সময় কেন কেন করো না। বলছি চোখ বন্ধ  
কর।’

‘পুরোটা না অর্ধেকটা বন্ধ করব?’

‘তুমি বড় তর্ক কর।’ মেমসাহেব এবার কড়া হস্তম দেয়,  
‘আই সে, ক্লোজ ইওর আইজ।’

সত্ত্ব সত্ত্বিই চোখ বন্ধ করলাম। মুহূর্তের মধ্যে অনুভব  
করলাম মেমসাহেব আমার হৃষি পায় হাত দিয়ে প্রণাম করছে।  
চমকে গিয়ে চোখ খুলে প্রশ্ন করলাম, ‘একি ব্যাপার?’

দেখি মেমসাহেবের মুখে অনৰ্বাণ আনন্দের বশ্যা, হৃষি চোখে  
পরম তৃষ্ণির দাপশিখা জলছে। হৃষি হাত দিয়ে মেমসাহেবের মুখটা  
তুলে ধরে আবার প্রশ্ন করলাম, ‘হঠাতে প্রণাম করলে কেন  
মেমসাহেব?’

কোন উত্তর দিল না মেমসাহেব। আঘাসমর্পণের ভাষায় চাইল  
আমার দিকে। আমিও ওর দিকে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।  
তারপর আবার জানতে চাইলাম, ‘বল না প্রণাম করলে কেন?’

এবার মেমসাহেব কথা বলে, ‘আমি তোমাকে প্রণাম করলাম,  
তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে না?’

আমি অবাক হয়ে থাই। নিজের দৈশ্য এত স্পষ্ট হলো যে  
নিজেকে বেশ ছোট মনে হলো। মেমসাহেব প্রণাম করার পর

କୈକିଯିତ୍ତ ତଲବ ନା କରେ ଆମାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରା ପ୍ରଥମ କାଜ ହିଲା । ସାଇ ହୋକ ଡାଡାତାଡ଼ି ମେମସାହେବକେ କାହେ ଟେନେ ନିଲାମ । ହୁଟି ହାତ ଦିଯେ ଓର ମୁଖ୍ୟାନା ତୁଳେ ଧରେ ବଲଲାମ, ଭଗବାନ ସେବ ତୋମାକେ ସୁଧୀ କରେନ ।

ମେମସାହେବ ହଠାତ୍ ମାଥାଟାଟା ଛାଡ଼ିଯେ ନିଯେ ହହାତ ଦିଯେ ଆମାକେ ଚେପେ ଧରେ ବଲଲ, ‘ଭଗବାନ କି କରବେ, ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଜାନେନ କିନ୍ତୁ ତୁମି କି ଆମାକେ ସୁଧୀ କରବେ ?’

‘କି ମନେ ହୟ ?’

‘ମନେ ମନେ ତୋ ଭୟଟି ତୟ !’

‘କିମେର ତୟ ?’

କାନେ କାନେ ଫିଲ ଫିଲ କରେ ମେମସାହେବ ବଲଲ, ‘ହାଜାର ହୋକ ଖରରେ କାଗଜେର ରିପୋର୍ଟାର ! କବେ, କଥନ, କୋଥାଯି ହୟାତ କୋନ ସ୍ଵର୍ଗରୀ ଏସେ ତୋମାକେ ବଢ଼େର ବେଗେ ଉଡ଼ିଯେ ନିଯେ ଘାବେ…… ।’

‘ତାଇ ନାକି ?’

‘ତବେ ଆବାର କି ! ପୁରୁଷଦେର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ …… !’

‘ଜାନ ମେମସାହେବ, ତୋମାକେ ନିଯେ ଆମାର ଅନେକ ଭୟ !’

ଆମାର ବାହୁବଳ ଥେକେ ନିଜେକେ ମୁକ୍ତ କରେ ନିଯେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଦିଯେ ନିଜେକେ ଦେଖିଯେ ମେମସାହେବ ଅବାକ ହୟେ ବଲଲ, ‘ଆମାକେ ନିଯେ ତୋମାର ତୟ ?’

‘ଜି, ମେମସାହାବ !’

‘ବାଜେ ବକୋ ନା !’

‘ବାଜେ ନା ମେମସାହେବ । ଜୀବନେ ଶୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୋନ ମାମୁଷେର ଆମ୍ଭଳ ଏମେ ପଞ୍ଚାଶ ଟାକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟାରକେ ନିଶ୍ଚଯାଇ ତୋମାର ଭୁଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହବେ ନା !’

ଦପ କରେ ଜଳେ ଉଠିଲ ମେମସାହେବ, ‘ସବ ସମୟ ତୁମି ପଞ୍ଚାଶ ଟାକାର ରିପୋର୍ଟାର, ପଞ୍ଚାଶ ଟାକାର ରିପୋର୍ଟାର ବଲବେ ନା ତୋ ! ସାରା ଜୀବନଙ୍କ କି ତୁମି ପଞ୍ଚାଶ ଟାକାର ରିପୋର୍ଟାର ଥାକବେ ?’

‘ধাকব না ?’

‘না, না, না !’

‘তাহলে কি হবে ?’

‘কি আবার হবে ? জীবনে মানুষ হবে, বড় হবে, মাথা উঁচু করে দাঢ়াবে !’

‘পারব ?’

‘একশ’বার পারবে। তাছাড়া আমি আছি না !’

মেমসাহেব আমাকে একটু কাছে টেনে নেয়। একটু আদর করে। মাথার চুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আবার বলে, ‘তুমি ভাব কেন যে তুমি হেরে গেছ ?’

‘কি করব বল মেমসাহেব ? অকুল সম্বন্ধে জাহাজ ভেসে বেড়ায়, কিন্তু লাইট হাউসের ঐ ছোট একটা আলোর ইঙ্গিত না পেলে তো সে বন্দরে ভিড়তে পারে না !’

‘আমি তো এসেছি, আর তয় কি ? কিন্তু কথা দিতে পার আমার বন্দর ছেড়ে তুমি তোমার জাহাজ নিয়ে অন্য বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াবে না ?’

আচ্ছা দোলাবৌদি, সব মেয়েদের মনেই ঐ এক তয়, এক সন্দেহ কেন বলতে পার ? পৃথিবীর ইতিহাস কি শুধু পুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীতেই ভরা ? যাই হোক মেমসাহেবের কথা আমার বেশ লাগত। অন্তত এই ভেবে আমি তৃপ্তি পেতাম যে সে আমাকে সম্পূর্ণভাবে কামনা করে।

সেদিন কথায় কথায় সন্ধ্যা নেমে এলো। মন্দিরের মঙ্গলদীপের আলোর প্রতিবিম্ব পড়ল গঙ্গায়। স্রোতস্বিনী গঙ্গা সে আলো ভাসিয়ে নিয়ে গেল দূর-দূরাঞ্চলে, শহরে, নগরে, জনপদে আর অসংখ্য মানুষের মনের অক্কার গহন অরণ্যে।

মেমসাহেব শেষকালে প্রশ্ন করল, ‘কই তুমি তো জানতে চাইলে

না তোমাকে আজ এখানে নিয়ে এসাম কেন? তুমি তো জানতে চাইলে না তোমাকে প্রশান্ন করে আশীর্বাদ চাইলাম কেন?’

‘কোন বিশেষ কারণ আছে নাকি?’

‘তবে কি’, এই বলে মেমসাহেব ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে আমাকে পড়তে দিল।

পড়ে দেখি হাওড়া গার্লস কলেজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। মেমসাহেবের ছাতি হাত ধরে বললাম, ‘কনগ্রাচুলেশনস। এইত অয়মারন্ত, আনন্দে ঐশ্বর্যে ভগবান নিশ্চয়ই তোমাকে ভরিয়ে তুলবেন।’

একটু খেমে প্রশ্ন করি, ‘মাসে মাসে আড়াইশ’ টাকা দিয়ে কি করবে মেমসাহেব?’

‘কেন? দুজনে মিলেও ওড়াতে পারব না?’

দুজনেই হেসে উঠি।

মেমসাহেব অধ্যাপনা করা শুরু করায় গবে আমার বুকটা ভরে উঠল। কদিন পরে অফিস থেকে পঁচিশটা টাকা অ্যাডভাল নিলাম। চিন্তরঞ্জন এভিয়ুর সেলস এস্পোরিয়াম থেকে আঠারো টাকা দিয়ে একটা তাঁতের শাড়ী কিনলাম। বিকেল বেলায় মেমসাহেবকে প্যাকেটটা দিয়ে বললাম, এই শাড়ীটা পরে কালকে কলেজে যেও।

পরের দিন এই শাড়ীটা পরে কলেজে গিয়েছিল, কিন্ত তারপর আর পরত না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, ‘শাড়ীটা বুঝি তোমার পছন্দ হয় নি?’

‘খুব পছন্দ হয়েছে।’

‘সেইজন্মই বুঝি পরতে লজ্জা করে?’

কানে কানে বলল, ‘না, গো, না। ওটা তোমার প্রথম প্রেজেন্টেশন। যখন তখন পড়ে নষ্ট করব নাকি?’

প্রথম মাসে মাইনে পাবার পর মেমসাহেব আমাকে কি

দিয়েছিল জান ? একটা গরদের পাখাবি আৱ একটা চমৎকাৰ  
তাত্ত্বের ধূতি ।

ধূতিটা কেনাৰ সময় ভাৱী মজা হয়েছিল ।

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা কৱল, জিৱি পাড় নেবে ? নাকি প্লেন পাড়  
নেবে ?

দোকানেৰ আৱ কেউ শুনতে না পাৱে তাই কানে কানে  
বললাম, যদি টোপৱটাও কিনে দাও তাহলে জিৱিপাড় ধূতি কেন ;  
আৱ যদি এখন টোপৱ না কিনতে চাও তবে প্লেন পাড়ই... ।'

‘অসভ্য কোথাকাৰ ।’

ধূতি কিনে দোকান থেকে বেৱতে বেৱতে মেমসাহেব বলল,  
‘ভূমি ভাৱী অসভ্য ।’

‘কি আশ্চৰ্য ! তোমাৰ সঙ্গেও ঝাঙ্কলি কথা বলব না ?’

‘এই তোমাৰ ঝাঙ্কলি বলাৰ ঢং ?’

মেসব দিনেৰ কথা আজ তোমাকে লিখতে বসে আমি নিজেই  
অবাক হয়ে যাচ্ছি । কি কাৱণে ও কেমন কৱে আমৱা তুজনে এত  
ক্রতৃতালে এগিয়ে চলেছিলাম, তা আমি জানি না । কোন যুক্তি-  
তর্ক দিয়ে এসব বোঝান সম্ভব নয় । মাহুষেৰ মন লজিকেৱ প্ৰফেসৱ  
বা বিচাৰকদেৱ পৰামৰ্শ বা উপদেশ মেনে চলে না । যুক্তি বিহুলেৰ  
মত সে আপন গতিতে উড়ে বেড়ায়, ঘূৰে বেড়ায় । মাহুষেৰ মন  
যদি বিচাৰ-বিবেচনা মেনে চলতে জ্ঞানত তাহলে শুধু আমাৰ  
বা মেমসাহেবেৰ কাহিনী নয়, পৃথিবীৰ ইতিহাসও একেবাৰে  
অন্তৱকম হতো ।

মাতৃগৰ্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবাৰ পৱ থেকেই মাহুষ একজনকে  
অবলম্বন কৱে বড় হয়, ভবিষ্যতেৰ পথে এগিয়ে চলে । একটি  
মুখেৰ হাসি, ছুটি চোখেৰ জলেৰ জন্য মাহুষ কত কি কৱে ! আমি  
বড় হয়েছি, ভবিষ্যতেৰ দিকে এগিয়ে গেছি নিতান্তই প্ৰকৃতিৰ  
নিয়মে । মায়েৰ মুখেৰ হাসি বা প্ৰিয়জনেৰ চোখেৰ জলেৰ কোন

তুমিকে ছিল না। আমার জীবনে। তাইতো আমি মেমসাহেবকে সমস্ত মন, প্রাণ, সম্ভা দিয়ে চেয়েছিলাম। এই চাওয়ার মধ্যে একটুও ঝাকি ছিল না। তাইতো মেমসাহেবকেও পাওয়ার মধ্যেও কোন ঝাকি থাকতে পারে নি। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির বাইশটি বসন্ত অতিক্রম করতে মেমসাহেবের জীবনে নিশ্চয়ই কিছু কিছু মাছি বা মৌমাছি তন্ত্রণ করেছে চারপাশে। হয়ত বা কাকুর শুঁশন মনে একটু রং লাগিয়েছে কিন্তু ঠিক আমার মত কেউ সমস্ত জীবনের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে নি। তাইতো মেমসাহেবের জীবনের সব বাঁধন খুলে গিয়েছিল, সংযম আর সংক্ষার ভেসে গিয়েছিল।

আমার মত মেমসাহেবের জীবনেও অনেক অনেক পরিবর্তন এলো। আমার পছন্দ-অপছন্দ মতামত ছাড়া কোনকিছুই করতে পারত না। আমি সঙ্গে গিয়ে পছন্দ না করলে শাড়ী-ব্রাউজ পর্যন্ত কেনা হতো না। আমি ক্রিজ্জাসা করতাম, ‘এত দিন কার পছন্দ মত কিনতে?’

‘মা বা দিদির...।’

‘এখন কি ওঁদের কুচি খারাপ হয়ে গেছে?’

‘না তা হবে কেন? তাই বলে কি ওঁরা চিরকালই পছন্দ করবে?’

‘তা তো বটেই!'

মেমসাহেব অভিমান করত। ‘বেশ ত আমার সঙ্গে দোকানে যেতে অপমান হলে যেও না।’

আমি কথার মোড় ঘূড়িয়ে দিই। ‘না জানি এরপর আরো কত কি কিনে দিতে বলবে?’

মেমসাহেব আমার ইঙ্গিত বোবে। প্রথমে বলে, ‘আমার অসভ্যতা করছ!’

একটু পরে একটু কাছে এসে, একটু আস্তে বলে, ‘দরকার হলে নিশ্চয়ই কিনবে। তুমি ছাড়া কে কিনে দেবে বল?’

দোলাবৌদ্ধি, ভাবতে পারছ আমাদের অবস্থা ?

নিত্য কর্মপক্ষতির বাইরে এক ধাপ নড়তে-চড়তে গেলেই  
মেমসাহেব আমার কাছে আবেদনপত্র নিয়ে হাজির হতো ।

‘জান, রবিবার কলেজের একদল প্রফেসর শাস্তিমিকেতন  
যাচ্ছেন । আমাকেও ভীষণ ধরেছেন । কি করিবল তো ?’

‘কি আবার করবে, যাবে ?’ তারপর জেনে নিই, ‘কবে  
কিরবে ?’

‘সোমবার রাত্রেই । মঙ্গলবার তো কলেজ আছে !’

কোন দিন আবার দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলতো, ‘দেখ,  
কালকে অমরের জন্মদিন । কি দেব বল তো !’

আমি মেমসাহেবের কথা শুনে মনে মনে হাসতাম । অমর  
ওর বাল্যবস্থ, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি একসঙ্গে পার হয়েছে ।  
প্রতিবছরই জন্মদিনে যেতে হয়েছে, কিছু না কিছু প্রেজেন্টেশনও  
“দিয়েছে । আজ এই সামান্য ব্যাপারটা এত বড় সমস্যা হয়ে দেখা  
দিল যে, মেমসাহেব নিজের বুদ্ধি দিয়ে কোন কুলকিনারা পেল না ।  
ডাক পড়ল আমার ।

আমার ওপর মেমসাহেবের নির্ভরতার খবর আমাদের  
আশেপাশের সবাই জানত । মেমসাহেবের মেজদি হয়ত সিনেমাৰ  
টিকিট কেটেছে কিন্তু তবুও ছোটবোনের সঙ্গে মজা করবার জন্য  
জিজ্ঞাসা করত, ‘হ্যারে, রিপোর্টারকে জিজ্ঞাসা করিস তুই রবিবার  
ম্যাট্রিনীতে সিনেমা যেতে পারবি কিনা ।’

মেমসাহেব দৌড়ে গিয়ে মেজদিৰ মুখটা চেপে ধরে বলত, ‘ভাল  
হচ্ছে না কিন্তু !’

মুচকি হাসি লুকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে মেজদি বলত,  
‘আচ্ছা ঠিক আছে । আমিই রিপোর্টারকে ফোন করে জেনে  
নেব ।’

মেমসাহেব হঢ়ার দিত, ‘মা ! মেজদি কি করছে ?’

কোনদিন আবার মেজদি মেমসাহেবকে ধলত, 'ঢারে,  
রিপোর্টারকে একবার কোন করবি ?'

'কেন ?'

'জিঞ্জাসা কর ত তুই আজকে মাছের খোল খাবি না কাল  
খাবি !'

মেমসাহেব মেজদিকে ধরতে যেত আবার মেজদি দৌড়ে পালিয়ে  
যেত !

অনেক রাত হয়ে গেছে। কত রাত জান ? পৌনে তিনটে  
বাজে। চারপাশের সব বাড়ির সবাই সারাদিন কাজকর্ম করে কত  
নিষিদ্ধে, কত শান্তিতে এখন ঘুমোচ্ছে। আবার আমি ?

মধ্যমূর দেহলভির একটা 'শের' মনে পড়ছে—

মহবত জিমকো দেতে হায়,

উসে ফির কুচ নেই দেতে,

উসে সব কুচ দিয়া হায়,

জিসকো ইস কাবিল নেহি সমবা।

—জীবনে যে ভালবাসা পায়, সে আবার কিছু পায় না ; যে  
জীবনে আবার সব কিছু পায়, সে ভালবাসা পায় না।

তোমাদের জীবনে নয়, কিন্তু আমার জীবনে কথাটা বর্ণে বর্ণে  
মিলে গেছে।

ইতিহাসের সে এক প্রাচীনতাহিসিক অধ্যায়ে কঙ্কচুত গাহের আকারে পৃথিবী মহাশূল্পে ঘূরপাক থাচ্ছিল। উদ্দেশ্যহীন হয়ে পৃথিবী কতদিন ঘূরপাক খেয়েছিল, তা আমার জানা নেই। জানা নেই কতদিন পর সে স্মর্যকে কেন্দ্র করে আপন কঙ্কপথ আবিষ্কার করেছিল। তবে জানি প্রতিটি মাছুষকেও এমনি উদ্দেশ্যহীন হয়ে মহাশূল্পে ঘূরপাক খেতে হয়। সময় কম-বেশী হতে পারে কিন্তু কালের এই নির্মম রসিকতার হাত থেকে কেউ মুক্তি পায় না। আমিও পাই নি। তোমরাও তো পাও নি।

মেমসাহেবকে পাবার পর আমার সে অকারণ ঘূরপাক খাওয়া বন্ধ হল। ঠিকানাহীন চলার শেষ হলো। আপন কঙ্কপথ দেখতে পেলাম। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়া বন্ধ হলো; ছনিয়াটাকে, জীবনটাকে ব ড় ভাল লাগল। তুমি তো জান আমি সব কিছু পারি; পারি না শুধু কবিতা লিখতে। তাই কাব্য করে ঠিক বোঝাতে পারছি না।

বড়বাজার বা চিংপুরের মোড়ের ফুলের দোকান দেখেছ? দেখেছ তো কত অজস্র সুন্দর সুন্দর ফুল বোঝাই করা থাকে দোকানগুলিতে? ঐ ভিড়ের মধ্যে এক একটি ফুলের সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দোকান থেকে সামান্য কটি ফুল কিমে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে ফ্লাওয়ার-ভাস-এ রাখলে সারা ড্রাইংরুমটা যেন আলোয় ভরে যায়। তাই না? হাওড়া ব্রীজের তলায়, জগন্নাথ ঘাটের পাশে মণ দরে ঝুড়ি বোঝাই করে রঞ্জনীগঢ়া বিক্রী হয় কিন্তু সে দৃঢ় দেখা যায় না। তার চাইতে অর্গানের ওপর একটা লম্বা ফ্লাওয়ার-ভাসের মধ্যে মাত্র ছ-চারটে স্টিক দেখতে অনেক ভাল লাগে, অনেক তৃপ্তি পাওয়া যায় মনে।

জগন্নাথ ঘাটের রঞ্জনীগঙ্কার পাইকারী ঘোষার দেখে নিশ্চয়ই কোম কবির কাব্যচেতনা জাগবে না। কিন্তু প্রেয়সীর অঙ্গে একটু রঞ্জনীগঙ্কার সজ্জা অনেকের মনেই দোলা দেবে।

আমি রঞ্জনীগঙ্কা না হতে পারি কিন্তু ক্যাকটাস তো হতে পারি? মেমসাহেব সেই ক্যাকটাস দিয়ে জাপানীদের ঢং-এ চমৎকার গৃহসজ্জা করেছিল। আমি আমিই থেকে গেলাম। শুধু পরিবেশ পরিবর্তনে আমার জীবন-সৌন্দর্যের প্রকাশ পেলো।

ইঙ্কেন গার্ডেনের ধার দিয়ে সন্ধ্যার অক্ষকারে আমরা হজনে গঙ্কার ধারে হারিয়ে গেলাম। কয়েকটা বড় বড় জাহাঙ্গ পৃথিবীর মানা প্রাণ্ত ঘূরে ঝান্ত হয়ে গঙ্কাবক্ষে বিশ্রাম করছিল। ঝান্ত আমিও মেমসাহেবের কাঁধে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম করছিলাম।

মেমসাহেব আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে প্রশ্ন করল, এমনি করে কতদিন কাটাবে?

‘তুমি কি ঘর বাঁধার কথা বলছ?’

‘সব সময় স্বার্থপরের মত শুধু এই এক চিন্তা’, মেমসাহেব মিহি স্মরে আমাকে একটু টিপ্পনি কাটল।

‘তুমি কি অন্য কিছু বলছ?’ আমি জানতে চাইলাম।

এবার মেমসাহেবের পালা। ‘তুমি কি নিজের জীবন সম্পর্কে একটুও ভাববে না? শুধু মেমসাহেবকে ভালবাসলেই কি জীবনের সবকিছু মিটবে?’

‘নিজের কথা ভাবতে ভাবতে কিছু হণিশ না পেয়েই তো তোমার ঘাটে এই ডিডি ভিড়িয়েছি। এখন তো তোমার দায়িত্ব।’

‘ভাই বুঝি?’

‘আজ্জে হঁয়।’

অঙ্ককারটা একটু গাঢ় হলো। আমরা আর একটু নিবিড় হলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে একটা চীনেবাদামওয়ালা হাজির হলো আমাদের পাশে। লজ্জায় একটু সঙ্কোচবোধ করলাম।

হজনেই। বাদাম চিবুবার কোন ইচ্ছা না থাকলেও পর উপরিতটা  
অসহ মনে হচ্ছিল বলে ভাড়াভাড়ি ছ' প্যাকেট বাদাম কিনলাম।

আমি আবার একটু নিবিড় হলাম। বললাম, ‘মেমসাহেব  
একটা গান শোনাবে ?’

‘এখানে নয়।’

‘এখানে নয় তো তোমার কলেজের কমনরুমে বসে গান  
শোনাবে ?’

নির্বিকার হয়ে মেমসাহেবের বলে, যখন আমরা কলকাতার বাইরে  
যাব, তখন তোমাকে অনেক গান শোনাব।’

সেদিন মেমসাহেবের এই কথার কোন গুরুত্ব দিই নি।  
ভেবেছিলাম এড়িয়ে যাবার জন্য ঐ কথা বলছে।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। ছজনে সন্ধ্যার পর বেলভেড়িয়ারের  
ধার দিয়ে ঘূরে বেড়াচ্ছি। মেমসাহেব হঠাত আমাকে প্রশ্ন করল,  
বেড়াতে যাবে ?

‘কোথায় ?’

‘কলকাতার বাইরে ?’

‘কার সঙ্গে ?’

‘আমার সঙ্গে।’

‘সত্যি ?’

‘সত্যি।’

আমি আর ধৈর্য ধরতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলাম,  
‘আজই যাবে ?’

‘তুমি কি কোনদিন সিরিয়াস হবে না ?’

‘তুমি কি চাও ? আমি তোমার সঙ্গে ডিয়ারনেস এলাউচ বা  
বাড়িভাড়া নিয়ে আলোচনা করি ?’

মেমসাহেব হাসে। ছজনে হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আরো  
এগিয়ে যাই।

সেইদিন সক্ষ্যাত্তেই আমার প্ল্যান হয়ে গেল। মেমসাহেবের কলেজ থেকে তিন-চার দল ছাত্রী আর অধ্যাপিকা তিন-চার দিকে আবেন এডুকেশনাল ট্রাই রে। মেমসাহেবের যাবার কথা ঠিক ধাকবে কিন্তু যাবে না। বাড়িতে জানবে মেমসাহেব কলেজের ছাত্রী আর সহকর্মীদের সঙ্গে বাইরে গেছে কিন্তু আসলে—

মেমসাহেব শুধু ইলাদিকে একটু টিপে দেবে। ইলাদি আবার মেজদির ফ্লাশ ফ্রেণ। সুতরাং তবিয়তের জন্য একটু সতর্ক ধাকাই ভাল।

কবে, কখন, কোথায় আমরা গিয়েছিলাম, সেসব কথা খুলে না। বলাই ভাল। জেনে রাখ, আমরা বাইরে গিয়েছিলাম। নগর কলকাতার লক্ষ লক্ষ মামুখের ভিড়ের বাইরে মেমসাহেবকে পেয়ে আমি আব্য উদ্বাদ হয়ে উঠেছিলাম।

তুমি হয়ত ভাবছ ফার্স্ট ফ্লাশ কম্পার্টমেন্টের কুপেতে করে আমরা ছজনে হনিয়ন করতে বেরিয়েছিলাম। তা নয়। অত টাকা কোথায়? আমি তো মাত্র পনের টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। তবে আমার মেমসাহেব কর্ণাসাগরের বিচাসাগরের চাইতেও উদার ছিল। সেকেণ্ড ফ্লাশেরই টিকিট কেটেছিল। গেস্টহাউসে দুটো ঘর ভাড়া নিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, অথবা কেন খরচ করছ? একটা ঘর নিলেই তো হয়।

মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে মেমসাহেব বলেছিল, ‘তুমি কি সাউঞ্জে রাত কাটাবে?’

‘লাউঞ্জে?—না। তার চাইতে বরং ডাইনিং রুমের টেবিলে রাত কাটাব। কি বল?’

আচ্ছা ওসব পরে বলব। ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে মেমসাহেবকে পাশে পেয়ে আমি যেন আর স্থির ধাকতে পারছিলাম না। ইচ্ছা করছিল, জড়িয়ে ধরি, আদুর করি। তা সম্ভব ছিল না। যাত্রীদের সতর্ক দৃষ্টিকে যতদুর সম্ভব ফাঁকি দিয়ে মেমসাহেবকে পাশে পার্বাৰ

হৃষিক সুযোগ উপভোগ করার চেষ্টা করেছি। ও কখনো হেসেছে, কখনও চোখ টিপে ইশারা করেছে।

বখন একটু বাড়াবাড়ি করেছি, তখন বলেছে, আঃ! কি করছ?

আমি অবাক হয়ে শ্রেণি করেছি, এক্সকিউজ মী, আপনি আমাকে কিছু বলছেন?

‘আজে আপনাকে? না, না, আপনাকে কি বলব?’

‘ধ্যাক ইউ।’

‘নো মেনশন।’

আশপাশের ঘর-বাড়ি, বন-জঙ্গল, নদী-নালা পিছনে ফেলে ট্রেনটা ছুটে চলে সামনের দিকে। আমাদের ছজনের ঘনটাও দৌড়তে থাকে ভবিষ্যতের দিকে। কত শত অসংখ্য স্বপ্ন উকি দেয় মনের মধ্যে। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা রূপ নিতে চায় ভবিষ্যতের সেই সব স্বপ্নকে ধিরে।

নতুন কোন স্বপ্ন, নতুন কোন আশা আমার মনে আসে নি। চিরকাল মাঝুষ যা স্বপ্ন দেখেছে, যা আশা করেছে, আমি তার বেশী একটুও ভাবিনি। ভাবছিলাম, একদিন অনিশ্চয়তা নিশ্চয়ই শেষ হবে। মেমসাহেব কল্যাণীরূপে আমার ঘরে আসবে, আলো জলে উঠবে আমার অঙ্ককার ঘরে।

তারপর?

উপভোগ?

নিশ্চয়ই।

সম্ভোগ?

নিশ্চয়ই।

তবে ঐ সম্ভোগের মধ্যেই দ্বিতীয়বনের ঘবনিকা টানব না। ছজনে হাত ধরে এগিয়ে যাব। অনেক অনেক এগিয়ে যাব। দশজনের কল্যাণের মধ্য দিয়ে নিজেদের কল্যাণ করব। দশজনের আশীর্বাদ কুড়িয়ে আমরা ধন্ত হবো।

ময়নার মত শুর করে মেমসাহেব ডাক দিল, শোন।

আমি ওর ডাক শুনেছিলাম কিন্তু উক্তর দিলাম না। কেন?

ওর ঝঁ ‘শোন’ ডাকটা আমার বড় ভাল লাগত, বড় মিষ্টি লাগত।

আমি শুষ্টি ঘূরিয়ে অঙ্গদিকে চাইলাম।

আবার সেই ময়নার ডাক, শোন।

‘ডাকছ?’

‘হ্যাঁ।’

মেমসাহেব কি যেন ভাবে, দৃষ্টিটা যেন একটু ভেসে বেড়ায় ভবিষ্যতের মহাকাশে। আমি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি আমার কাছে। ডাক দিই, মেমসাহেব!

মেমসাহেব সংক্ষিপ্ত সাড়া দেয়, কি?

‘আমাকে কিছু বলবে?’

মেমসাহেব এবার ফিরে তাকায় আমার দিকে। ঘন গভীর মিষ্টি দৃষ্টি দিয়ে দেখে আমাকে।

আবার ছ-চার মিনিট কেটে যায়। শুধু হজনে হজনকে দেখি।

‘একটা সত্য কথা বলবে?’ মেমসাহেব এতক্ষণে প্রশ্ন করে।

‘বলব।’

আবার মুহূর্তের জগ মেমসাহেব চুপ করে। দৃষ্টিটা একটু সরিয়ে দিয়ে জানতে চায়, একদিন যখন আমরা হজনে এক হবো, সংসার করব, তখনও তুমি আমাকে আজকের মত ভালবাসবে?

ইচ্ছা করল মেমসাহেবকে টেনে নিই বুকের মধ্যে। ইচ্ছা করল আদর ভালবাসায় ওকে স্নান করিয়ে দিয়ে বলি, সেদিন তোমাকে হাজার গুণ বেশী ভালবাসব। কিন্তু পারলাম না। কম্পার্টমেন্টে আরো কজন যাত্রী ছিলেন। তাই শুধু মেমসাহেবের হাতটা টেনে নিয়ে বললাম, আমাকে নিয়ে কি আজও তোমার হৃষিচক্ষা হয়?

মেমসাহেব তাঙ্গাড়ি ছহত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে  
বলল, না, না। আমি জানি তুমি আমাকে অনেক অনেক বেশী  
ভালবাসবে। আমি জানি তুমি আমাকে শুধী করবে।

‘সত্য?’

‘সত্য।’

দোলাবৌদ্ধি, সে কদিনের কাহিনী আমার জীবনের অবিশ্বারণীয়  
স্মৃতি। সে স্মৃতি শুধু অহুত্বের অস্ত, লেখার অস্ত নয়। তাছাড়া  
অনেক দিন হয়ে গেছে। প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তের ইতিহাস  
মনে নেই। মনে আছে—

হঠাতে ঘুমটা ভেঙে গেল। কিসের যেন আওয়াজ ভেসে এলো  
কানে। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে বুলাম মেমসাহেব  
দরজা নক করে ডাকছে, ‘শোন’। সেই ময়না পাখীর ডাক, ‘শোন।’

আমি শুনি কিন্তু জবাব দিই না। বেশ লাগে ঐ ডাকটা।  
কেমন যেন আদর-ভালবাস। আবেদন-নিবেদন, দাবী ইত্যাদি  
ইত্যাদির কক্টেল থাকত ঐ ডাকে। তাই তো আমি তঙ্গামী করে  
ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকি। বেশ বুঝতে পারছি ঘুমুর সময়  
একলাই ঘুমিয়েছে কিন্তু আর পারছে না। এবার একটু ছুটে  
আসতে চাইছে আমার কাছে। হয়ত একটু আদর করতে চায়,  
হয়ত একটু আদর পেতে চায়। হয়ত আমার পাশে শুয়ে আমার  
হৃদয়ের একটু নিবিড় উষ্ণতা উপভোগ করতে চায়। হয়ত...

আবার দরজায় আওয়াজ ! সঙ্গে সঙ্গে...‘শোন’...‘শুনছ’ ?

আমি চৌকার করে জিজ্ঞাসা করি, কে ?

‘আমি। দরজা খোল।’

বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে উন্নত দিলাম, খুলছি।

একটু পরে গায় চাদরটা জড়িয়ে চোখ ছুটে প্রায় বন্ধ করা  
অবস্থায় দরজাটা খুলে দিলাম। চোখ ছুটো বন্ধ করা অবস্থাতেই  
আবার এসে বপাং করে খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম।

মেমসাহেব দরজাটাৰ পৰ্যটা বেশ ভাল কৰে টেনে দিয়ে আমাৰ  
দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, বাপৰে বাপ ! কি শু্যু শু্যুতে  
পার তুমি !

আমি শুমেৰ ভান কৰে শুয়ে ধাকায় উত্তৰ দিলাম না । দেখলাম  
মেমসাহেব আস্তে আস্তে আমাৰ কাছে এগিয়ে এলো । আমাৰ  
চোখ ছুটো বক্ষ ছিল কিন্তু ওৱ নিখাস পড়া দেখে বেশ বুৰতে  
পারহিলাম যে কত নিবিড় হয়ে আমাকে দেখছিল । যুথে, কপালে  
হাত দিয়ে আদৰ কৰতে কৰতে জিজ্ঞাসা কৰল, শুমুছ ?

আমি তবুও নিৰন্তৰ রইলাম । সজোৱে একটা দীৰ্ঘনিখাস  
ছেড়ে পাশ ফিৱে শুলাম । মেমসাহেব আমাৰ পাশে বসে বসে  
অনেকক্ষণ আমাকে আদৰ কৰল । আমি আবাৰ একটা দীৰ্ঘনিখাস  
ছেড়ে পাশ ফিৱে ডান হাত দিয়ে মেমসাহেবকে জড়িয়ে ধৰলাম ।  
একটু অস্পষ্টভাবে ডাক দিলাম, মেমসাহেব ।

‘এইত !’

আমি আৱ কোন কথা বলি না ।

মেমসাহেব বলে, শুনছ ? কিছু বলবে ?

আমি তবুও কোন জবাব দিই না ।

এমনি কৰে আৱো কিছুক্ষণ কেটে যায় । তাৱপৰ মেমসাহেব  
একটু অভিমান কৰে বলে, তুমি কি জাগবে না ? উঠবে না ?

আমি হঠাত চোখ ছুটো খুলে স্বাভাৱিকভাবে বলি, জাগব কিন্তু  
উঠব না !

মেমসাহেব আমাৰ গালে একটা চড় মেৰে বলে, অসভ্য  
কোথাকার । জেগে থেকেও কথাৱ উত্তৰ দেয় না ।

আমি শুধু বলি, আমি জেগে আছি জানলে কি অমন কৰে তুমি  
আমাকে আদৰ কৰতে ?

‘আবাৰ অসভ্যতা !’

আমি আস্তে আস্তে মেমসাহেবকে কাছে আনি, বুকেৱ মধ্যে

ଟେନେ ନିଇ । ଏକଟୁ ଆଦର କରି, ଏକଟୁ ଭାଲବାସି । ମେମସାହେବକେ ଏକଟୁ ଦେଖେ ନିଇ । ଆଦର-ଭାଲବାସାୟ ଓର ଚୋଥ ଛଟୋ ଯେନ ଆରୋ ଉଜ୍ଜଳ ହୟ, ଗାଲ ଛଟୋ ଯେନ ଆରୋ ଏକଟୁ ଫୁଲେ ଉଠେ, ଠୋଟ ଛଟୋ ଯେନ କଥା ବଲେ ।

### ତାରପର ?

ବଲତେ ପାର ଦୋଲାବୌଦ୍ଧି, ତାରପର କି ହଲୋ ? ଛଟୁମି ? ହ୍ୟା, ଏକଟୁ କରେଛିଲାମ । ବେଶୀ ନୟ । ଶୁଦ୍ଧ ଓର ଛଟି ଓର୍ଛେର ଭାବା, ଇଞ୍ଜିନ ଜେନେଛିଲାମ, ଆର କିଛୁ ନୟ । ମେମସାହେବ ? ମୁଖେ କିଛୁ ବଲେ ନି । ଚୋଥ ବୁଜେ ମୁଖ ଟିପେ ଟିପେ ହାସଛିଲ ।

### ତାରପର ?

ତାରପର ମେମସାହେବ ଆମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ, ଗାନ ଶୁଣବେ ?

ଆମି ବଲାଇଲାମ, ନା ।

‘ବେଶ କରବ ଆମି ଗାନ ଗାଇବ, ତୋମାୟ ଶୁଣତେ ହବେ ନା ।’

ମେମସାହେବ ଘୁରେ ବସଲ । କମ୍ବାଇ-ଏ ତର ଦିଯେ ହାତେର ଓପର ମୁଖ୍ଟା ରେଖେ ପ୍ରାୟ ଆମାର ମୁଖେର ଓପର ହମଡ଼ି ଥେଯେ ପଡ଼ଲ । ତାରପର ଥୁବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଇଲ—ମନ ଯେ କେମନ କରେ ମନେ ମନେ, ତାହା ମନଇ ଜାନେ ।

ଏମନି କରେଇ ଶୁରୁ ହତୋ ଆମାଦେର ସକାଳ । ସ୍ଵାନ ସେରେ ନ'ଟାର ମଧ୍ୟେ ଡାଇନିଂ ହଲେ ଗିଯେ ମେମସାହେବ ବ୍ରେକଫାସଟ ଥେଯେ ଆସତ କିନ୍ତୁ ଆମି ତଥନ ଓ ଉଠିତାମ ନା । ଡାଇନିଂ ହଲ ଥେକେ ଫିରେ ଏସେ ମେମସାହେବ ଆମାକେ ଏକଟା ଦାବଡ଼ ଦିତ, ଛି, ଛି, ତୁମି ଏଖନ ଓ ଓଠନି ?

‘ଏକବାର କାହେ ଏସ, ତବେ ଉଠିବ ।’

ଏକଟୁ ଦୂରେ ଦ୍ଵାଙ୍ଗିଯେ ମେମସାହେବ ବଲେ, ନା ଆମି ଆର କାହେ ଆସବ ନା ।

‘କେନ ?’

‘କାହେ ଗେଲେଇ ତୁମି—’

ମେମସାହେବ ଆର ବଲେ ନା । ଆମିଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରି, ତୁମି କି ?

‘কি আবার ? কাছে গেলেই তো আবার ছাঁমি করবে ।’

‘তাতে কি হলো ?’

ঝি টানা টানা জ্ব ছটো উপরে উঠিয়ে ও বলে, কি হলো ?  
তোমার ঝি দাঢ়ির ধোঁচা খেয়ে আমার সারা মুখটা এখনো জলে  
যাচ্ছে ।

আমি তিড়িং করে এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে  
মেমসাহেবকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি । বলি, জলে যাচ্ছে ?

‘তবে কি ?’

‘বিষ দিয়ে বিষক্ষয় করে দিচ্ছি ।’

‘আবার অসভ্যতা ?’

আমি বাথরুম থেকে বেরতে বেরতেই মেমসাহেব আমার  
ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসে । আমি বলি, কি আশ্চর্য ! একটা বেয়ারাকে  
বলতে পারলে না ?

‘আজ্ঞে বেয়ারারা আপনার চাকর নয় । ন'টার পর শরা  
ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে না ।

‘তাই বলে তুমি ? যারা দেখল, তারা কি ভাবল বল তো ?’

ট্রে-টা নামিয়ে রেখে টোস্টে মাখন মাখাতে মাখাতে বলল,  
ভাবল আমার কপালে একটা অপদার্থ কুঁড়ে জুটেছে ।

বল দোলাবৌদ্ধি, এ কথার কি জবাব দেব ? আমি জবাব  
দিতাম না । চুপটি করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিতাম ।

তারপর বারান্দায় ছটো সোফায় বসে আমরা গল করতাম  
কিছুক্ষণ । কিছুক্ষণের জন্য একটু ঘুরে ফিরেও আসতাম । হপুর-  
বেলায় লাখ খাবার পর মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করত, এখন একটু  
ঘুমোও ।

‘কেন আজকে কি রাত্রি জাগবে ?’

আবার সেই গালে একটা চড় । আবার সেই মন্তব্য, অসভ্য  
কোথাকার !

ছপুরে শুমুতাম না। শুয়ে থাকতাম। আমার হাতটা ভুল করে একটু অবাধ্যতা করলে মেমসাহেব বলত, দয়া করে তোমার হাতটাকে একটু সংযত কর।

‘কেন? আমি কি না বলিয়া পরের জ্বে হাত দিতেছি?’

‘পরের জ্ব না হইলেও আমি এখনও আপনার জ্ব হই নাই বলিয়া আপনি হাত দিবেন না।’

আমি চট করে উঠে পড়ে গায় জামাটা চাপিয়ে বেরুতে যাই। মেমসাহেব জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছ?

‘বাজারে।’

‘কেন?’

‘মালা কিনতে, টোপর কিনতে।’

মেমসাহেব হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, তাই বলে এই ছপুরে যেও না।

ও আমাকে টেনে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আমার পাশে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে বলে, এখনই যদি আমার জন্য এত পাগলামি কর, তবে ত্বিষ্ণুতে কি করবে?

‘দেখ মেমসাহেব, রেশনের হিসাব মত চাল-গম বিক্রী করা চলতে পারে কিন্তু ভালবাসা চলতে পারে না।’

আমার কথা শুনে শুচকি শুচকি হাসে।

জান দোলাবৌদি, সমাজ-সংসার থেকে কঠি দিনের জন্য আমরা দূরে চলে গিয়েছিলাম। ইচ্ছা করলে মুক্ত বিহঙ্গের মত সঙ্গেগের মহাকাশে আমরা উড়ে বেড়াতে পারতাম কিন্তু তা করিনি। মেমসাহেবকে অত কাছে পেয়ে, নিবড় করে পেয়ে, স্বাধীনভাবে পেয়ে মাঝে মাঝে আমার চিত্ত চঞ্চল হয়েছে, শিরার মধ্য দিয়ে উজ্জেব্বলার বশ্য বয়ে গেছে, শ্যায়-অশ্যায়ের সৃষ্টি বিচার-বৃক্ষ কখনও কখনও হারিয়ে গেছে কিন্তু তবুও শাস্ত-নিপত্তি ভালবাসার ছোঁয়ায় মেমসাহেব আমাকে সংযত করে রেখেছে। প্রথম কদিন শুকে

কাছে পাবার সময় ওর এই সংযম, সংযত আচরণ আমাকে মুক্ত করেছিল। আমি হয়ত ওকে শ্রদ্ধাও করতে আবস্থা করেছিলাম।

ভবিষ্যতের জন্য আমরা অনেক কিছু গচ্ছিত রাখলেও এই কটি দিনে অনেক কিছু পেয়েছিলাম। দেহের শুধু মিটাইনি কিন্তু চোখের তৎক্ষণাৎ, প্রাণের হাতাহাকার, মনের দৈন্য দূর হয়েছিল। আর? আর দূর হয়েছিল চিন্ত-চাঞ্চল্য ও মানসিক অস্থিরতা। আমার চোখের সামনে একটা সুন্দর শাস্তি ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি ফুটে উঠেছিল।

আর মেমসাহেব? আমার অনেক দুর্বলতার মধ্যেও মেমসাহেব আমার ভালবাসার গভীরতা উপলক্ষ্মি করেছিল। অঙ্কের যষ্টির মত আমার জীবনে তার অনগ্ন গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। শিক্ষিতাই হোক আর সুন্দরীই হোক, গরীব হোক বা ধনী হোক, মেয়েদের জীবনে এর চাইতে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে?

তাইতো হাসি, খেলা, গান ও রাত্রি জাগরণের মধ্য দিয়েও আমরা ভবিষ্যতের রাস্তা ঠিক করে নিয়েছিলাম। তবে মিলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম শুধু কিছু হাসি আর খেলা করে জীবনটাকে নষ্ট করব না।

কলকাতা ফেরার আগের দিন রাত্রিতে মেমসাহেব সেই আমার দেওয়া শাড়ীটা পরেছিল। তারপর মাথায় কাপড় দিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে আমাকে প্রণাম করেছিল। সেদিন আমার জীবন-উৎসবের পরম মুহূর্তে কোন পুরোহিত মন্ত্র পড়েন নি, কোন কুলবধু শঁথ বাজান নি, আঘীয়-বন্ধু সাক্ষী রেখে মালা বদল করিনি কিন্তু তবুও আমরা তবে জেনেছিলাম আমাদের ছাতি জীবনের গ্রন্থিতে অচেত্য বন্ধন পড়ে।

ତୋମାର ଚିଠି ପେଯେଛି । ଏକବାର ନୟ, ଅନେକବାର ପଡ଼େଛି । ତୁମି ହୟତ ଆମାର ମନେର ଥବର ଠିକଇ ପେଯେଛ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ମନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଥାକଲେଓ ଆକ୍ଷେପ ନେଇ, ବେଦନା ଥାକଲେଓ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଫାନି ନେଇ । ତାର ଦୀର୍ଘ କାରଣ ଆଜ ବଲବ ନା, ହୟତ ତୁମିଓ ବୁଝବେ ନା । ଆମାର ଏହି କାହିନୀ ସଖନ ଲେଖା ଶେବ ହବେ, ସେଦିନ ଆଶା କରି ସବକିଛୁ ଦିନେର ଆଲୋର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବେ ।

ତବେ ହଁଯା, ଆଜ ଏଇଟୁକୁ ଜେନେ ରାଖ ଆମି ଜୀବନେ ଯେ ପ୍ରେମ-ଭାଲବାସାର ଗ୍ରିଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ପେଯେଛି, ତାର ତୁଳନା ହୟ ନା । ହୟତ ଆରୋ ଅନେକେ ଏହି ଗ୍ରିଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ପେଯେଛେନ । ତାଂଦେର ସଙ୍ଗେ ଆମାର ଗ୍ରିଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର କୋନ ତୁଳନା କରାର ମାପକାଠି ଆମାର ଜ୍ଞାନା ନେଇ, ପ୍ରୋଜନଓ ନେଇ । ତବେ ଏଇଟୁକୁ ନିଶ୍ଚଯଇ ଜାନି ଆମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟେଛି । ଆର ଜାନି ଆମାର ଏହି ଗ୍ରିଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀର କୋନ ଧନୀର କୋନ ଗ୍ରିଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ତୁଳନା ହୟ ନା । ଧନୀ ଏକଦିନ ସମ୍ଭବ କିଛୁ ହାରିଯେ ଦରିଦ୍ର, ତିଥାରୀ ହତେ ପାରେ, ସେ ଗ୍ରିଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ହସ୍ତାନ୍ତର ହତେ ପାରେ, ଅପବ୍ୟାୟ, ଅପବ୍ୟବହାର ହେ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମାର ପ୍ରାଣ-ମନେର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ସମ୍ପଦ କୋନଦିନ ହାରାବେ ନା, ହାରାତେ ପାରେ ନା । ଯତଦିନ ଆମି ଏହି ପୃଥିବୀତେ ଥାକବ, ତତଦିନ ଏ ସନ କାଳୋ ଟାନା ଟାନା ଗଭୀର ଦୁଟି ଚୋଥ ଆମାର ଜୀବନ-ଆକାଶେ ଝବତାରାର ମତ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଭାସ୍ଵର ହୟେ ଥାକବେ । ଏହି ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚଭୂତେର ମାଟିତେ ଏକଦିନ ଆମି ମିଶେ ଯାବ, ଆମାର ସମ୍ଭବ ଖେଳା ଏକଦିନ ସ୍ତର ହୟେ ଯାବେ, ସବାର କାହିଁ ଥେକେ ଆମି ଚିରତରେ ହାରିଯେ ଯାବ, କିନ୍ତୁ ଆମାର ମେମସାହେବ କୋନଦିନ ହାରିଯେ ଯାବେ ନା । ଆମାର ଏହି ଚିଠିଗୁଲି ସତଦିନ ଥାକବେ, ମେମସାହେବଙ୍କ ତତଦିନ ଥାକବେ । ତାରପର ସେ ରହିବେ ତୋମାର ଓ ଆରୋ

অনেক অনেকের স্মৃতিতে। তারপরও ভারতবর্দের অনেক শহরে-নগরে গ্রামে গেলে মেমসাহেবের স্মৃতির স্পর্শ পাওয়া যাবে। উভর বঙ্গের বনানীতে, বোম্বাই'এর সমুদ্রসৈকতে, বরফে-চাকা গুলমার্গের আশেপাশে নিষ্ঠক রাত্রে কান পাতলে হয়ত মেমসাহেবের গান আরো অনেকদিন শোনা যাবে।

দোলাবৌদি, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না, লিখতে পারব না আমার মেমসাহেবের সবকিছু। জানাতে পারব না আমার মনের ভাব, ভাষা, অভ্যন্তর। পৃথিবীর কত দেশ-দেশান্তর ঘুরেছি, কত অসংখ্য উৎসবে কত অগণিত মেয়ে দেখেছি। তাদের অনেককে কাছে পেয়েছি, নিবিড় করে দেখেছি। কতজনকে ভালও লেগেছে। কিন্তু একজনকেও পেলাম না যে আমার কাছে আমার মেমসাহেবের স্মৃতিকে ঝান করে দিতে পারে।

তুমি তো জান আমি বাচবিচার না করেই সবার সঙ্গে মেলামেশা করি। সমাজ সংসারের নিয়ম-কানুনের তোয়াকা না করেই মিশেছি অনেক মেয়ের সঙ্গে। রক্তকরবীর মত তাঁদের অনেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনেকের রূপ-ঘোবন লাভ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে, শিক্ষা-দীক্ষা-আদর্শ ভাল লেগেছে কিন্তু মুহূর্তের জন্মও আমার প্রাণের মন্দিরে নতুন বিশ্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিনি। হেসেছি, খেলেছি, ঘুরেছি অনেক মেয়ের সঙ্গে। আমার এই হাসি-খেলা নিয়ে তুমি হয়ত অনেকের কাছে অনেক কাহিনী শুনবে। দিল্লী ইউনিভার্সিটির বনানী রায়কে নিয়ে আজো ডিফেন্স কলোনীর অনেক ড্রইংরমে আমার অসাক্ষাতে সরস আলোচনা হয়, আমি তা জানি। আমি জানি আমাদের লগুন হাই কমিশনের থার্ড সেক্রেটারী অতসীকে নিয়ে আমার ব্রাইটন ভ্রমণকে কেন্দ্র করে অনেক আরব্য উপন্থাসের কাহিনী বিলেত থেকে কলকাতার কফি হাউস পর্যন্ত গড়িয়েছে।

আমি কি করব বল? আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থাই এমন

যে স্বামী-স্ত্রীর একটু স্বাধীন আচরণ আজও বহুজনে বরদান্ত করতে পারেন না। সমাজ অনেক এগিয়েছে। সারা পৃথিবীর বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে আমরা অনেকেই মেলামেশা করছি কিন্তু রক্তের মধ্যে আজও অতীত দিনের সংস্কারের বীজ হয়ে গেছে। তাইতো তাটিপাড়ার কুপমঞ্চক সমাজ থেকে হাঙ্গার মাইল দূরে বসেও দিল্লীর সফিসটিকেটেড বাঙালী গৃহিণীরা বনানীকে দুর্গাপূজার প্যাণ্ডেলে দেখলে আলোচনা না করে থাকতে পারেন না।

একটু কান পাতলে শোনা যাবে মিসেস দত্ত বলছেন, এই চন্দ্রিমা ঢাখ, ঢাখ, বনানী এসেছে।

‘কই? কই?’

‘ঐ তো।’

‘একলা?’

‘তাইতো দেখছি।’

চন্দ্রিমা একটু এদিক ওদিক দেখে বলে, ঐ তো সাদা হেরেন্ড! রিপোর্টার সাহেব নিশ্চয়ই এসেছে।

বলাকা। সরকারও প্রায় ছুটে চলে আসে। চন্দ্রিমার কানে কানে বলে, দেখেছিস, মিসেস রিপোর্টার এসেছে।

‘অনেকক্ষণ দেখেছি?’

বনানী এগিয়ে যায় প্রতিমার কাছে। হাত জোড় করে প্রণাম করে। ইতিমধ্যে আমি পাশে এসে দাঢ়াই। বনানী গাড়িতে পার্সটা রেখে এসেছে; আমার কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে প্রণামী দেয়।

বলাকা, চন্দ্রিমা, মিসেস দত্ত ও আরো অনেকে তা দেখেন। আরো অনেক নবীনা প্রবীণা দেখেন আমাদের।

বলাকা বলে, যাই বলিস ভাই, ছজনকে বেশ ম্যাচ করে কিন্তু!

মিসেস দত্ত বলেন, ম্যাচ করলে কি হবে! ওরা তো আর বিয়ে করছে না, শুধু খেলা করছে।

চলিমা বলে, না, না। নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। তা নাহলে ছজনে মিলে এমন করে ঘোরাঘুরি করে।

আমরা ছজনে প্যাণেল থেকে বেঁকবার জন্য এগিয়ে চলি। বনানীর সাইড-ভিউ বোধহয় বলাকার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তাইতো চলিমাকে ফিসফিস করে বলে, যাই বলিস, সী হাজ এ ডেরী অ্যাট্রাক্টিভ ফিগার ?

বনানীর প্রশংসায় মিসেস দত্ত মুহূর্তের জন্য নিজের ফিগার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়েন। শাড়ীর আঁচলটা আর একটু বেশী নিবিড় করে জড়িয়ে নেন। মনে মনে বোধহয় একটু ঈর্ষাও দেখা দেয়। তাইতো বনানীকে ছোট করার জন্য আমাকে একটু বেশী ঘর্ষণ দেন। বলেন, রিপোর্টারও তো কম হাণুসাম নয়।

দূরে এক পুরোন বস্তুকে দেখে বনানী নজর না করেই ডান দিকে ঘূরতে গিয়ে এক ভজলোককে প্রায় ধাক্কা দিতে গিয়েছিল। আমি ওর হাত ধরে চট করে টেনে নিলাম।

বনানী শুধু বলল, থ্যাক্স।

সান-গ্লাসের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিটা একটু গ্রে কোণার দিকে নিতেই বেশ বুঝতে পারলাম বনানীর হাত ধরার জন্মে অনেকের হার্ট অ্যাটাক হতে হতে হয় নি।

এসব আমি জানি। কি করি বল ? সবার সঙ্গে আমি মিশতে পারি না। কিন্তু যাদের সঙ্গে মেলামেশা করি, তাদের সবার সঙ্গেই এমনি সহজ, সরল, স্বাভাবিকভাবেই মিশে থাকি। বনানী, অতসী ও আরে। অনেকেই একথা জানে। মেমসাহেব তো জানেই।

এই যে অতসী ! যাঁরা জানেন না তাঁরা কত কি কল্পনা করেন আমাদের ছজনকে নিয়ে।

তুমি কি অতসীর কথা শুনেছ ? ও যে জান্টিস রায়ের একমাত্র কল্পনা সে কথা নিশ্চয়ই জান। তারপর ওর মা হচ্ছেন অভারতীয়, আইরিশ মহিলা। স্বতরাং সংস্কারের বালাই নেই, নেই অর্ধের

অভাব। সেখাপড়া শিখেছে পাবলিক স্কুলে, পরে বি-এ পাশ করেছে অক্সফোর্ড থেকে। এখন তো ফরেন সার্ভিসে।

অতসী যখন অক্সফোর্ডে পড়ে তখনই আমার সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়। তার পরের বছর ও যখন দেশে ফেরে, তখন আমিও ইউরোপ ঘুরে দেশে ফিরছি। একই মেলে ছজনে লগুন থেকে রওনা হই। পথে ছদ্ম বেইরটে ছিলাম।

সেই ছুটি দিন আমরা প্রাণভরে আড়ডা দিয়েছি। দিনের বেলায় বীচ-এ বসে, সন্ধ্যার পর সেন্ট জর্জ হোটেলের বার বা লাউঞ্জে বসে একটু আধুনিক ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খেতে খেতে গল্প করেছি। দিল্লী রওনা হবার ঠিক আগের দিন গভীর রাত্রে অতসীর মাথায় ভূত চাপল। বলল, চলুন, নাইট ক্লাব ঘুরে আসি।

‘এত রাত্রে?’

‘হায়াটস রঙ ইন্ ঢাট?’

‘কাল সকালেই তো আবার রওনা হতে হবে। তাই আর কি!’

‘নাইট ক্লাবগুলো তো গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার অফিস নয় যে দশটা-পাঁচটায় খোলা থাকবে! নাইট ক্লাব তো রাত্রেই খোলা থাকে।’

অতসী আর একটি যুহুর্তও নষ্ট করতে রাজী নয় বলে, ‘কাম অন। ফিনিশ ইওর প্লাস।’

চক্ষের নিমেষে বাকি শ্যাম্পেনটুকু গলা দিয়ে চেলে দিল অন্তরের অজ্ঞান। গহ্বরে। ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়ে আমিও শেষ করে উঠলাম। চেলে গেলাম ‘ব্লাক এলিফ্যান্ট’।

পালামে মেঘসাহেব এসেছিল আমাদের রিসিভ করতে। অতসী ওকে কি বলেছিল জান? বলেছিল, টোয়েন্টিয়েথ সেপ্টেম্বরীর একজন জার্নালিস্ট যে এত কনজারভেটিভ হয়, তা আমি ভাবতে পারিনি।

মেমসাহেব একটু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কেন কি হয়েছিল ?

‘মাই গড ! কি হয় নি তাই জিজ্ঞাসা কর। অতসী রায়ের ইনভিটেশনে মাইট ক্লাবে যেতে চায় না !’

মেমসাহেব হাসতে হাসতেই একবার আমাকে দেখে নেয়। অতসী বলে, তুমি আর হাসবে না ! যে অতসী রায়ের সঙ্গে লগুনের ছোকরা ব্যারিস্টাররা এক কাপ কফি খেতে পেলে ধন্য হয়, সেই আমার সঙ্গে বেইরটের ‘ব্র্যাক এলিফ্যাটে’ বসে শ্বাস্পন খেতে দ্বিধা করে তোমায় এই অপদার্থ প্রসপেকটিভ গার্ডিয়ান !

মেমসাহেব বাঁকা চোখে এক ঝলক আমাকে দেখে নিয়ে বলে, আই অ্যাম সরি অতসী ! আই প্লীড গিন্টি�.....

মেমসাহেবের গাল টিপে দিয়ে অতসী বলে, অত ভালবেসো না। ছোকরাটার মাথাটা খেলে !

যাই ছোক সেবার ঢাকা থেকে লগুন যাবার পথে প্রথমে কলকাতা, পরে দিল্লী এলো। কলকাতা থেকে সে যে মেমসাহেবকে নিয়ে এসেছে, তা জানতাম না। দিল্লী আসার খবরটাও আগে পাইনি। হঠাত একদিন সকালবেলায় অতসীর টেলিফোন পেয়ে চমকে গেলাম।

‘কি আশ্চর্য ! আসার আগে একটা খবর দিলে না ?’

অতসী দুঃখ প্রকাশ করে, ক্ষমা চায়। শেষে একবার জরুরী কারণে তক্ষুনি হোটেলে তলব করে।

আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লারিজে হাজির হই। দোতলায় উঠেকরিডর দিয়ে একেরারে কোণার দিকে চলে যাই। দরজা নক করি।

কোন জবাব পেলাম না। আবার নক করলাম।

এবার উত্তর পাই, যাস্ট এ মিনিট।

তু’এক মিনিটের মধ্যেই অতসী দরজা খুলে অভ্যর্থনা করে। আদর করে ভিতরে নিয়ে যায়।

‘কি ব্যাপার ? এবার যে একটা খবরও দিলে না ?’

‘বিলিভ মী, ইট অল হাপেনড সাডেন্লী । তাছাড়া কলকাতা  
থেকে বুকিং করতেই বড় বামাল। পোছাতে হলো ।’

‘কদিন কলকাতায় ছিলে ?’

‘তিন দিন ।’

‘ডিড ইউ মীট মেমসাহেব ?’

‘মাই গড ! মেমসাহেব ছাড়া কি কোন চিন্তা নেই আপনার  
মনে ?’

‘নিশ্চয়ই আছে । তবে আফটার মেমসাহেব ।’

হাত দিয়ে আমার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে অতসী  
জানতে চায়, আমি তাই ?

‘তুমি তো অন্য ক্যাটাগরী ।’

অতসী কেমন যেন একটা অসুস্থ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় ।  
বলে, কেন, আমি কি আপনার মেমসাহেবের জায়গায়...

আমি সোফা ছেড়ে উঠে দাঢ়াই । শুধু বলি, অতসী আমার  
অনেক কাজ আছে । এখন চলি, পরে দেখা হবে ।

অতসী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঢ়ায় । হ'হাত দিয়ে আমার ছটো  
হাত চেপে ধরে । বলে, না, তা হবে না । আপনি এখন আমার  
কাছেই থাকবেন ।

আমি অবাক হয়ে যাই । ভেবে কুলকিনারা পাই না অতসীর এই  
বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের কারণ । মুহূর্তের মধ্যে নারী-চরিত্রের বিচ্ছি-  
ধারার নানা সন্তানার কথা চিন্তা করে নিলাম । ভাবলাম,  
মনের টান, না দেহের দাবী ? বড়লোকের মেয়ের খামখেয়ালি  
নাকি...

অতসীকে নিয়ে আমার অত শত চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা  
বোধ করলাম না । যা ইচ্ছে তাই হোক । আমি ফালতু বামেলায়  
জড়িয়ে না পড়লেই হলো ।

ଆରୋ ଏକଟୁ ଚିନ୍ତା କରି । ଡିପ୍ଲୋମ୍ୟାଟ୍ ହୟେ ଡିପ୍ଲୋମ୍ୟାସୀ  
କରହେ ନା ତୋ ?

ଆମି ବଲଲାମ, ଅତ୍ସୀ, ଧୋଡ଼ାର ଗାଡ଼ିର ଏକଟା କୋଚୋଯାନେର  
ହାତେ ଇମ୍ପାଳା ଦିଯେ ଥେଲା କରତେ ତୋମାର ଭୟ ହଜ୍ଜେ ନା ?

‘ଓସବ ହେଁଯାଲି ଛାଡୁନ । ଆଇ ଅୟାମ ଫିଲିଂ ଲୋନଲି, ଉଡ ଇଟ  
ଗିଭ ମୀ କମ୍ପାନୀ ଅର ନଟ ?’

‘ହୋଯାଇ ନଟ ହାତ ବେଟାର କମ୍ପାନୀ ?’

‘ଆମାର ଖୁଶି ।’

‘କିନ୍ତୁ ଆମାର ତୋ ଖୁଶି ନାହିଁ ହତେ ପାରେ ?’

ଏକ ବଲକ ଅତ୍ସୀକେ ଦେଖେ ନିଲାମ । ହ'ହାତ ଦିଯେ ଅତ୍ସୀର  
ଭାନ ହାତଟା ଟେନେ ନିଯେ ହାଣୁସେକ କରେ ବଲଲାମ, ଶୁଣ ବାଇ !

ଆମି ଝଡ଼େର ବେଗେ ସର ଥେକେ ବେରିଯେ କରିଡିର ଦିଯେ ହନହନ  
କରେ ଏଗିଯେ ଯାଞ୍ଚିଲାମ ସିଁଡ଼ିର ଦିକେ । ହଠାତ ପିଛନ ଥେକେ କାନେ  
ତେବେ ଏଲୋ, ଶୋନ !

ଥମକେ ଦ୍ଵାଡ଼ାଲାମ କିନ୍ତୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଭେଙେ ଯାବାର ଭୟେ ପିଛନ ଫିରଲାମ  
ନା । ମନେର ଭୁଲ ?

‘ଶୋନ’ ।

ଆମାର ଜୀବନ-ରାଗିନୀର ସୁରକାରେର ଐ କଷ୍ଟର ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଶୋନାର  
ପର ଆର ନିଜେକେ ସଂସତ ରାଖିତେ ପାରଲାମ ନା । ପିଛନ ଫିରଲାମ ।

କି ଆଶ୍ରଯ ! ମେମସାହେବ !

ଅତ୍ସୀର ସରେର ଦରଜାର ସାମନେ ଦ୍ଵାଡ଼ିଯେ ମୁଢ଼ିକି ହାସତେ ହାସତେ  
ମେମସାହେବ ଡାକ ଦିଲ, ଏହି ଶୋନ !...

ଆମି ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼େ ଗୋଲାମ । ମେମସାହେବ ଆମାକେ ଅଭ୍ୟର୍ଣ୍ଣା  
କରାର ଜଣ୍ଣ କ୍ଷିର ହୟେ ଦ୍ଵାଡ଼ିଯେଇ ରଇଲ । ଆମି ଅବାକ ବିଶ୍ୱାସେ  
ବଲଲାମ, ତୁମି !

ମେହି ଶାନ୍ତ, ମିଳ, ମିଷ୍ଟି ଗଲାଯ ମେମସାହେବ ବଲଲ, କି କରବ ବଲ,  
ଅତ୍ସୀ ଜୋର କରେ ନିଯେ ଏଲୋ ।

তুমি বেশ কল্পনা করতে পারছ তারপর ফ্লারিজ হোটেলের ঐ কোণার ঘরে কি কাণ্ড হলো ! প্রথম আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমি অতসীকে জড়িয়ে ধরে বললাম, টেল মী অতসী হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ ?

অতসী বলল, বেশী কিছু চাইব না । শুধু অনুরোধ করব আগামী সাত দিন এদিকে এসে দুটি যুবতীকে বিরক্ত করবেন না ।

‘প্রতিজ্ঞা করছি বিরক্ত করব না, তবে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য, স্মর্থী করার জন্য নিশ্চয়ই আসব ।’

মেমসাহেব টিপ্পনী কেটে বলল, অতসী ওসব কল্পনাও করিস না । পুরুষদের যদি অত সংযম থাকত তাহলে পৃথিবীটা সত্তি পাণ্টে যেত ।

আমি মেমসাহেবকে বলি, বিশ্বামিত্রের মত কাজকর্ম নিয়ে আমি তো বেশ ধ্যানমগ্ন ছিলাম কিন্তু তুমি মেনকা দেবী এক হাজার মাইল দূরে নাচতে এলে কেন ?

তারপর ঐ ঘরে বসেই তিনজনে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলাম । মেমসাহেব বলল, জান, অতসীর সঙ্গে আমার কি বাজী হয়েছে ?

‘কি ?’

অতসী বলে, না, না, কিছু না ।

আমি বলি, থাক মেমসাহেব, এখন বলো না । অতসী ঘাবড়ে গেছে ।

অতসী কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে বলল, তাহলে আমিই বলি শুন, বাজী হয়েছিল যে আমি যদি আপনাকে ভোলাতে পারি তাহলে কাজলদি আমাকে একটা শাড়ী প্রেজেন্ট করবে । আর আমি হেরে গেলে আমি কাজলদিকে একটা শাড়ী প্রেজেন্ট করব ।

এতক্ষণে বুল্লাম অস্তী কেন আমার সঙ্গে অভিনয় করেছিল ।

আমি বললাম, অস্তী তোমার কাজলদিকে তোমার শাড়ী

କିନେ ହିତେ ହବେ ନା । ତୁମି ଯେ ତୋମାର କାଜଳଦିକେ ଟେନେ ଆନତେ  
ପେରେଛ, ସେଜଣ୍ଡ ତୁମିଇ ତୋ ଅଥମେ ଶାଢ଼ୀ ପାବେ ।

ଆମି ହଜନକେଇ ଶାଢ଼ୀ କିନେ ଦିଯେଛିଲାମ । ହଜନେଇ ଖୁଶି  
ହେଯେଛିଲ । ଆମିଓ ଖୁଶି ହେଯେଛିଲାମ । ଏକଟା ସଂଗ୍ରାହ ଯେନ ସ୍ଵପ୍ନେର  
ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗେ କେଟେ ଗେଲ ।

ଅତ୍ସୀ ଆମାଦେର ହଜନକେ ସତିୟ ଭାଲବାସେ । ଓ ମେମସାହେବକେ  
କାଜଳଦି ବଲେ କେନ ଜାନ ? ଅତ୍ସୀ ବଲତ ମେମସାହେବର ଚୋଥ  
ଦୁଟିତେ ଝୁମୁକ୍ତ ଭଗବାନ ସଯଞ୍ଜେ କାଜଳ ମାଖିଯେ ଦିଯେଛେନ । ସେଜଣ୍ଡାଇ ଅତ୍ସୀ  
ମେମସାହେବକେ କାଜଳଦି ବଲତ । ଭାରୀ ଚମକାର ନାମ, ତାଇ ନା ?

ଯାଇ ହୋକ ଏଦେର ଆମି ଭାଲବାସି, ଆମି ଏଦେର କଲ୍ୟାଣ କାମନା  
କରି । ଓରାଓ ଆମାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ । ଆମି ଏଦେର ଅତି କୃତଜ୍ଞ  
କିନ୍ତୁ ମେମସାହେବର ଶୃତିକେ ଖାନ କରତେ ପାରେ ନା କେଉ । ପାରବେ  
କେନ ବଲ ? ଆମାର ଭବିଷ୍ୟତେର ଉତ୍ସ ମେମସାହେବ ଯେ ମୂଳଧନ  
ବିନିଯୋଗ କରେଛିଲ, ତାର କି କୋନ ତୁଳନା ହୟ ? ହୟ ନା ।

ତାହାଡ଼ା ଆରୋ ଏକଟା ବ୍ୟାପାର ଆଛେ । ଆମାର ଜୀବନେର ସେଇ  
ଅମାବସ୍ତାର ରାତେ ଶୁଦ୍ଧ ମେମସାହେବଇ ଏସେଛିଲ ଆମାର ପାଶେ । ପ୍ରେମ  
ଦିଯେଛିଲ, ଭାଲବାସା ଦିଯେଛିଲ, ଅଭୟ ଦିଯେଛିଲ ଆମାକେ । ନିଜେର  
ଆଗେର ପ୍ରଦୀପେର ମଙ୍ଗଳ-ଆଲୋ ଦିଯେ ଆମାକେ ସେଇ ତିମିର ରାତି  
ଥେକେ ପ୍ରଭାତେର ଦ୍ୱାରଦେଶେ ଏନେ ଦିଯେଛେ ଆମାର ସେଇ ମେମସାହେବ ।  
ତାଇତୋ ତାର ସେ ଶୃତିକେ ଖାନ କରାର କ୍ଷମତା ଶତ ସହସ୍ର ବନାନୀ ବା  
ଅତ୍ସୀର ନେଇ ।

ମେବାର ବାଇରେ ଥେକେ ସୁରେ ଆସାର ପର ମେମସାହେବ ଆମାକେ  
ବଲଲ, ତୋମାର କାଜକର୍ମ ସମ୍ପର୍କେ ନତୁନ କିଛୁ ଭାବନି ?

‘ଭେବେଛି ବୈକି ।’

‘କି ଭେବେଛ ?’

‘ଭେବେଛ ଯେ କଲକାତାର ମାୟା କାଟିଯେ ଏକଟୁ ବାଇରେ ଚେଷ୍ଟା  
କରବ ।’

‘তবে করছ না কেন ?’

‘কিছু অস্মুবিধি আছে বলে ।’

মেমসাহেব ছাড়ার পাত্রী নয়। তাছাড়া আমার জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকা আজ আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাইতো একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মেমসাহেব আমার হাতে দু'শো টাকা গুঁজে দিয়ে: বলল, একবার দিল্লী বা বোম্বে থেকে ঘুরে এসো। হয়ত একটা কিছু জুটেও যেতে পারে।

প্রথমে টাকাটা নিতে বেশ সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়েছিলাম। কারণ আমি জ্ঞানতাম আমার কল্যাণই ওর কল্যাণ। সুতরাং আমার জন্য শুধু দু'শো টাকা কেন, আরো অনেক কিছু সে হাসি মুখে দিতে পারে। তাছাড়া আমার কল্যাণযজ্ঞে তার আছতি প্রত্যাখ্যান করার সাহস আমার ছিল না। তবুও টাকাটা হাতে করে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করল, কি তাবছ ?

‘না, কিছু না।’

‘তবে এমন চুপ করে রইলে ?’

‘এমনি।’

মেমসাহেব আমার হাতটা টেনে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বলল, আমি বলব তুমি কি তাবছ ?

‘বলো।’

‘সত্যি বলব ?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘আমার টাকা নিতে তোমার লজ্জা করছে, অপমানবোধ হচ্ছে। তাই না ?’

‘না, না, তা কেন হবে।’ আমি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি।

মেয়েদের মন আমাদের চাইতে অনেক সতর্ক, অনেক ঝঁশিয়ার। মেমসাহেব বলে, স্বীকার করতে লজ্জা করছে ?

আমি কোন উন্নত দিই না। চুপ করেই বসে থাকি।  
মেমসাহেবও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

মেমসাহেব আবার শুরু করে, তুমি এখনও আমাকে ঠিক  
আপন বলে ভাবতে পার না, তাই না?

আমি তাড়াতাড়ি মেমসাহেবের কাছে এগিয়ে যাই। ওর  
মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলি, ছি ছি, মেমসাহেব, ওকথা কেন  
বলছ?

একটু থামি।

আবার বলি, তোমার চাইতে আপন করে আর কাউকেই তো  
পাইনি।

‘আপন ভাবলে আজ তোমার মনে এই দ্বিধা আসত না?’

আমি আরো কিছু সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু একটু পরে খেয়াল  
করলাম মেমসাহেবের চোখে জল।

তাড়াতাড়ি মেমসাহেবকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। চোখের  
জল মুছিয়ে দিলাম। একটু আদরণ করলাম। শেষে ওর ফোলা  
ফোলা গাল ছটো চেপে বললাম, পাগলী কোথাকার।

মেমসাহেব আমার কোলের মধ্যে শুয়ে রইল কিন্তু তবুও  
স্বাভাবিক হতে পারল না। কিছু পরে একটা দীর্ঘনিশ্চাস ছেড়ে  
বলল, তোমার এত কাছে এসেও তোমাকে পাব না, তা কল্পনা করতে  
পারিনি।

‘লক্ষ্মীটি মেমসাহেব আমার! তুমি দুঃখ করো না।’

মেমসাহেব উঠে বসল। একটু স্থির দৃষ্টিতে চাইল আমার  
দিকে। মুহূর্তের জন্য চিন্তার সাগরে ডুব দিয়ে কোথায় যেন তলিয়ে  
গেল। তারপর বলল, আমাদের জীবনে সংস্কারের একটা বিরাট  
ভূমিকা আছে, তাই না?

‘হঠাতে একথা বলছ?’

ঠাটের কোণে একটু বিজ্ঞপের হাসি এনে মেমসাহেব বলে, অপরিচিত ছাটি ছেলে-মেয়েকে কলাতলায় বসিয়ে একটু মন্ত্র পড়ালেই তারা কত আপন হয়। ঐ সংকারটুকু ছাড়া যত কাছেই আশুক না কেন, ছাটি ছেলেমেয়ে ঠিক আপন হতে পারে না।

তারপর আমার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করে, তাই না?

‘তুমি আমাকে সন্দেহ করছ? আমাকে অপমান করছ?’

‘ছি, ছি, তোমাকে অপমান করব? শুধু বলছিলাম যে আমি যদি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী হতাম তাহলে আমার গয়না বিক্রী করে তোমার মন্তব্যান বা যত্নের অধিকার ধাকত, কিন্তু...’

আমি তাড়াতাড়ি ওর মুখটা চেপে থরে বলি, আর বলো না। মন্ত্র না পড়লেও তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী।

মেমসাহেব আমার বুকের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। একটু পরে গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

ঠাট্টা হঠাতে একটু মেঘে ঢাকা পড়ল। আর সেই অঙ্ককারের সুযোগে আমি—।

মেমসাহেব সঙ্গে সঙ্গে দাবড় দিয়ে বলল, আবার অসভ্যতা!

হেস্টিংস থেকে এগিয়ে এসে আউট্রোম ঘাটের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা আবার মিশে গেলাম নগর কলকাতার জনসমূহে।

কিন্তু জান দোলাবৌদি, সে রাত্রে আনন্দে আর আস্তৃপ্তিতে ঘুম্তে পারিনি। তোমার জীবনেও তো এমনি দিন এসেছিল। এবার কলকাতা গেলে সেদিনের কাহিনী না শোনালে তোমার মৃগ্নি নেই।

ତୁମি ତୋ ଜୀବନେର ଏକ ଏକଟା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିତେ ମାନୁଷେରେ ଏକ ଏକଟା ରୂପ, ଚରିତ ଦେଖା ଦେଯ । ସେ ଛେଲେମେହେରା ରାତ ନ'ଟାର ପର ସୁମେ ଚୁଲ୍ଲତେ ଥାକେ, ପରୀକ୍ଷାର ଆଗେ ତାରାଇ ନିର୍ବିବାଦ ରାତ ଦେଡ଼ଟା-ହୁଟୋ ଅବଧି ପଡ଼ାଣୁମା କରେ । ବିଯେର ଆଗେ ସେ ମେହେରା ରାତ ଜାଗତେ ପାରେ ନା, ଶୁନେଛି ବିଯେର ପର ତାରା ନାକି ସୁମୁତେଇ ଚାଯ ନା । ତାଇ ନା ? କେନ ସନ୍ତାନେର ମା ହବାର ପର ? ସୁମିଯେ ସୁମିଯେଓ ମାଯେର ଦଳ ଜେଗେ ଥାକେନ । ଦେହଟା ସୁମେର କୋଲେ ଲୁଟିଯେ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ମନ ? ଅତିଶ୍ୱ ପ୍ରହରୀର ମତ ସାରା ରାତ ସେ ସନ୍ତାନକେ ପାହାରା ଦେଯ । ସାମାନ୍ୟ କଟି ମାସେର ବ୍ୟବଧାନେ କିଭାବେ ଏକଟା ପ୍ରମତ୍ତା କୁମାରୀ ଶାନ୍ତ, ମିଳନ କଲ୍ୟାଣୀ ଜନନୀ ହୟ ମେ କଥା ଭାବଲେଓ ଆଶ୍ରଯ ଲାଗେ ।

ମାନୁଷେର ଚରିତ୍ରେ ଆରୋ କତ ବିଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୟ । ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ଫିରିଷ୍ଟ ଦିତେ ଗେଲେ ମାନ୍ୟ-ମନ୍ୟତାର ଏକଟା ଛୋଟଖାଟୋ ଇତିହାସ ଲିଖିତେ ହବେ । ତାହାଡ଼ା ମହୃଷ୍ୟ-ଚରିତ୍ରେ ଏସବ ମାମୁଲି କଥା ତୋମାକେ ଲେଖାର କୋନ ପ୍ରୟୋଜନଓ ନେଇ । ସେଦିନ ଗଞ୍ଜାର ଧାରେ ମେମ୍ସାହେବେର କଥା ଶୁନେ ଆର ଚୋଥେର ଜଳ ଦେଖେ ଆମାରଓ ଏକ ଆଶ୍ରଯ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଲୋ । ସର-କୁନୋ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦ ବାଡ଼ାଲୀର ଛେଲେ ହୟେ କଳକାତାର ଏଇ ଗଣ୍ଡିବନ୍ଦ ଜୀବନେର ମଧ୍ୟେ ବେଶ ଛିଲାମ । ମେମ୍ସାହେବେର ପ୍ରେମେର ନେଶ୍ୟାଯ ନିଜେର କର୍ମଜୀବନ ସମ୍ପର୍କେ ବେଶ ଉଦ୍‌ଦୀନ ହୟେ ପଡ଼େଛିଲାମ ।

ସେଦିନ ଅକ୍ଷ୍ୟାଂ ମେମ୍ସାହେବେର ଭାଲବାସାର ଚାବୁକ ଖେୟେ ଆମି ଚିନ୍ତିତ ନା ହୟେ ପାରିଲାମ ନା । ଧୂତି-ପାଞ୍ଚାବି ଆର କୋଳାପୁରୀ ଚଟି ପରେ ଜାମାଇ ସେଜେ ମେମ୍ସାହେବେର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ କରଲେଇ ସେ ଜୀବନେର ସବ କିଛୁ ପ୍ରୟୋଜନ ମିଟିବେ ନା, ମିଟିତେ ପାରେ ନା ସେ କଥା ବୋଧ ହୟ

সেদিনই প্রথম উপলক্ষি করলাম। তাছাড়া আর একটা উপলক্ষি হলো আমার। মেমসাহেব আমাকে ভালবাসে, আমাকে প্রাণমন দিয়ে কামনা করে। সে জানে একদিন আমারই হাতে তার সিঁথিতে সীমস্তিনী সিঁহুর উঠবে, আমার দীর্ঘায় কামনায় হাতে শৰ্ক্ষা পরবে; সে জানত আরো অনেক কিছু। জানত, সে একদিন আমার সন্তানের জননী হয়ে সগর্বে পৃথিবীর সামনে দাঢ়াবে।

সারা ছনিয়ার সমস্ত মেয়ের মত সেও ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল তার স্বামীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু যৌবনের কালবৈশাখীর ধূলি বড়ে মেমসাহেবের স্বচ্ছ দৃষ্টি হারিয়ে যায় নি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবের মাটি ছেড়ে আরব্য উপগ্রামের অলীক অরণ্যে পালিয়ে যায় নি। তাইতো সে চেয়েছিল তার ভালবাসায় আমার জীবন ভরে উর্ধুক। সে চায় নি পৃথিবীর অসংখ্য কোটি কোটি স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘ তালিকায় শুধুমাত্র আর দুটি নামের সংযোজন।

তাইতো সেদিন ফেরার পথে মেমসাহেব আমাকে অন্যমনস্ক দেখে ডাকল, শোন।

আমি নিরুত্তর রইলাম। মেমসাহেব আমার পাশে এসে হাতটা ধরে ডাকল, শোন।

‘বল।’

‘রাগ করেছ?'

‘রাগ করব কেন?’

‘আমাকে ছেড়ে তোমাকে বাইরে যেতে বললাম বলে।’

‘না, না।’

আমরা ছজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম।

মেমসাহেব আবার শুরু করে, ‘আমার সর্বস্ব কিছু দিয়েও যদি তোমার সত্যকার কল্যাণ করতে না পারি, তাহলে আমি কি করলাম বল।’

একটু থামে। আবার বলে, তুমি শুধু আমার স্বামী হবে,

শুধু আমিই তোমাকে মর্যাদা দেব, ভালবাসব, তা আমি চাই না।  
আমি চাই তুমি আমাদের হজনের গণির বাইরেও অসংখ্য মাঝবের  
ভালবাসা পাও, তাদের স্নেহ-ভালবাসা পাও, তাদের আশীর্বাদ  
পাও।

আমার একটু ধামে, একটু হাসে। তারপর ফিস ফিস করে  
বলে, কত মেয়ে তোমাকে চাইবে অথচ শুধু আমি ছাড়। আর কেউ  
তোমাকে পাবে না।

হাত দিয়ে আমার মুখটা ঘূরিয়ে জিজাসা করল, ভাবতে পার,  
তখন আমার কি গর্ব, কি আনন্দ, কি আঘৃতপ্তি হবে ?

কি উন্নত দেব ? আমি শুধু হাসি।

বাসায় ফিরে অনেক রাত অবধি অনেক কিছু ভাবলাম। পরের  
ক'টা দিন নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে নিজেও কিছু টাকা ঘোগাড়  
করলাম। বাইরের খবরের কাগজ সম্পর্কে কিছু কিছু খবরও  
জেনে নিলাম।

তারপর একদিন সত্যিই আমি মাজ্জাজ মেলে চড়লাম।  
মেমসাহেবের আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিল। বলল, আমার মনে  
হয় তোমার নিশ্চয়ই কিছু হবে। তবে না হলেও ঘাবড়ে যেও না।  
সারা দেশে তো কৰ কাগজ নেই! আরো দু-চার জায়গায়  
ঘোরাঘুরি করলে কোথাও না কোথাও চাল পাবেই।

আমি নিরুন্নত রইলাম। সামনের লাল আলো, সবুজ হলো,  
গার্জ সাহেবের বাঁশি বেজে উঠল।

মেমসাহেব বলল, সাবধানে থেকো। যেখানে সেখানে যা তা  
থেও না।...চিঠি দিও।

আমি মুখে কিছু বললাম না। শুধু মেমসাহেবের মাথায় হাত  
দিয়ে আশীর্বাদ করলাম।

মাজ্জাজ মেলের কামরায় বলে হঠাত পুরানো দিনের কথা মনে  
হলো।...

ରବିବାର ସକାଳ । ଆଟଟା କି ସାଡ଼େ ଆଟଟା ବାଜେ । ସୁମ ଡେଙ୍ଗେ ଗେଲେଓ ତଞ୍ଚାଛନ୍ତ ହୟେ ତଥନୋ ଚାଦର ମୁଢ଼ି ଦିଯେ ଶୁଯେଛିଲାମ । ଆମାଦେର ସିନିୟର ସାବ-ଏଡ଼ିଟର ଶିବୁଦା ଏସେ ହାଜିର । ସରେ ଚୁକେଇ ନିବିବାଦେ ଚାଦରଟା ଟାନ ମେରେ ବଲଲେନ, ଛି, ଛି, ଏଥନେ ଘୁମୁଛିସ ?

ଆମି ବଲଲାମ, ନା, ନା, ସୁମୁଛି କୋଥାଯ । ଏମନି ଶୁଯେ ଆଛି ।

ଶିବୁଦା ଉପଦେଶ ଦେନ, ଏତ ବେଳା ଅବଧି ସୁମୋଲେ କି ଜୀବନେ କିଛୁ କରା ଯାଇ ।

ତବେ ରେ ! ଆମି ପ୍ରାୟ ଲାକ ଦିଯେ ଉଠେ ପଡ଼ି । ବଲି, ଆଚାଶ ଶିବୁଦା, କର୍ପୋରେଶନେର ସେବ କର୍ମଚାରୀରା ଶେଷ ରାତିତେ ଉଠେ ଗ୍ୟାସ-ପୋସ୍ଟେର ଆମୋ ନିବିଯେ ବେଡ଼ାଯ ଆର ରାତ୍ରାଯ ଜଳ ଦେଇ, ତାଦେର ତବିଷ୍ୟତ କି ଥୁବ ଉଜ୍ଜଳ ?

ଶିବୁଦା ଦାବଡ଼ ଦେଇ, ତୁଇ ବଡ଼ ବାଜେ ବକିସ । ଏହି ଜଣାଇ ତୋର କିଛୁ ହଛେ ନା ।

‘ଏକଟୁ ଆଗେ ବଲଲେ, ବେଳା କରେ ସୁମୁବାର ଜନ୍ମ, ଏଥନ ବଲଛ ବେଶୀ କଥା ବେଳାର ଜନ୍ମ ଆମାର କିଛୁ...’

‘ଆଃ ତୁଇ ଥାମବି ନା ଶୁଧୁ ଶୁଧୁ ତର୍କ କରବି ?’

ଉଠେ ପଡ଼ିଲାମ । କିଛୁକ୍ଷଣେ ମଧ୍ୟେ ତୈରି ହୟେ ଖୋକାର ଦୋକାନ ଥେକେ ଛ'କାପ ଚା ନିଯେ ଶିବୁଦାର ସମ୍ମୁଖ ହାଜିର ହଲାମ । ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, ତାରପର ଶିବୁଦା, କି ବ୍ୟାପାର ? ହଠାତ ଏହି ସାତ-ସକାଳେ ?

ଶିବୁଦା ନୀଳ ଶୁତୋର ଲଞ୍ଚା ବିଡ଼ିଟାଯ ଏକଟା ଟାନ ମେରେ ସାରା ସରଟା ଦୁର୍ଗଙ୍କେ ଭରିଯେ ଦିଲ । ବଲଲ, ଚଲ, ‘ଏକଟା ଇନ୍ଟାରେସିଂ ଲୋକେର କାହେ ସାବ ।’

‘କାର କାହେ ?’

‘ଆଗେ ଚଲ ନା, ତାରପର ଦେଖବି ।’

ଶିବୁଦାର ସଙ୍ଗେ ତର୍କ କରା ବୁଝା । ଶୁତରାଂ ଅଯଥା ସମୟ ନାହିଁ ନା କରେ । ଶିବୁଦାର ଅମୁସରଣ କରିଲାମ । ଟ୍ରୌମ-ବାସେ ଉଠିଲାମ, ନାମଲାମ । କବାର ମନେ ନେଇ, ତବେ ହୁ-ତିନିବାର ତୋ ହବେଇ । ତାରଙ୍ଗ ପରେ ପଦବ୍ରଜେ

অলি-গলি দিয়ে বেশ খানিকটা। আর একটু এগিয়ে গেলে নিশ্চয়ই মহাপ্রস্থানের পথ পেতাম কিন্তু সেই শুভূতে শিবুদা বলল, দাঢ়া, দাঢ়া, আর এগিয়ে যাস না।

একটা ভাঙা পোড়োবাড়ির মধ্যে ঢুকেই শিবুদা হাঁক দিল, মধুদা!

উপরের বারান্দা থেকে একটা ছোট মেয়ে জবাব দিল, শিবু-কাকু! বাবা উপরে।

আমরা সোজা তিনতলার চিলেকেঠায় উঠে গেলাম। মধুদাকে দেখেই বুঝলাম, তিনি জ্যোতিষী কিন্তু পেশায় ঠিক সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

মধুদার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন শিবুদা।

মধুদা কাগজপত্র সরাতে সরাতে বললেন, এর মধ্যেই একটু কষ্ট করে বস্তুন ভাই।

বসলাম। শিবুদা-মধুদা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে শনি-মঙ্গল-বাহু-কেতু নিয়ে এমন আলোচনা করলেন যে, আমি তার এক বর্ণও বুঝলাম না।

ঘণ্টাখানেক পরে শিবুদার অনুরোধে মধুদা আমার জন্ম সন-তারিখ ইত্যাদি ইত্যাদি জেনে নিয়ে চটপট একটা ছক তৈরি করে ফেললেন। একটু ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, বেশ ভাল।

শিবুদা প্রশ্ন করেন, ভাল মানে?

মধুদা মনে মনে হিসাব-নিকাশ করতে করতেই জবাব দেন, ভাল মানে ভাল; তবে বেশ কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।

নাকে একটু নশ্চ দিয়ে কর গুনতে গুনতে বলেন, তাছাড়া একটু বিলম্বে উন্নতির ঘোগ।

শিবুদা ছকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলেন, হ্যাগো মধুদা, এর যে ত্রিকোণে মঙ্গল।

‘তবে নবমে নয়, পঞ্চমে । তবুও বেশ ভাল ফল দেবে ।’

মধুদা সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন । আজ সবকিছু মনে নেই । তবে ভুলিনি একটি কথা । বলেছিলেন, শুরু স্থানটি বড় ভাল । কোন মহিলার সহায়তায় জীবনে উন্নতি হবে ।

সেদিন কথাটি বিশ্বাস করিনি কিন্তু আজ মাদ্রাজ মেলের কামরায় বসে কথাটা মনে না করে পারলাম না । আগে কোন-দিন কলনা করতে পারিনি আমার জীবনের ঝঞ্চ প্রান্তর মেমসাহেবের শ্রোতৃস্থিনী ধারায় থগ্ন হবে । নাটক-নতুলে এসব সম্ভব হতে পারে কিন্তু আমার জীবনে ? নৈব নৈব চ ।

মাদ্রাজ মেলের কামরায় বসে মনে হলো মেমসাহেবের ষপ্প, সাধনা, ভালবাসা নিশ্চয়ই একেবারে ব্যর্থ হতে পারে না । সত্যি আমার মাদ্রাজ যাওয়া ব্যর্থ হলো না । সাদার্ন একস্প্রেসের এডিটর বললেন, কাগজে স্পেসের বড় অভাব । কলকাতার স্পেশ্বাল স্টোরি ছাড়া কিছু ছাপার স্পেস পাওয়াই মুক্ষিল । তাইতো কলকাতায় ঠিক ফুলটাইম লোকের দরকার নেই ।

আমি মনে মনে দশ হাত তুলে ভগবানকে শতকোটি প্রণাম জানালাম । মাসে মাসে দেড়শ' টাকা । আনন্দে প্রায় আঘাতার হয়ে পড়লাম । দৌড়ে মাউন্ট রোড টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে মেমসাহেবকে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করলাম, মিশন সাকসেসফুল রিমেম্বারিং ইউ স্টপ স্টার্ট টং টুমরো মাদ্রাজ-মেল ।

হাওড়া স্টেশনে মেমসাহেব আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আর বেশী আড়া দেবে না । মন দিয়ে কাজ করবে ।

‘নিশ্চয়ই, তবে—’

বাঁকা চোখে মেমসাহেব বলে, তবে মানে ?

‘সাত দিন পরে কলকাতা ফিরেই কাজ শুরু করবো ?’

‘তবে কি করবে ?’

‘একটা দিন অন্তত তোমাকে...’

মেমসাহেব হাসতে হাসতে বলে, এতক্ষণে অরিন্দম কহিল।...

গুরু আমার নয়, মেমসাহেবেরও তো ইচ্ছা করে আমার কাছে আসতে, প্রাণভরে আমাকে আদর করতে। তাছাড়া এই কদিনের অদর্শনের জন্য তার মনের মধ্যে অনেক ভাব, ভাষা পূঁজীভূত হয়ে উঠেছিল। কলকাতার এই জেলখানার বাইরে একটু মুক্ত আকাশের তলায় আমাকে নিবিড় করে কাছে পাবার জন্য ওর মনটাও আনচান করছিল। ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল আমার নতুন জীবনের দ্বারদেশে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। তাইতো আমার কাছ থেকে একটু ইঙ্গিত পেয়েই বিনা প্রতিবাদে প্রস্তাবটি মেনে নিল।

‘জানি তোমার মাথায় যখন একবার ভূত চেপেছে তখন কিছুতেই ছাড়বার পাত্র তুমি নও’, মেমসাহেব মন্তব্য করে।

‘তাই বুঝি,’ আমি বলি। ‘তোমার যেন কোন কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কোন কিছু নেই।’

একটি দিনের জন্য আমরা ছজনে আবার হারিয়ে গেলাম। কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের কেউ জানল না গঙ্গা যেখানে সাগরের দিকে উদ্ধামবেগে ছুটে চলেছে, যেখানে সমস্ত সীমা অসীম হয়ে গেছে, বন্ধন যেখানে মৃত্তি পেয়েছে, সেই কাক্ষীপের অস্তবিহীন মহাশূন্যে আমাদের ছুটি প্রাণবিন্দু বিলীন হয়ে গেল।

মেমসাহেব আমার বুকের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে বলল, আমি জানি তুমি এমনি করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে।

‘তুমি জান?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেমন করে জানলে?’

‘খবরের কাগজ বলতে তুমি যে পাগল সে কথাটা কি আমি জানি না?’ তারপর বেশ গর্ব করে মেমসাহেব বলল, খবরের কাগজকে না তালবাসলে এমন পাগল কেউ হতে পারে না।

‘তাতে কি হলো?’

‘কিছু হয় নি’, মেমসাহেব বোধ করি আর আমার প্রশংসা করা।  
সমীচীন মনে করে না।

একটা দমকা বড়ো হাঙ্গয়া এলো। সামনের সম্ভৃতুর্থী ভাগীরথীর  
অনন্ত জলরাশি ফুলে ফুলে নাচানাচি শুরু করে। ভাগীরথী যেন  
আরো তেজে, আরো আনন্দে সমুদ্রের দিকে দৌড়াতে লাগল।

মেমসাহেব উঠে বসে বলে, এই শান্ত গঙ্গা হিমালয়ের কোল  
থেকে প্রায় হাজার দেড়েক মাইল চলবার পর সমুদ্রের কাছাকাছি  
এসে কত বিরাট, কত বেশী প্রাণচক্ষু। মাঝুষও ঠিক এমনি।  
সঙ্কীর্ণ গশি থেকে বৃহত্তর জীবনের কাছে এলে মাঝুষ অনেক উদার,  
অনেক প্রাণচক্ষু হয়। তাই না?

আমি চুপ করে থাকি। কোন কথা না বলে মেমসাহেবের  
উদার গভীর চোখ ছুটোকে দেখি।

মেমসাহেব খোপাটা খুলে আমার কাঁধের ওপর মার্ধাটা রেখে  
দেয়। সামনে বুকের পর দিয়ে তার দীর্ঘ অবিগৃহ্য বিমুনি লুটিয়ে  
পড়ে নীচে।

আমি বলি, আচ্ছা মেমসাহেব, তুমি তো আমার উন্নতির জন্য  
এত ভাবছ, এত করছ কিন্তু আমি তো তোমার জন্য কিছু করছি  
না।

‘আমার জন্য আবার কি করবে? আমার জন্যই তো তুমি  
তোমাকে তৈরি করছ! ’

‘কিন্তু তবুও—’

‘এতে কোন কিন্তু নেই। হাজার হোক আমি মধ্যবিত্ত  
বাঙালীঘরের মেয়ে। যতই লেখাপড়া শিখি না কেন, স্বামী-পুত্র  
নিয়েই তো আমার ভবিষ্যৎ। ’

মেমসাহেব থামে। দৃষ্টিটা তার চলে যায় দিগন্তের অন্তিম  
সীমানায়। মনটাও বোধহয় হারিয়ে যায় তবিষ্যতের অজ্ঞান। পথে।  
আমি বেশ বুঝতে পারি বর্তমান নিয়ে মেমসাহেব একটুও চিন্তা করে

না। তার সব চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা আগামী দিনগুলিকে নিয়ে।...সে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন? না, না, স্বপ্ন কেন হবে? সে ছির ধারণা করে নিয়েছে চাকরি-বাকরি ছেড়েছড়ে দিয়ে সে মনপ্রাণ দিয়ে শুধু সংসার করবে, আমাকে স্বীকৃত করবে, আমার কাজে সাহায্য করবে। তারপর? তারপর, সে মা হবে।

ইদানীংকালে মেমসাহেবে একবার নয়, বহুবার স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করার কথা বলল। ওর ছেলে কি করবে, মেয়ে কেমন হবে, সে-কথাও বলেছে বেশ কয়েকবার। শুনতে ভালই লাগে। প্রথমে সারা মন আনন্দে, আত্মতপ্তিতে ভরে যায়, কিন্তু একটু পরে কেমন যেন খটকা লাগে। হাজার হোক মাঝুষের জীবন তো! কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়, কে বলতে পারে? আমি বাস্তবের মুখেয়ুর্ধি হয়েছি, দেখেছি অনেক মানুষ অনেক রকম স্বপ্ন দেখে কিন্তু ক'জনের জীবনে সে স্বপ্ন সার্থক হয়? তাইতো মেমসাহেবকে বুকের মধ্যে পেয়ে আনন্দ পাই কিন্তু তার ত্বিষ্ণু জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনলে আমার বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে।

সেদিন সমুদ্রগামী চঞ্চলা আত্মহারা ভাগীরথীর পাড়ে বসে মেমসাহেবের কাছে আবার স্বামী-পুত্র নিয়ে স্বুখের সংসার করার কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে ওর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললাম, তুমি কি জান তুমি স্বামী-পুত্র নিয়ে স্বুখী হবেই?

ঝি লম্বা জ্ব ছটো টান করে চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, নিশ্চয়ই।

‘নিশ্চয়ই?’

মেমসাহেবের ঠোঁটের কোণায় একটু বিজ্ঞপের হাসি দেখা দেয়। বলে, কেন, তুমি কি আর কাউকে নিয়ে স্বুখী হবার কথা ভাবছ?

‘মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে কিন্তু তুমি কি ঘাড় থেকে নামবে?’

‘আমি তোমার ঘাড়ে চেপেছি, না তুমি আমার ঘাড়ে চেপেছ ?’  
একটু থামে, আবার বলে, ‘আর কেউ এসে দেখুক না ! মজা দেখিয়ে  
দেব ।’

‘তাই বুঝি ?’

‘তবে কি ? তোমাকে পূজা করব ?’

‘আগেকার দিনে পতিত্রতা শ্রীরা স্বামীকে স্বর্ণী করার জন্য বহু-  
বিবাহে কোন দিন আপত্তি করতেন না, তা জান ?’

‘শুধু আগেকার দিনের কথা কেন বলছ ? আরও একটু এগিয়ে  
প্রাগৈতিহাসিক দিনে, যখন জঙ্গলে বাস করতে তখন তো তোমরা  
পুরুষেরা আরো অনেক কাণ্ড করতে । সুতরাং এখনও তাই কর  
না !’

একটু ঠাণ্ডা মিঠে হাওয়া বয়ে যায় । মেমসাহেব এক মৃহূর্তে  
বদলে যায় । ছ’হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে বলে, আমি জানি  
তুমি আর কাউকে কোনদিন ভালবাসতে পারবে না ।

‘জান ?’

‘একশ’বার, হাজার বার জানি ।’

‘কেমন করে জানলে ?’

‘সে তুমি বুঝবে না ।’

‘বুঝব না ?’ .

‘তুমি যদি মেয়ে হতে তাহলে বুঝতে ।’

‘তার মানে ?’

‘সন্তানের মনের কথা যেমন আমরা বুঝতে পারি, তেমনি  
স্বামীদের মনের কথাও আমরা জানতে পারি ।’

দোলাবৌদি তুমি তো মেয়ে । তাই বুঝবে কত গভীরভাবে  
সারা অন্তর দিয়ে ভালবাসলে এসব কথা বলা যায় ।

সান্দার্ন একস্প্রেসের কাজ শুরু করে দিলাম বেশ মন দিয়ে ।  
মাঝে মাঝে মন চাইত ফাঁকি দিই, মেমসাহেবকে নিয়ে আড়া দিই,

সুর্তি করি কিন্তু পারতাম না। ওকে ঠকাতে বড় কষ্ট হতো। যার সমস্ত জীবন-সাধনা আমাকে কেন্দ্র করে, যে আমার মঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিজের কল্যাণ দেখতে পায়, তাকে মুহূর্তের জন্যও বঞ্চনা করতে আমার সাহস বা সামর্থ্য হয় নি।

বড়ের বেগে বা হলোও আমি বেশ নির্দিষ্টভাবে এগিয়ে চলেছিলাম। মেমসাহেবকে বুকের মধ্যে পেয়ে আমি আমার জীবন-নদীর মোহনার কলরব শুনতে পেতাম।

মাস কয়েক পরে আমি আবার বাইরে বেরুলাম। এবার সঙ্গে কিছুকাল আগে ত্রনিকেলের এডিটরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং সে পরিচয়ের সূত্র খরেই তার কাছে হাজির হলাম। বললেন, কলকাতার করসপণ্ডেটের দরকার নেই তবে সপ্তাহে একটা করে ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ লেটার ছাপতে পারি।

এডিটর মিঃ শ্রীবাস্তব খোলাখুলিভাবে জানালেন, বাট আই কান্ট পে ইউ মোর ঢান ওয়ান হানডেড।

আমি বললাম, ঢাটস অল রাইট। লেট আস মেক এ বিগিনিং।

আমার জীবনে এই পরম দিনগুলিতে মেমসাহেবকে স্মরণ না করে পারিনি। তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে যেত। আকাশে কালো মেঘ দেখা দিলেই বৃষ্টিপাত হয় না। সে কালো মেঘে জলীয়বাস্প থাকা প্রয়োজন। একটি ছেলের জীবনে একটি মেয়ের উদয় নতুন কিছু নয়। আমার জীবনেও হয়ত আরো কেউ আসত কিন্তু আমি স্থির জানি পৃথিবীর অন্য কোন মেয়েকে দিয়ে আমার কর্মজীবনের অচলায়নকে বদলান সম্ভব হতো না।

তাছাড়া মেয়েরা একটু আদর পেতে চায়, তালবাসা পেতে চায়। একটু সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, একটু বৈশিষ্ট্য প্রায় সব মেয়েরাই কামনা করে। সেই সুখ, সেই স্বাচ্ছন্দ্য পাবার জন্য অপ্রয়োজন হলে কোন মেয়ে আস্ত্রভ্যাগ করবে? খুব সহজ সরল চিরাচরিত প্রথাৱ

মেমসাহেবের জীবনে এসব কিছুই আসতে পারত কিন্তু সে তা চায় নি। সে চেয়েছিল, নিজের প্রেম-ভালবাসা, দরদ-মাধুর্য-অহুপ্রেরণা দিয়ে নিম্নবিষ্ট বাঙালীঘরের একটি পরাজিত যোদ্ধাকে আবার নতুন উদ্বীগনায় আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে তুলতে।

আমি জানতাম, আমার কর্মজীবনের এই সাময়িক সাফল্যের কোন স্থায়ী মূল্য নেই, নেই কোন ভবিষ্যৎ। কিন্তু তা হোক। এইসব ছোটখাটো অস্থায়ী সাফল্যের দ্বারা আমার হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস আমি ফিরে পেলাম। নিজের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে একটু আস্থা এলো আমার মনে।

সর্বোপরি এ কথা আমি উপলব্ধি করলাম যে, শুধু কলকাতাকে কেন্দ্র না করেও আমার ভবিষ্যৎ সাংবাদিক জীবন এগিয়ে যেতে পারবে। বরং একবার মাতৃনাম স্মরণ করে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ রঞ্জমঞ্চে বেরিয়ে পড়লে ফল আরো ভাল হবে।

তুমি বেশ বুঝতে পারছ আমি কেন ও কার জন্য একদিন অক্ষাৎ কলকাতা ত্যাগ করে দিল্লী চলে এলাম। আজ আমার জীবন কত ব্যস্ত, কত বিস্তৃত। সাংবাদিক হয়েও সেই উভয়ের দার্জিলিং, পূর্বে গোহাটি, দক্ষিণে গঙ্গাসাগর ও পশ্চিমে চিত্তরঞ্জন-সিঙ্গুর মধ্যে আজ আমি বন্দী নই। বাংলাদেশকে আমি ভালবাসি। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে আপনজন মনে করি কিন্তু সমস্যা-সঙ্কল ও নিত্য নতুন চিন্তায় জর্জরিত হয়ে বাঁচবার কথা ভাবতে গেলে তয় হয়। যদি আনন্দ করে বাঁচতে না পারলাম, যদি এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-মাধুর্য উপভোগ করতে না পারলাম, তবে শুধু পিতৃপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত মিউজিয়ামে জীবন কাটাবার মধ্যে মানসিক শাস্তি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু স্বত্ত্ব নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না।

আজ যত সহজে এসব কথা লিখছি ব্যাপারটি তত সহজ নয়। যে পরিবারে জন্মেছি, যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি, কর্মজীবন শুরু

করেছিল সেখানকার সবকিছু সীমিত ছিল। আজ জীবিকার তাগিদে বহুজনকে বহুদিকে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে, কিন্তু সেদিন জীবিকার অস্য, জীবনধারণের অস্য আমার পক্ষে সোনার বাংলা ভ্যাগ করা অত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন হাসিমুখেই হাওড়া স্টেশনে দিল্লী মেলে চড়েছিলাম।

### এগারো

তুমিও জান, আমিও জানি, সবাই জানে মানুষের জীবনের গতিপথ ও গতিবেগের পরিবর্তন হয় মাঝে মাঝেই। আমার জীবনেও হয়েছে, হয়ত বা ভবিষ্যতেও হবে। আমার জীবনে মেমসাহেবের উদয় হবার আগে আমার জীবন এমন বিশ্রী ঢিমেতালে চলছিল যে, তা উল্লেখ করারই প্রয়োজন নেই। মেমসাহেবকে পাঁচার পর বেশ কিছুকাল এমন একটা অস্তুত নেশায় মশগুল ছিলাম যে, নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ধামাবার অবকাশ বা প্রয়োজন বোধ করিনি।

কিন্তু তারপর মনের আকাশ থেকে অনশ্চিয়তার মেঘ কেটে যাবার পর আমার জীবনে এক আশ্চর্য জোয়ার এলো। প্রথম প্রথম মৃহূর্তের অদর্শন অসহ, অসন্তুষ্ট মনে হতো। মনে হতো বুঝিবা হারিয়ে গেল, বুঝিবা কিছু ঘটে গেল। আমার মত মেমসাহেবের মনেও এমনি অনেক অজ্ঞান আশঙ্কা আসত। পরে ছ'জনে যখন ছ'জনকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে পেলাম এবং সে পাওয়ার আনন্দে যখন সমস্ত মনটা মদির হয়ে গেল, তখন আস্তে আস্তে আজে-বাজে ছশ্চিক্ষা বিদ্যায় নিল।

মেমসাহেবের ঐ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে না পেলে, মেমসাহেবের বুকে কান পেতে ঐ পরিচিত স্পন্দন না শুনলে প্রথম

প্রথম মনে মনে বড়ই অস্তিত্ব পেতাম। পরিচয়ের গতি পেরিয়ে  
ভালবাসার সেই প্রথম অধ্যায়ে মনটা বড়ই সংকীর্ণ হয়েছিল। শুধু  
মেমসাহেবকে কাছে পাওয়া ছাড়া যেন আর কোন চিন্তাই মনের মধ্যে  
স্থান পেত না। বিশ্ব-সংসারের আনন্দমেলায় আমাদের ছ'জনকে  
ছাড়া আর কাউকে কল্পনা করতে পারতাম না। ছনিয়ার আর  
সবাইকে কেমন যেন ফালতু অগ্রয়োজনীয় মনে হতো। জীবনের  
শুধু একটি দিক, একটি অঙ্ককেই সমগ্র জীবন ভেবেছিলাম। ধীরে  
ধীরে আমরা যত আপন হলাম, সঙ্গে সঙ্গে এইসব তুল ধারণা ও  
বিদায় নিল। তাছাড়া মেমসাহেবের ভালবাসা ক্রমে ক্রমে আমার  
সমগ্র জীবনকে, জীবনসত্ত্বকে আলিঙ্গন করল। শুধু আমার  
ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত প্রিয়সঙ্গিনী নয়, শুধু ঘোবনের  
আনন্দমেলার পার্থবত্তিনী নয়, মেমসাহেব আমার সামগ্রিক জীবনের  
অংশীদার হলো।

তুমি তো জান আমাদের পূর্বপুরুষরা শুধু জানতেন ‘পুত্রার্থে  
ক্রিয়তে ভার্যা’। আমাদের দেব-দেবীদের ইতিহাস পড়লে এক-  
একজনের শত শত সহস্র সহস্র সন্তানের জননী হবার কাহিনী জানা  
যায়। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র বা শত সন্তানের  
জননী হওয়ার কাহিনী অতীতের ইতিহাসের পাতায় বন্দী হয়েছে।  
কিন্তু তবুও স্বামীর শয্যা আর রান্নাঘরের মধ্যেই আমাদের  
নিরানবুই তাগ নারীর জীবন সীমিত।

এই ত ইদানীংকালে কত ছেলেমেয়েকে ভালবাসতে দেখলাম,  
দেখলাম স্বপ্ন দেখতে। ভালবাসা পেয়ে অনেক মাঝুষের জীবনধারাই  
পাল্টে যায় সত্য কিন্তু আমার মেমসাহেব আমাকে শুধু পাল্টে  
দেয় নি, সে আমাকে নতুন জীবন দিল। আমাকে ভালবেসে সে  
অঙ্ক হয় নি। রাত্রির অঙ্ককারে আমার তপ্ত শয্যায় পলাতকার মত  
সে আশ্রয় চায় নি, চেয়েছিল আমার সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি  
অধ্যায়ে কিছু-না-কিছু ভূমিকা গ্রহণ করতে।

পুরুষের জীবনে কর্মজীবনের চাইতে বড় কিছু আর হতে পারে না। কর্মজীবনে ব্যর্থতা, কর্মক্ষেত্রে পরাজয়, পুরুষের মৃত্যু সমান। কর্মজীবনে ব্যর্থ, পরাজিত, অপদষ্ট পুরুষের জীবনে নারীর ভালবাসার কি মূল্য? কোথায় স্বীকৃতি? মেমসাহেব এই চরম বাস্তব সত্য উপলব্ধি করেছিল। আমি কিন্তু প্রেমের ঘোরে মশগুল ছিলাম। অত শত ভাবনা-চিন্তা আমার ছিল না। মাত্রাজ থেকে শুরে এসে নতুন কাজ বেশ মন দিয়ে করছি, কিছু টাকা-পয়সারও আমদানি হচ্ছে। আমার মনটা খুশীতে ভরে গেল। তাছাড়া কলকাতায় কক্ষে না পেলেও স্বদূর মাত্রাজের একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় কাজ পাবার জন্য সরকারী ও সাংবাদিক মহলে আমার কিছুটা মর্যাদা বেড়ে গেল। মনে মনে বোধহয় আমি একটু অহঙ্কারীও হলাম। আবার একদিন মেমসাহেব আমার চৈতন্যে ক্ষণাঘাত করল, এবার আর কিছু ভাবছ?

‘তোমার কথা—না, আমার কথা?’

মেমসাহেব চীৎকার করে ওঠে, আঃ! বাজে বকো না।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। ‘তুমি রাগছ কেন?’

মেমসাহেব ছুই হাঁটুর ওপর মুখখানা রেখে কি যেন ভাবছিল। আমার প্রশ্ন শোনা মাত্রই রাগ করে মুখটা অন্তিমকে ঘুরিয়ে নিল।

আমি ডাক দিলাম, মেমসাহেব।

জবাব এলো না।

আবার ডাকলাম, মেমসাহেব শোন না!

তবুও কোন জবাব এলো না। একটু চিন্তিত হলাম। একটু কাছে এগিয়ে গেলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, রাগ করছ কেন?

উক্তির এলো, একটু সরে বস। এটা তোমার নিজের ফ্ল্যাটের ড্রইংরুম নয়, কলকাতার ময়দান!

বুঝলাম আবহাওয়া খারাপ। ফোর্সল্যাণ্ড করলে আমাক

ମେନଟାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରହ ହବେ, କୋନ ମଞ୍ଜଳ ହବେ ନା । ତାଇ ଆବହାଓୟାର୍  
ଉପରି ଆଶାୟ ଆମି ଉପରେ ସୁରପାକ ଖେତେ ଲାଗଲାମ ।

ବେଶ କିଛୁକ୍ଷଣ ପରେ ମେମସାହେବ ବଲଲ, ନିଜେର ଭବିଷ୍ୟৎ ସମ୍ପକ୍ତେ  
କୋନ ମାନ୍ୟ ଯେ ଏତ ନିର୍ବିକାର ହତେ ପାରେ, ତା ତୋମାକେ ଦେଖାର  
ଆଗେ କଲନା କରତେ ପାରିନି ।

‘ହଠାତ୍ ଏ-କଥା ବଲଛ ?’

‘ସେ-କଥା ବୁଝଲେ କି ଆମାର କପାଳେ କୋନ ଦୁଃଖ ଥାକତ !’

‘ଆଜ ତୋମାର ମୂଡ-ଟା ଖାରାପ !’

‘ହଁବୀ !’ ଏବାର ଆମାର ଦିକେ ଘାଡ଼ ବେଁକିଯେ ବଲେ, ବଲବ, କେନ ?

‘ବଲ ନା ?’

‘ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ବଲବ ?’

‘ନିଶ୍ଚଯିଷ୍ଟ !’

‘ସହ କରତେ ପାରବେ ?’

ଆମି ବୀରେର ମତ ଉତ୍ତର ଦିଲାମ, ଓ-ଭୟେ କମ୍ପିତ ନୟ ବୀରେର ହୃଦୟ !

ଏକଟୁ ଈସଂ ବିଜ୍ଞପେର ହାସି ହାସି ମେମସାହେବ । ବଲଲୋ,  
ଆଜେବାଜେ ବକତେ ଲଜ୍ଜା କରେ ନା ? କୋଥାୟ ନିଜେକେ ଆରୋ  
ଏଗିଯେ ନିଯେ ଯାବାର ଚେଷ୍ଟା କରବେ—ତା ନୟ ଶୁଧୁ.....

‘ଏହିତ ସବେ ନତୁନ ଏକଟା କାଜ ଶୁରୁ କରେଛି । ଆବାର ନତୁନ କି  
କରବ ?’

‘ତୁମି କି କରବେ ତୁମି ତା ଜାନ ନା ?’

ଆମି ସତିୟ ସତିୟଇ ଭାବନାୟ ପଡ଼ି । ଭେବେ ପାଇ ନା କି ବଲତେ  
ଚାଯ ଓ । ଆମି ଓର ହାତଟା ଚେପେ ଧରେ ବଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେମସାହେବ,  
ଫ୍ରାଙ୍କଲି ବଲ ନା କି ବଲତେ ଚାଇଛ । ରାଗାରାଗି କରେ କି ଲାଭ ଆହେ ?

ମେମସାହେବ ବଲେ, ଏହି ନତୁନ କାର୍ଜଟା ପାବାର ପର ମନେ ହୟ ତୁମି  
ଯେବେ ଆର କିଛୁ ଚାଣ ନା । ତାଇ ନା ?

‘ନିଶ୍ଚଯିଷ୍ଟ ଚାଇ କିନ୍ତୁ ଚାଇଲେଇ ଯେ ପାଓୟା ଯାଯ ନା, ସେ-କଥା ତୋ  
ତୁମି ଜାନ ।’

‘শুধু মেমসাহেবের কথা ভাবলে জীবনে আর কোনদিন কোম্ব  
কিছুই পেতে হবে না। নতুন কিছু পেতে হলে ঘূরতে হয়, লোক-  
জনের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়।’

ও-কথাটা ঠিকই বলেছিল। দৈনন্দিন কাজকর্ম করে বাকি  
সময়টিকু মেমসাহেবের জগ্য গচ্ছিত ছিল।

মেমসাহেব আবার বলে, আমাকে তো অনেক পেয়েছ, প্রাণভরে  
পেয়েছ। এখন তো আমার পক্ষে আর কোন চুলোয় ধাওয়া স্তুতি  
হবে না। আমি চাইলেও কেউ আমাকে নেবে না। স্ফুরাং তুমি  
তো নিশ্চিন্ত। এবার তাই বলছিলাম. তুমি নির্ভয়ে নিজের কাজ  
করতে পার।

আমি নতুন কাজটা পেয়ে একটা ধাপ এগিয়েছিলাম। সঙ্গে  
সঙ্গে ধূমকেও দাঢ়িয়েছিলাম। অস্তুতঃ কিছুদিন নিশ্চিন্তে থাকবার  
বাসনা ছিল। মেমসাহেবের তা সহ হলো না। মেমসাহেব চাইল  
কর্মজীবনে যতদিন স্থিতি, মর্যাদা না আসবে, ততদিন বিশ্রাম করার  
কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

‘কাগজে তো কত লোক কত আর্টিকেল, কত ফিচার, কত গল্প  
লেখে, তুমিও তো লিখলে পার।’

‘কোনদিন তো ওসব লিখিনি। রিপোর্ট লেখা ছাড়া আর  
কিছুই তো লেখার সুযোগ আসে নি।’

‘সুযোগ আসে না, সুযোগ করে নিতে হয়।’

তোমাকে তো আগেই লিখেছি ও আমার মত বেশী বক বক  
করত না। অল্প অল্প কথা দিয়েই মেমসাহেবের মনের ভাব বেরিয়ে  
আসত।

দোলাবৌদ্ধি, আজকাল একদল ডাক্তার যেমন পেটেন্ট ওষুধ,  
ক্যাপমুল, ট্যাবলেট, ইনজেক্শন দিয়েই সমস্ত চিকিৎসা করে, তেমনি  
খবরের কাগজের প্রায় সব রিপোর্টাররাই বাঁধাধরা গদে রিপোর্ট  
লিখতে পারে। রোগীর জগ্য একটা মিক্ষচারের প্রেসক্রিপশন

করতে হলে ডাক্তারবাবুর মন্ত্রিকের ব্যাপ্তি করতে হয়। মাঝুলি খবরের কাগজের রিপোর্ট লেখার বাইরে কিছু লিখতে গেলেও রিপোর্টারবাবুদের কিছু কেরামতি থাকা দরকার। আমার সে কেরামতি কোনকালেই ছিল না, আজও নেই। কিন্তু ঢেলার নাম বাবাজী। মেমসাহেবের চোখের জল, দীর্ঘনিঃশ্঵াস সহ করা অসম্ভব বলেই আমি বাধ্য হয়ে কলম নিয়ে কেরামতি শুরু করলাম।

আমার সে কি ছুর্দিন, তুমি তা কল্পনা করতে পারবে না। কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই বুক ফেটে কান্না আসত; তবুও থামতে পারতাম না। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি সবকিছু সন্তুষ্ট ? আমার পক্ষেও সন্তুষ্ট হলো না।

শেষকালে কি করলাম জান ? প্রবন্ধ লেখা শুরু করলাম। কিছু বইপত্র আর ম্যাগাজিন পড়ে প্রবন্ধ লেখা চালু করলাম। এ-কাজে নিজের বিদ্যার প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল কিছুটা বুদ্ধির। আস্তে আস্তে সেগুলো ছাপা হতে লাগল, কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি ঘটত।

একদিন মেমসাহেবকে বললাম, দেখছ কেমন সুন্দর ঠিকিয়ে রোজগার করছি।

‘নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে রোজগার করাকে ঠকান বলে না।’

‘তাই বুঝি ?’

মেমসাহেব সেদিন বলেছিল, রাম নাম জপ করে যাও। অতশ্চ তাবতে হবে না, হয়ত একদিন ডাকতে ডাকতেই তগবানের দেখা পেয়ে যাবে।

মেমসাহেবের পাল্লায় পড়ে সেই যে আমি কলম নিয়ে রাম নাম জপ শুরু করেছি, আজও তা থামাতে পারিনি। বিধাতার বিচিত্র খেয়ালে মেমসাহেব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। জানি ও হয়ত আমার লেখা পড়তে পায় না বা পারে না। মাঝে মাঝেই মনে হয় কার জন্য লিখব ? কিসের জন্য লিখব ? তগবানের কৃপা হলে

পঙ্গু উত্তুঙ্গ গিরি লজ্জন করতে পারে। আমি তগবানের কৃপা  
লাভ করিনি, ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই করব না। জীবনে যা-কিছু  
পেয়েছি, যা-কিছু করেছি, তা সবই ঐ পোড়াকপালীর জন্ম।  
ভালবাসা দিয়ে মেয়েটা আমাকে পাগল করে দিয়েছে এবং সেই  
পাগলামি করতে করতে আমি আমার জীবনটাকে নিয়ে ঝুঁয়া  
খেলেছি। আভাবিক অবস্থায়, সুস্থ মন্ত্রিকে কোন মাঝুষ আমার  
মত জীবনটাকে নিয়ে এমন খেলা করতে সাহস পাবে না। আমি  
পেরেছি, আজও কিছু কিছু পারছি কিন্তু আগামীকাল থেকে আর  
পারব না। পারব কেমন করে বল? ঐ পোড়াকপালী আমাকে  
গাছে ঢাকিয়ে দিয়ে মইটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। ডালে ডালে,  
পাতায় পাতায় আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কত কাল? সব-  
কিছুরই তো একটা সীমা আছে।...

কি লিখতে গিয়ে কি লিখে ফেললাম। মেমসাহেবের কথা  
লিখতে গেলে আমার মাথাটা ঘুরে উঠে, বুদ্ধিংশ হয়। উচিত-  
অনুচিত বিচার করতে পারি না। জীবনে কোনদিন ভাবিনি  
মেমসাহেবের কথা লিখব। কিন্তু অবস্থার হুরিপাকে তোমাকে  
বাধ্য হয়েই লিখছি। আর কাউকে এসব নিশ্চয়ই লিখতাম না।  
তবে কি জান, চিঠিগুলো লিখে মনটা অনেক হাঙ্কা হচ্ছে। ভয়ও  
হচ্ছে। ডাক্তারবাবুরা যেমন নিজেদের প্রিয় শ্রী-পুত্রের চিকিৎসা  
করতে সঙ্কোচবোধ করেন, আমিও তেমনি আমার মেমসাহেবের  
কথা লিখতে ভয় পাচ্ছি। ভাব দিয়ে ভাষা দিয়ে, মেমসাহেবের প্রতি  
স্মৃবিচার করা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। রাগ, অভিমান,  
ভালবাসাৰ মধ্য দিয়ে ও যে কি আশৰ্বত্বাবে আমার জীবন-নৌকায়  
পাল তুলে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তা ঠিক করে বলা বা লেখার  
ক্ষমতা আমার নেই।

থবরের কাগজের রিপোর্টারি করার একটা নেশা আছে। সে  
নেশা প্রতিদিনের। একদিনের উদ্দেশ্যনা, নেশা কাটতে না কাটতেই

নতুন উদ্দেশ্যনার জোয়ার আসে রিপোর্টারদের জীবনে। তাছাড়া  
সে উদ্দেশ্যনার বৈচিত্র্য রিপোর্টারদের আরো বেশী মাতাল করে  
তোলে। সেই উদ্দেশ্যনার ঘোরেই অধিকাংশ রিপোর্টারদের জীবন  
কেটে যায়। ইচ্ছা বা ক্ষমতা থাকলেও বিশেষ কিছু করা কারুর  
পক্ষেই সম্ভব হয় না। মেমসাহেব চায় নি আমার জীবনটা শুধু  
এমনি অহেতুক উদ্দেশ্যনায় ভরে থাকুক। সে চেয়েছিল আমার  
কর্মক্ষেত্রকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করতে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে ঘূরতে ঘূরতে মেমসাহেব আমার  
হাত ধরে টেনে নিয়ে বললে, অত দূরে দূরে যাচ্ছ কেন?

‘এটা তো তোমার ড্রাইরুম নয়...?’

মেমসাহেব প্রায় বিছুবৎবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা  
গাছের আড়ালে নিয়ে গেল। ত’হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে  
বললে, তুমি রাগ করেছ?

‘পাগল! রাগ করব কেন?’

‘খুব বেশী রাগ করেছ, তাই না?’

‘বিন্দুমাত্র রাগ করিনি। ভাল চাকরি পেতে হলে ইউ. পি.  
এস. সি’র পরীক্ষা দিতে হয়, পাশ করতে হয়; তেমনি তোমাকে  
পেতে হলেও তো আমাকে কিছু কিছু পরীক্ষা দিতে হবে, পাশ  
করতে হবে...’

ও হাত ধরে আমার মুখটা চেপে ধরে বলে, বাজে কথা  
বলো না।

‘বাজে না মেমসাহেব। ইচ্ছা করলে আমার চাইতে অনেক  
বেশী সুপ্রতিষ্ঠিত কাউকে তুমি তোমার জীবনে পেতে পারতে কিন্তু  
একবার যখন আমার খেয়াবাটে পিছলে পড়ে গেছ, তখন আমাকেই  
তৈরি করার চেষ্টা করছ।’

একটা দীর্ঘনিঃখাস ছেড়ে মেমসাহেব বললো, তোমার মনটা  
আজ বিক্ষিপ্ত। তাই আজ বলব না, ত’চারদিন পরে বলব।

‘পরে কেন ? আজই বল !’

‘আজ বললে তুমি বিশ্বাস করবে না !’

‘তোমার ওপর রাগ করতে পারি কিন্তু অবিশ্বাস কোনদিন করব না !’

‘ঠিক ?’

‘ঠিক !’

মেমসাহেব আমার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের মাথার উপর দিয়ে বলে, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল তুমি অবিশ্বাস করবে না ।

অত রাগ, অত ছঃখ, অত অভিমানের মধ্যেও আমার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল । আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, সত্য বলছি তোমাকে কোনদিন অবিশ্বাস করব না ।

ছজনে একটু এগিয়ে একটু ছায়ায় বসলাম । মেমসাহেব বললো, কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত অন্য কোন ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারত, হয়ত সে তোমার চেয়ে চের চের বেশী রোজগার করত কিন্তু ‘আমার মনে হয় অত সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের হৃদয়ে স্তীর প্রতিষ্ঠা পাওয়া খুব দুর্লভ ।

একটু থামে । আবার বলে, ঢাখ, ঠিক পয়সাকড়ির প্রতি আমার খুব বেশী মোহ নেই । একটু সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকতে ইচ্ছা করে ঠিকই কিন্তু তাই বলে বেশী পয়সাকড়ি হলে মনটা নষ্ট হয়ে যায় । আমি তা চাই না ।

আমি বললাম, তুমি যে প্রায় উদয়ের পথের ডায়ালগ বলা শুরু করলে ।

মেমসাহেব আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, তুমি আমাকে অমন করে অপমান করো না । ইচ্ছা-করলে শাসন করতে পার, বকতে পার কিন্তু আমার ভালবাসা নিয়ে তুমি ঠাট্টা করো না ।

মেমসাহেবের গলার স্বরটা বেশ তারী হয়ে এসেছিল । আমি বেশ বুঝলাম, এর পরের ধাপেই ঝরুক করে নেমে আসবে

ଆବନ୍ଧାରା । ଓର ଏହି ଚୋଥେ ଜଳ ଆମି ଠିକ ସହ କରତେ ପାରବ ନା ବଲେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଓର ଗାଲ ଟିପେ ବଲଲାମ, ତୁମି କି ପାଗଳ ହୟେଛୋ ? ତୋମାର ଭାଲବାସା ନିଯେ ଆମି ଠାଟ୍ଟା କରବ ?

ମେମସାହେବ ଏକଟୁ ଶାନ୍ତି ପାଇ, ସ୍ଵନ୍ତ ପାଇ । ଆମାର କ୍ଷାଧେର 'ପର ମାଥାଟା ରାଖେ । ଆମି ଓର ମୁଖେ ମାଥାଯ ହାତ ଦିଯେ ଆଦର କରି । ମେମସାହେବ ଆରୋ ଆମାର କାହେ ଆସେ । ବଲେ, କେନ ଯେ ତୋମାକେ ଭାଲବେଶେଛି ତା ଜ୍ଞାନି ନା । ହୟତ ତୁମି ଆମାକେ ଅମନ କରେ ଚେଯେଛିଲେ ବଲେଇ ଆମି ତୋମାକେ ଫିରିଯେ ଦିତେ ପାରିନି । ଅନେକ-ଦିନ ରାତ୍ରେ ଏକଳା ଏକଳା ଚୁପଚାପ ତୋମାର କଥା ତେବେଛି ।

'ତାଇ ନାକି ?'

'ତବେ କି ! ଭାବିଯେ ଭାବିଯେ ତୋ ତୁମି ଆମାକେ ଶେଷ କରଲେ !'

'ତା ତୋ ବୁଝଲାମ । କିନ୍ତୁ ଆମାର କାଜକର୍ମ ନିଯେ ଅତ ଖିଟଖିଟ କରିବେଳେ ?'

ମାଥାଟା ନାଡ଼ିଯେ ମେମସାହେବ ବଲେ, ଖିଟଖିଟ କରବ ନା ? ତୋମାର ମତ ଫାକିବାଜ, ଆଡିବାଜ, ଶ୍ରେଣ ଲୋକଙ୍କେ ଖିଟଖିଟ ନା କରଲେ କାଜ କରାନ ସନ୍ତ୍ବନ୍ନ ।

'ଯାର ଦ୍ରୁତି ନେଇ, ମେ ଆବାର ଶ୍ରେଣ ହବେ କେମନ କରେ ?'

'ବାଜେ ବକୋ ନା । ବିଯେ ନା କରେଇ ଯା କରଛ ସେ ଆର ବଲାର ନୟ । ନା ଜ୍ଞାନି ବିଯେ କରଲେ କି କରବେ ?'

ଜାନ ଦୋଲାବୌଦୀ, ମେମସାହେବ ଭୀଷଣ ଛହୁମି କରତ । ଆମି ଆଦର କରଲେ ଗଲେ ପଡ଼ତ, ଭାଲବାସଲେ ମୁଢ଼ ହତୋ, ଛହୁମି କରଲେ ଉପଭୋଗ କରତ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମାକେ ଟିପ୍ପନୀ କାଟାର ବେଳାଯ ଏମନ ଏକଟା ଭାବ ଦେଖାତ ଯେ ଓର ଯେନ କୋନ ତାଗିଦ ନେଇ, ପ୍ରୋଜନ ନେଇ ; ସବ କିଛୁଇ ଯେନ ଆମାର ପ୍ରୋଜନ ।

ଯାଇ ହୋକ ସେଦିନ ବୋଟାନିକ୍ୟାଲ ଗାର୍ଡନେ ବସେ ବସେ କି ବଲେଛିଲ ଜାନ ? ବଲେଛିଲ, ଆମି ଚାଇ ତୁମି ଅନେକ ଅନେକ ବଡ଼ ହସ । କେଉ ଯେନ ବଲତେ ନା ପାରେ ଆମି ଆସାଯ ତୋମାର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୟେ ଗେଲ ।

এইত নিজেকে গড়ে তোমার সময়। এর পরে সংসারধর্মে জড়িয়ে  
পড়লে আর কি এত অবসর পাবে? পাবে না। এখন তুমি একটি  
মুহূর্তও নষ্ট করবে না, আমি নষ্ট করতে দেব না। আমার সমস্ত  
স্বপ্ন, সাধনা, শক্তি দিয়ে তোমাকে আমি বড় করবই।

আমি বলি, তুমি নিজেও তো এগিয়ে যাবে। বিদেশ যেতে  
পার, রিসার্চ করতে পার...

মেঘসাহেব অবাক হয়ে বলে, আমি? বিয়ের পর আমি কিছু  
করব না। চাকরি-বাকরি সব ছেড়ে দেব।

‘তবে কি করবে?’

‘কি আবার করব? ঘর-সংসার করব?’

‘তাই বলে চাকরি ছাড়বে কেন?’

‘চাকরি করলে আর ছেলেমেয়ে মাঝুষ করা যায় না। তাছাড়া  
তোমার যা অনুত্ত কাজ! কাজের তো কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই।  
স্বতরাং হজনেই বাইরে বাইরে থাকলে চলবে কেন?’

আবার পরে বলল, ঘর-সংসারের কাজকর্ম করে তোমার  
কাজকর্মে একটু সাহায্য করার চেষ্টা করব। তোমার মত জ্ঞানালিস্ট  
না হতে পারি অনুত্ত তোমার সেক্রেটারী ত হতে পারব।

এমনি করে একদিন অকস্মাত পিছন ফিরে দেখি আমার কর্ম-  
জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। দৈনন্দিন রিপোর্ট  
করা ছাড়াও নিত্য নতুন লেখার কাজে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।  
ক্লিপিং করা, ফাইল করা, লাইব্রেরীতে গিয়ে মেটস্ নেওয়া, বইপত্রে  
পড়া, তারপর লেখা এবং সে লেখা ছাপাবার ব্যবস্থা করা নিয়ে  
সারাটা দিন বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়। রোজ রোজ  
মেঘসাহেবের সঙ্গে দেখা করারও সময় হয় না।

ইতিমধ্যে উভয়বঙ্গে সর্বনাশ বঙ্গ দেখা দিল। ঘরবাড়ি  
রেললাইন ভেসে গেল, জমিজমা তুবে গেল, হাজার হাজার লক্ষ  
লোক হাহাকার করে উঠল। নিউজ এডিটরের নির্দেশে আমাকে

ছুটতে হলো সেই বিশ্বসী বঙ্গার রিপোর্ট করতে। মেমসাহেবকে কলেজে টেলিফোন করে খবরটা দিলাম। স্টেশনে এসে আমার হাতে নির্মাণ্য দিয়ে বলেছিল, কালীঘাটের মা'র নির্মাণ্য। কাছে রেখো, কোন বিপদ হবে না।

গুধু নির্মাণ্য দিয়েই শাস্তি পায় নি। বিস্কুট-জ্যাম-জেলীর একটা বিরাট প্যাকেট দিয়ে বলেছিল, ঝ্রাউ এরিয়ায় নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়ার মুশকিল হবে। এগুলো রেখে দাও।

দিন পনের বাদে আমি ঘুরে এলাম। মেমসাহেব তো আমাকে দেখে চমকে উঠল, তোমার এ কি অবস্থা?

‘কি আবার অবস্থা?’

‘কি হয়েছে তোমার শরীর?’

‘অনিয়ম-অত্যাচার হলে শরীর খারাপ হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? কদিন পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।’

সেদিন ও আর বিশেষ কিছু বলল না। পরের দিন এক বোতল টনিক নিয়ে হাজির। ছক্কুম হলো, ছ'বেলা ছ' চামচ করে থাবে। তুল হয় না যেন। আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খাওয়াটা বন্ধ কর তো।

‘চা খাওয়া বন্ধ করব?’

‘কথাটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লে বলে মনে হচ্ছে।’

‘প্রায় তাই। সাকসেসফুল জার্নালিস্টরা ছইশ্বি আর আন-সাকসেসফুল জার্নালিস্টরা চা খেয়েই তো বেঁচে থাকে। সেই চা ছাড়লে কি এবার ছইশ্বি ধৰণ?’

‘নিশ্চয়ই! তা না হলে আমার কপাল পোড়াবে কেমন করে?’

আমি নিয়ম-কানুন ছাড়া, বন্ধনহীন উশ্মত পদ্মার মত বেশ জীবনটা কাটাচ্ছিলাম। ছন্দছাড়া জীবনটা বেশ লাগত। কিন্তু এই মেঝেটা এসে সব খেলটপালট করে দিল। আমাকে প্রায় ভদ্রলোক করে তুলল। সর্বোপরি আমার চোখে, আমার প্রাণে একটা সুন্দর শাস্তি সংসার-জীবনের স্বপ্ন এঁকে দিল।

বহুজনকে দীর্ঘদিন তৈলমর্দন করেও কলকাতার কোন পত্র-পত্রিকায় যখন কোন চাকরি জোটাতে পারলাম না, তখন একসপ্রেস আর ক্রনিকেলের ত্রি সামান্য অঙ্গায়ী কাজও বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু কতকাল? মেমসাহেবকে নিয়ে আমার জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা ছিল না। কর্মজীবনে সে অনিশ্চয়তা আমাকে এবার ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন করতে লাগল।

দৈনন্দিন রিপোর্টিং ছাড়া প্রবন্ধ ফিচার ইত্যাদি লেখা ঠিকই চলছিল। কখনও এ কাগজে, কখনও সে কাগজে এসব লেখা ছাপাও হচ্ছিল। কোন কোন লেখা অমনোনীতও হচ্ছিল। মাঝে মাঝে দশ-পনের-বিশ টাকার মনি অর্ডার বা চেকও পাওয়ালাম। মন্দ লাগছিল না। কিন্তু সাংবাদিক ফেরিওয়ালা হয়ে তো জীবন কাটাতে পারি না! এই অনিশ্চয়তার মধ্যে মেমসাহেবকে তো টেনে আনতে পারি না! তাহাড়া আমাকে পাশ কাটিয়ে অনেক পরিচিত নতুন ছেলেছোকরার দল অলিগলি দিয়ে কর্মজীবনের রেড রোড ধরে ফেলল। নিজেকে বড়ই অপদার্থ, অকর্মণ্য মনে হল।

মেমসাহেবকে আমি কিছু বলতাম না। নিজের মনে মনেই অনেক কথাই চিন্তা করতাম। একবার ভাবলাম চুলোয় যাক জার্নালিজম! যদি খেতে পরতে না পেলাম তবে আবার জার্নালিজম-এর শখ কেন? দুর্বল মুহূর্তে অন্ত চাকরি-বাকরি নেবার কথাও ভাবলাম। কিন্তু পরের মুহূর্তে নিজের মনকে শাসন করেছি। বুঝিয়েছি, না তা হয় না। এতবড় পরাজয় আমি মেনে নিতে পারব না। ঘোবনেই যদি কর্মজীবনের এত বড় পরাজয় মেনে নিই, তবে ভবিষ্যতে কি করব? কি নিয়ে লড়ব?

আবার ভেবেছি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাই। দিল্লী, বোর্সে  
বা লগন চলে যাই। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া বললেই তো আর  
পালিয়ে যাওয়া যায় না। বিলেতে যেতে অনেক টাকার প্রয়োজন।  
সে টাকা আমার ছিল না। তাহাড়া বিলেত গিয়ে কি করতাম।  
বিলেত গিয়ে কেরানীগিরি বা বাস কগুকটর হয়ে এ্যান্টনি সাহেব  
হবার শখ কোনদিনই আমার ছিল না। কয়েকটা দেশী কাগজের কাজ  
নিয়ে বিলেতে যাবার পরিকল্পনা অনেক দিন মনের মধ্যে উকিলুকি  
দিয়েছিল কিন্তু তার জগতে দেশের মধ্যে অনেক ঘোরাঘুরি প্রয়োজন  
ছিল। আমার পক্ষে তাও সম্ভব হয় নি। রাসবিহারী এভিল্যুর  
পোস্টফিল্সে মেমসাহেবের কিছু টাকা ছিল। আমার কল্যাণে  
ইতিমধ্যেই তাতে দু'একবার হাত পড়েছিল। সুতরাং গুদিকে  
হাত বাড়ানোর কথা আর ভাবতে পারলাম না।

দু'একবার অত্যন্ত আজ্জিবাজে চিন্তাও মাথায় এসেছে। ভেবেছি  
মেমসাহেবকে কিছু না জানিয়ে অকস্মাত একদিন যেখানে হোক  
উধাও হয়ে যাই। যৌবনে প্রাণবন্ত সব ছেলেমেয়েরাই প্রেমে পড়ে।  
ক'জন সে প্রেম আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে ?

আমিও না হয় পারলাম না। কি হয়েছে তাতে ? মেমসাহেব  
হচারদিন কানাকাটি করবে, দু'এক বেলা হয়ত উপবাস করবে।  
কেউ কেউ হয়ত কয়েকদিন উপহাস করবে, কেউ বা হয়ত কিছু  
কিছু অপ্রিয় মন্তব্য করবে। কিন্তু তার পর ? নিশ্চয়ই সব কিছু  
ঠিক হয়ে যাবে। ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আমেরিকা ফেরত  
কিসারি একস্পার্ট স্বৰোধবাবু নিশ্চয়ই মেমসাহেবকে অপছন্দ  
করবেন না। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে বুড়ো সাজাদ হোসেনের  
সানাই বেজে উঠলে স্বৰোধবাবু জামাই বেশে হাজির হবেন। কিছু  
পরে মেমসাহেব বধু বেশে কলাতলায় স্বৰোধকে মালা পরাবে,  
পুরোহিত মন্ত্র পড়ে সম্পত্তি ট্রান্সফার পাকাপাকি করবেন। তারপর  
বাসর। একটু হাসি, একটু ঠাণ্ডা, একটু তামাশা। লোকচক্ষুর

আড়ালে হয়ত একটু স্পর্শ, একটু অঙ্গুতি। দেহমনে হয়ত বা  
একটু বিদ্যুৎ প্রবাহ !

আমার মাথাটা একটু খিমবিম করল। তবে সামলে নিলাম।  
পরের দিনটার জন্য খুব বেশী চিন্তা হয় না। কিন্তু তার পরের  
দিন। ফুলশয়ার কথা ভাবতে গিয়েই মাথাটা হঠাতে ঘূরে উঠল।  
রজনীগঙ্গা দিয়ে সাজান ঐ ফোমড় রবারের শয়ায় মেমসাহেবের  
একচ্ছত্র অধিপতিরূপে স্বৰোধ। তিলে তিলে ধীরে ধীরে যে  
মুকুল চবিশ-পঁচিশ বসন্তে পল্লবিত হয়ে আমার মানস-প্রতিমা  
মেমসাহেব হয়েছে, যার মনের কথা, দেহের উত্তাপ, বুকের স্পন্দন  
গুরু আমি জেনেছি, পেয়েছি ও অনুভব করেছি, সেই মেমসাহেবের  
অঙ্গে স্বৰোধের স্পর্শ! অসন্তুষ্ট। তাছাড়া যে মেমসাহেব তার  
জীবনসর্বস্ব দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে আমাকে স্বীকৃতি, সার্থক করতে  
চেয়েছে, তাকে এভাবে বঞ্চিত করে পালিয়ে যাব? না, না, তা হয়  
না।

তবে ?

তবে কি করব, তা ভেবে কোন কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না।  
মনে মনে অবশ্য ঠিক করেছিলাম কলকাতায় আর বেশীদিন থাকব  
না। খবরের কাগজের রিপোর্টার হিসার দৌলতে বাংলাদেশের বহু  
প্রতিষ্ঠিত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হিসার হৃর্ভাগ্য আমার  
হয়েছিল।

হৃর্ভাগ্য !

হ্যাঁ, হৃর্ভাগ্য। হৃর্ভাগ্য নয়ত কি বলব বল? কলকাতার ময়দানে  
মনুমেন্টের নীচে লক্ষ লক্ষ মানুষ এঁদের বক্তৃতা শোনে, হাততালি  
দেয়, গলায় মালা পরায়। প্রথম প্রথম এঁদের কাছে এসে নিজেকে  
কৃতার্থ মনে করতাম। শিক্ষা-সংস্কৃতির ধৰ্জা উড়িয়ে যাওয়া সিনেট  
হল—ইউনিভার্সিটি ইনসিটিউট—মহাবোধি সোসাইটি হল গরম  
করে তুলতেন, তাদের সবাইকেও ঠিক শুন্ধা করে উঠতে পারলাম

না। সাড়ে তিনি কোটি বাঙালী নারী-পুরুষ-শিশুর দল যাদের মুখ চেয়ে বসে আছে, যাদের বক্তৃতা আমরা নিত্য খবরের কাগজের পাতায় ছাপছি, তাদের স্বরূপটা অকাশ হওয়ায় আমি যে কি দ্রংখ, কি আঘাত পেয়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কি কি কারণে এঁদের আমি আঙ্কা করতে পারিনি, সে-কথা লেখার অযোগ্য। বিজ্ঞাসাগরের বাংলাভাষা দিয়ে এঁদের কাহিনী লিখলে বিজ্ঞাসাগরের স্মৃতির অবমাননা করা হবে, বাংলাভাষার অপব্যবহার করা হবে। তবে যদি এইসব মহাপুরুষের কথা লিখতে পারতাম, যদি সে-ক্ষমতা আমার থাকত, তবে বাংলাদেশের কিছু মাঝুষ নিশ্চয়ই বাঁচতে পারত।

তুমি ভাবছ আমি বাচালতা করছি। তাই না? সত্যি বলছি দোলাবৌদি, আমি একটুও বাচালতা করছি না। ইংরেজীতে যাকে বলে ট্রাডিশন, তা তো বাঙালীর আছে। শিক্ষা-দিক্ষা-আদর্শ ও দেশপ্রেমের অভাব তো বাংলাদেশে নেই। গ্রামে গ্রামে দরিদ্র গৃহিণীরা আজও ক্ষুধার অন্ধ দিয়ে অতিথির সেবা করতে কার্পণ্য করেন না। উদার বাংলা বুক পেতে সারাদেশের মাঝুষকে আসন বিছিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের দিগ্দিগন্তের থেকে লক্ষ লক্ষ মাঝুষ এসেছেন বাংলাদেশে। কিন্তু কই আর কোন প্রদেশের মাঝুষ তো এমনি করে সারাদেশের মাঝুষকে নিয়ে সংসার করবার উদারতা দেখাতে পারে নি। রাজনীতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্পে-সংগীতে বাঙালীর ঔদ্যোগ্য অতুলনীয়। অতীতের ইতিহাস ওষ্টাবার কোন প্রয়োজন নেই। ইদানীং কালের ইতিহাসই ধরা যাক। প্রথেশ বড়ুয়া, কুন্দনলাল সায়গল, লীলা দেশাই বাঙালী নন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি মাঝুষের হৃদয়ে এঁদের অকলঙ্কিত আসন চিরকালের জন্য রইবে। বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র গান শোনার জন্য একমাত্র বাংলাদেশের অতিসাধারণ মাঝুষই সারা রান্তির রাস্তার ফুটপাথে বসে থাকে। টি আও, আঁশা রাও,

মেওয়ালাল বা লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলিকে বাঙালীর ছেলেরা যা ভালবাসা দিয়েছে, তার কি কোন তুলনা হয়? হয় না দোলাবৌদি। হবেও না।

শিক্ষা-দীক্ষা-আদর্শ ও সর্বোপরি হৃদয়বস্তা সঙ্গেও বাঙালী কেন মরতে চলেছে? বাঙালীর ঘরে ঘরে কেন হাহাকার? কামা? সারাদেশের মাঝুষ যখন নতুন প্রাণস্পন্দনে মাতোয়ারা, তখন বাঙালীর এ-দুরবস্থা কেন? সাড়ে তিনি কোটি বাঙালীর মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিল কে? কেন সারা জাতটা সর্বহারা হলো?

আগে সবকিছুর জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতাম। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে আশা করতাম ময়দানে মরুমেঠের তলায় নেতাদের গলায় মালা পরালে, তাঁদের বক্তৃতা শুনলে হাতে তালি দিলে বাঙালীর সর্বরোগের মহীষথ পাওয়া যাবে। রিপোর্টারী করতে গিয়ে বড় আশা নিয়ে এঁদের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু হা ভগবান! মনে মনে এমন ধাক্কাই খেলাম যে তা বলবার নয়।

ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা নিশ্চয়ই খুব জরুরী ব্যাপার। কিন্তু সাংবাদিকতা করতে গিয়ে সমাজ-জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা অসম্ভব। তাই তো সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ক্ষয়রোগ দেখে আতকে উঠেছিলাম। তাই তো কলকাতার জীবন আমার কাছে আরো তেতো মনে হতে লাগল।

এইসব নানা অশাস্তি মনকে তোলপাড় করে তুলেছিল। মুখে কিছুই প্রকাশ করছিলাম না। বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের কেউই কিছু জানতে পারছিল না। আমার মনের মধ্যে কত চিন্তা-ভাবনার যে কি বিচিত্র লড়াই চলছিল, সে-খবর কেউ জানতে পারল না। তবে মেমসাহেবকে ফাঁকি দিতে পারিনি।

সেদিন তুজনে আশানাল লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। নোটস নেওয়ার কাজ শেষ করে একটা গাছতলায় এসে বসলাম তুজনে।

আমি বোধহয় দৃষ্টিটা একটু অন্ধদিকে ঘূরিয়ে নিয়ে কি যেন  
দেখছিলাম। মেমসাহেব বললো, ওগো, চিনেবাদাম কিনে  
আনবে ?

আমি গেটের বাইরে থেকে তু' আমার চিনেবাদাম আৱ তুচ্ছে  
ম্যাগনোলিয়া আইসক্রীম কিনে আনলাম। আইসক্রীম, চিনেবাদাম  
খাওয়া শেষ হয়েছে। মেমসাহেব তখনও একটু একটু ঝাল-মুন  
খাচ্ছে আৱ জিভ দিয়ে রসাঞ্চাদনেৱ আওয়াজ কৰছে। ওৱ কখন  
ঝাল-মুন খাওয়া শেষ হয়েছে, কখন আমার কাছে ঝুমাল চেয়েছে,  
তা আমি খেয়াল কৰিনি।

মেমসাহেব হঠাৎ আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, ওগো,  
ঝুমালটা দাও না !

আমি ঝুমাল দিলাম। ঝুমাল দিয়ে হাতটা মুখ্টা মুছে আবাৱ  
আমাকে ফেরত দিল, এই নাও।

ঝুমালটা পকেটে রাখতে রাখতে আমি জিজ্ঞাসা কৰলাম,  
তোমার ঝুমাল কি হলো ?

‘সৰ্বমঙ্গলার নির্মাল্য বেঁধে তোমাকে দিলাম না !’

‘ও ! তাইতো !’

মেমসাহেব প্ৰশ্ন কৱল, ‘একটা কথা বলবে ?’

‘কেন বলব না ?’

‘কি এত ভাবছ আজকাল ?’

‘কই ? কিছু না তো !’

ও একটু হাসল। বললো, আমাকে ছুঁয়ে বলতে পাৱ তুমি  
কিছু ভাবছ না ?

কথা শেষ হতে না হতেই ও আমার হাতটা টেনে নিয়ে বুকেৱ  
ওপৰ রেখে বলে, বল।

আমি হাতটা সৱিয়ে নিয়ে বলি, কি ছেলেমানুষি কৰছ !

মেমসাহেব একটু হাসে, একটু ভাবে। বোধহয় আমার কথায়

একটু ছঃখ পায়। ঐ ঘন কালো ছুটো চোখ যেন আবশ্যের মেঘের  
মত ভারী হয়ে ওঠে। আমি এক বলক দেখে নিয়ে দৃষ্টিটা সরিয়ে  
নিই।

মেমসাহেবের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। আমি দৃষ্টিটা আবার  
দুরিয়ে নিয়ে আসি। জানতে চাই, ‘কি এত ভাবছ ?’

‘জেনে তোমার লাভ ?’

আমি ভেবেছিলাম সহজ সরলভাবে মেমসাহেবকে এড়িয়ে  
থাব। কিছু বলব না। কিন্তু গভীর ভালবাসায় ওর দৃষ্টিটা এত  
স্বচ্ছ হয়েছিল যে, আমার মনের গভীর প্রদেশেরও কোন কিছু  
লুকান সম্ভব ছিল না। ও স্থির জেনেছিল আমার মনটা একটু  
বিক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু কি কারণে মনটা বিক্ষিপ্ত তা জানতে না  
পারায় মেমসাহেবের ছঃখ হওয়া স্বাভাবিক। সে-কথা উপলক্ষ  
করেও ওকে ঠিক সত্য কথাটা বলতে আমার বেশ কুণ্ঠা হলো।

ছ'চার মিনিট ছজনেই ছুপচাপ রাখিলাম।

তারপর মেমসাহেব ডাকে, শোন।

‘বল’।

‘তুমি কি আজকাল এমন কিছু ভাবছ যা আমাকে বলা যায় না।’

‘তুমি কি পাগল হয়েছ !’

‘তবে বলছ না কেন ?’

অনিচ্ছা সঙ্গেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। বললাম, ‘কি বলব  
মেমসাহেব ! নতুন কিছুই ভাবছি না। ভাবছি নিজের কর্মজীবনের  
কথা। আর কতকাল এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকব তাই খালি  
ভাবছি।’

মেমসাহেব উড়িয়েই দিল আমার কথাটা। বললো, তা এত  
ভাববাব কি আছে ? কেউ একটু আগে, কেউ বা একটু পরে জীবনে  
দাঢ়ায়। তুমি না হয় ছ'বছর পরেই জীবনে দাঢ়াবে, তাতে কি  
ক্ষতি হলো ?

‘ভাবব না ? হকারের মত ফিরি করে রোজগার করতে আর ভাল লাগে না । হাজার হোক বয়স তো হচ্ছে !’

মেমসাহেব তাড়াতাড়ি আমাকে কাছে টেনে নেয় । হ’হাত দিয়ে আমার মুখটা তুলে ধরে বলে, ছি ছি, নিজেকে এত ছোট ভাবছ কেন ?

‘ছোট ভাবতাম না তবুও যদি ভদ্রলোকের মত রোজগার করতে পারতাম ।’

‘তোমার কি টাকার দরকার ?’

‘না, না, টাকার আবার কি দরকার !’

‘বল না ! আমি তো মরে যাইনি ।’

মেমসাহেব বড়ই উত্তলা হলো আমার কথায় । জানতে চাইল, আর কি ভাবছ ?

‘বলব ?’

‘নিশ্চয়ই ।’

‘তাবছি আমার এই অনিশ্চয়তার জীবনে তোমাকে কেন টেনে আনলাম । একটা আধাবেকার জার্মালিস্টের সংসারে তোমাকে এনে কেন তোমার জীবনটা নষ্ট করব, তাই ভাবছি ।’

মেমসাহেব রেগে ওঠে, চমৎকার ! হাততালি দেব ?

‘কেন ঠাণ্টা করছ ?’

‘তোমার কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারছি না । তোমার টাকা না থাকলে আমি তোমার কাছে ঠাই পাব না ? তুমি আমাকে এত ছোট, এত নীচ ভাব ?’

পাগল কোথাকার ! তোমাকে আমার সংসারে এনে যদি শুখ, শাস্তি, মর্যাদা দিতে না পারি তবে.....

ও আর এগুলে দিল না, ‘তুমি হ’পাঁচশ’ টাকা রোজগার করলেই আমার শাস্তি ? টাকা হলোই বুঝি সবাই সুবী হয় ?’

‘না তা হবে কেন ? তবুও ভদ্রভাবে বাঁচবার জন্য কিছু তো চাই ।’

‘আমার বা আমার সংসারের চিষ্টা তোমার করতে হবে না।  
তুমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যাও তো।’

কথায় কথায় বেলা যায়। সুবৃটা আস্তে আস্তে নৌচে নামতে  
ধাকে, গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়। বেলভিডিয়ারের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ  
সূর্যরশ্মির বিদায়বেলায় মিষ্টি আলোয় ভরে যায়।

মেমসাহেব আমার কাঁধে মাথা রাখে। ‘ওগো’, বল তুমি এসব  
আজ্জেবাজে কথা ভাববে না। আজ্জ না হয় ভগবান নাই দিলেন  
কিন্তু একদিন তিনি নিশ্চয়ই ভরিয়ে দেবেন তোমাকে।’

‘তুমি বুঝি সবকিছু জান?’

‘একশ’বার! গুয়েলিংটন স্কোয়ার আর মহুমেগ্টের মিটিং কভার  
করেই তোমার জীবন কাটাতে হবে না।’

‘তবে কি করব?’

‘কি না করবে তাই বল। তুমি দেশদেশান্তরে ঘূরবে, কত  
বড় বড় লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে, তুমি কত কি লিখবে...’

‘তারপর?’

মেমসাহেব আমার গাল টিপে বলে, তারপর আর বলব না।  
তোমার অহঙ্কার হবে।

আমার হাসি পায় মেমসাহেবের প্রলাপ শুনে। ‘তুমি কি  
বোঝে যাচ্ছ?’

ও অবাক হয়ে বলে, আমি কেন বোঝে যাব?

‘হিন্দী ফিল্মের স্টেরি লেখার জন্য।’

‘অসভ্য কোথাকার।’

সেদিন আমি শুধু একটা মোটামুটি ভাল চাকরির স্বপ্ন দেখতাম।  
আর? আর ভাবতাম অফিস থেকে আমাকে একটা টেলিফোন  
দেবে। আমি অফিসের গাড়ি করে রাইটার্স বিল্ডিং, লালবাজার  
যাব, পলিটিক্যাল পার্টি গুলোর অফিসে যুরে বেড়াব। চীফ  
মিনিস্টারের সঙ্গে দার্জিলিং যাব। রাইটার্স বিল্ডিং-এর সেক্রেটারী

ডেপুটি সেক্রেটারীরা আমাকে উইস করবেন, পুলিস কমিশনার  
ভিড়ের মধ্যেও আমাকে চিনতে পারবেন, শ্বামপুরু থানার ও-সি  
আমাকে কাটলেট খাওয়াবেন।

স্থপ্ত দেখারও একটা সীমা আছে। তাইতো আমি আর এগুলো  
পারতাম না। আজ সেসব দিনের কথা ভেবে হাসি পায়। কোনদিন  
কি ভেবেছি আমি নেহেঙ্গ-শান্তী-ইন্দিরার সঙ্গে প্রথিবীর পক্ষ  
মহাদেশ ঘুরে বেড়াব ? কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছি বছর বছর  
বিলেত যাব ? কোনদিন কি ভাবতে পেরেছি প্রাইম মিনিস্টারের  
সঙ্গে এয়ার ফোর্সের স্পেশ্যাল প্লেনে দমদমে নামব ? রাজত্বনে  
থাকব ? আরো অনেক কিছু ভাবিনি। তাবিনি ভারতবর্ষের টপ  
লীড়েরেরা আমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে গোপন আলোচনা করবেন,  
হইক্ষি খেতে খেতে অ্যাস্বাসেডরদের সঙ্গে ইটারন্টাশনাল এ্যাফেয়ার্স  
ডিসকাস করব।

মেমসাহেব বৌধহয় এসব ভাবত। কোথা থেকে, কেমন করে  
এসব ভাবনার সাহস সে পেত, তা আমি জানি না। তবে আমার  
কর্মজীবনের কৃষ্ণক্ষেত্র সে-আশা হারায় নি। তাইতো যতবার  
আমি নিরাশায় তেতে পড়েছি, যতবার আমি পরাজয় মেনে নিয়ে  
কর্মজীবনের পথ পার্টাতে চেয়েছি, ও ততবার আমাকে তুলে  
ধরেছে। আশা দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে, ভালবাসা দিয়েছে।  
কখনও কখনও শাসনও করেছে।

‘সবই বুঝি মেমসাহেব। কিন্তু এই কলকাতায় পরিচিত মানুষের  
দ্বারে দ্বারে আর কৃপাপ্রার্থী হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারছি না !’

মেমসাহেব স্পষ্ট বললো, কলকাতাতেই যে তোমার থাকতে  
হবে, এমন কি কথা আছে। যেখানে গিয়ে তুমি কাজ করে শাস্তি  
পাবে, সেইখানেই যাও।

এক মুহূর্ত চুপ করে ও আবার বললো, আমি তো তোমাকে  
আমার আঁচলের মধ্যে থাকতে বলি না।

মেমসাহেব জীবনে একটা লক্ষ্য ছির করেছিল। সে-লক্ষ্য ছিল আমার কল্যাণ, আমার প্রতিষ্ঠা। আর চেয়েছিল প্রাণভরে ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে।

মধ্যবিত্ত সংসারের কুমারী ঘূঁঘূরীর পক্ষে এমন অস্তুত লক্ষ্য ছির করে অগিয়ে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। মেমসাহেবের পক্ষেও সহজ হয় নি। বাধা এসেছে, বিপত্তি এসেছে, এসেছে প্রলোভন। এইত স্বৰ্বোধবাবু আমেরিকা ফেরার পর যখন ইঙ্গিত করলেন মেমসাহেবকে তাঁর বেশ পছন্দ, তখন বাড়ির অনেকই অনেক দূর এগিয়েছিলেন।

মেমসাহেব কি বলেছিল জান? বলেছিল মেজদি, মা-কে একটু বুঝিয়ে বলিস **রেডিমেড জামা-কাপড়** দেখতে একটু চক্চক করে কিন্তু বেশীদিন টেকে না, তার চাইতে ছিট কিনে মাপমত নিজের হাতে তৈরি করা জিনিস অনেক ভাল হয়, অনেক বেশী **সুন্দর হয়।**

মেজদি ইঙ্গিত বুঝেছিল। তবে আমার সঙ্গে ঘুরেফিরে বেড়ান নিয়ে মেমসাহেবের আত্মীয় মহলেও গুঞ্জন উঠেছিল। অপ্রিয় অসংযত আলোচনাও হতো মাঝে মাঝে। ও সেসব গ্রাহ করত না। ‘দেখ খোকনদা, আমি কচি মেয়ে নই। একটু-আধটু বুদ্ধিসূক্ষ্মি আমার হয়েছে। কিছু কিছু ভালমন্দও বুঝতে শিখেছি।’

সব মিলিয়ে কলকাতার আকাশটা বেশ মেঘাচ্ছম হয়ে উঠল। মেমসাহেবও ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল আর বেশীদিন কলকাতায় থাকলে ছজনেরই মাথাটা খারাপ হয়ে উঠবে।

‘ওগো, সত্যি তুমি এবার কোথাও যাবার ব্যবস্থা কর। আশপাশের কতকগুলো অপদার্থ মাঝের ভালবাসার ঠেলায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

‘আমাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে?’

‘পারব। তবে যখন যেদিন হ'জনে মিলবো, সেদিন তো আর কেউ বিরক্ত করতে পারবে না।’

আঞ্চলিক দল কেউ জানতে পারলেন না। ধীরে ধীরে আমি দিলী যাবার উদ্ঘোগ আয়োজন শুরু করলাম। গোপনে গোপনে কিছু কিছু কাগজপত্রের অফিসে গিয়ে আলোচনা করলাম। শেষে একদিন অকস্মাত এক অপ্রত্যাশিত মহল থেকে এক নগণ্য সান্তানিকের সম্পাদক বললেন, দিলীতে আমার একজন করস-পনডেট্টের দরকার। তবে এখন তো একশ’ টাকার বেশী দিতে পারব না।

কুচপরোয়া নেই। একশ’ টাকাই যথেষ্ট।

কথা দিলাম, ঠিক আছে আমি যাব।

‘কবে থেকে কাজ শুরু করবেন ?’

‘আপনি যেদিন বলেন।’

‘অ্যাজ আলি অ্যাজ ইউ ক্যান গো।’

মেমসাহেব পরের শনিবার ভোরবেলায় আমাকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে পূজা দিল, প্রসাদ দিল, নির্মাল্য দিল। ‘এই নির্মাল্যটা সব সময় কাছে রেখো।’

সঙ্ক্ষেবেলায় হজনে মিলে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে গেলাম। বেশী কথা বলতে পারলাম না কেউই।

মেমসাহেব বললো, আমার মন বলছে তোমার ভাল হবেই। আমার যদি ভালবাসার জোর থাকে, তাহলে তোমার অঙ্গল হতে পারে না।

আমি শুধু বললাম, তোমার দেওয়া নির্মাল্য আর তোমার ভালবাসা নিয়েই তো যাচ্ছি। আমার আর কি আছে বল ?

সন্ধ্যার আব্দ্বা অক্ষকার নামতে শুরু করেছিল। আমি উঠে দাঢ়িয়ে বললাম, চল এবার যাই।

ও উঠল না। বসে রইল। ডাকল, শোন।

‘বল ।’

‘কাছে এস । কানে কানে বলব ।’

কানে কানে কি বললো জান ? বললো, আমাকে একটু  
জড়িয়ে ধরে আদৰ করবে ?

আব্দা অঙ্ককার আরো একটু গাঢ় হলো । আমি হ'হাত দিয়ে  
মেমসাহেবকে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে । সমস্ত অস্তর দিয়ে,  
সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অনেক আদৰ করলাম ।

তারপর মাথায় আঁচল দিয়ে ও আমাকে প্রণাম করল ।  
‘আশীর্বাদ করো আমি যেন তোমাকে সুখী করতে পারি ।’

যুধিষ্ঠির রাজত্ব ও দ্রৌপদীকে পণ রেখে পাশা খেলেছিলেন ।  
আমার রাজত্ব ছিল না । তাই নিজের জীবন আর মেমসাহেবের  
ভাঙবাসা পণ রেখে আমি কর্মজীবনের পাশা খেলতে যুধিষ্ঠিরের  
সৃতিবিজড়িত অতীতের ইন্দ্রপ্রস্থ, বর্তমানের দিল্লী এলাম ।

## তেরো

বাঙালীর ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেক্টে চায় না বলে একদল পেশাদার অঙ্ক রাজনীতিবিদ অভিযোগ করেন। অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যা। মহেঝেদাড়ো বা হরপ্রার যুগের কথা আমি জানি না। তবে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ও মধ্যযুগে লক্ষ লক্ষ বাঙালী সমগ্র উন্নত ভারতে ছড়িয়েছেন। রঞ্জি-রোজগার করতে বাঙালী কোথাও যেতে দ্বিধা করে নি। সুন্দর রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার, সিমলা পর্যন্ত বাঙালীরা গিয়েছেন, থেকেছেন, থিয়েটার করেছেন, কালীবাড়ী গড়েছেন।

এই যাওয়ার পিছনে একটা কারণ ছিল। প্রথমতঃ বাঙালীরাই আগে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারী অফিসে বাবু হবার বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেন। সবাই যে কুইন ভিক্টোরিয়ায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে করে হাণড়া স্টেশন থেকে পাঞ্চাব মেলে চাপতেন, তা নয়। তবে রাওয়ালপিণ্ডি মিলিটারী একার্ডিন্স অফিসে কোন না কোন মেশোমশাই পিসেমশাই-এর আমন্ত্রণে অনেকেই বাংলা ত্যাগ করেছেন।

পরে বাঙালী ছেলেছোকরারা বোমা-পটক। ছুঁড়ে ইংরেজদের ল্যাজে আগুন দেবার কাজে মেতে শোয়া সরকারী চাকুরির বাজারে বাঙালীর দাম কমতে লাগল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের দিকে দিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হওয়ায় সরকারী অফিসের বাবু যোগাড় করতে ইংরেজকে আর শুধু বাংলার দিকে চাইবার প্রয়োজন হলো না। বাঙালীর বাংলার বাইরে যাবার বাজারে ভাঁটা পড়ল।

জীবনযুক্তে ধীরে ধীরে বাঙালীর পরাজয় যত বেশী প্রকাশ হতে

লাগল, মিথ্যা আসন্নানবোধ বাঙালীকে তত বেশী পেয়ে বসল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর এই আসন্নানবোধ তাকে প্রায় বাংলাদেশে বন্দী করে তুললো। বাংলাদেশের নব্য যুবসমাজ চক্রান্ত ভাঙতে পারত, গড়তে পারত নিজেদের ভবিষ্যৎ, অগ্রহ করতে পারত অনুষ্ঠির অভিশাপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা সম্ভব হলো না। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, সুচিত্রা-উত্তম, সন্ধ্যা মুখুজ্যে-শ্বামল মিস্তির, বিশু দে-সুধীন দন্ত, সত্যজিৎ-তপন সিংহ থেকে শুরু করে নানাকিছুর দৌলতে বেকার বাঙালীও চরম উত্তেজনা ও কর্মচার্থল্যের মধ্যে জীবন কাটায়। এই উত্তেজনা, কর্মচার্থল্যের মোহ আছে সত্য কিন্তু সার্থকতা করতা আছে তা ঠিক জানি না।

কলকাতায় রিপোর্টারী করতে গিয়ে বাংলাদেশের বহু মনীষীর উপদেশ পেয়েছি, পরামর্শ পেয়েছি কিন্তু পাইনি অনুপ্রেরণ। নিজেদের আসন অটুট রেখে, নিজেদের স্বার্থ বজায় রেখে তাঁরা শুধু রিস্ক নিঃস্ব বুত্তু বাঙালী ছেলেমেয়েদের হাততালি চান। সাড়ে তিন কোটি বাঙালীকে বিকলাঙ্গ করে সাড়ে তিন ডজন নেতা আনন্দে মশগুল।

উদার মহৎ মান্দ্বের অভাব বাংলাদেশে নেই। প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায়, গ্রামে-শহরে-নগরে বহু মহাপ্রাণ বাঙালী আজও রয়েছেন। কিন্তু অস্থায়, অবিচার, অসৎ-এর অরণ্যে তাঁরা হারিয়ে গেছেন।

কলকাতার এই বিচ্ছিন্ন পরিবেশে থাকতে থাকতে আমার মনটা বেশ তেঁতো হয়েছিল। আশপাশের অসংখ্য মান্দ্বের অবহেলা আর অগ্রান অসহ হয়ে উঠেছিল। সবার অজ্ঞাতে, অলক্ষ্য মন আমার বিজ্ঞাহ করত কিন্তু রাস্তা খুঁজে পেতাম না। এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে যেতাম। সমাজ-সংসার-সংস্কারের জাল থেকে নিজেকে স্ক করে বেরতে গিয়ে ভয় করত। ঘাবড়ে যেতাম।

নিজের মনের মধ্যে যে এইসব দৃষ্টি ছিল, তা মেমসাহেবকেও বলতাম না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। তাইতো নিয়তির খেলাঘরে মেমসাহেবকে নিয়ে খেলতে গিয়ে যেদিন সত্যিসত্যিই ভবিষ্যতের অঙ্ককারে ঝাঁপ দিলাম, সেদিন মুহূর্তের জন্য পিছনে ফিরে তাকাইনি। মনের মধ্যে দাউ-দাউ করে আগুন জলে উঠেছিল। হয়ত প্রতিহিংসা আমাকে আরো কঠোর কঠিন করেছিল।

আর ?

মেমসাহেবকে আর দূরে রাখতে পারছিলাম না। জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত তিলে তিলে দঞ্চ হওয়ায় দিনের শেষে রাতের অঙ্ককারে মেমসাহেবের একটু কোমল স্পর্শ পাবার জন্য মনটা সত্যি বড় ব্যাকুল হতো। জীবনসংগ্রাম কঠোর থেকে কঠোরতর হতে পারে, সে সংগ্রামে কখনও জিতব, কখনও হারব। তা হোক। কিন্তু দিনের শেষে স্বর্ধাস্তের পর কর্মজীবনের সমস্ত উৎসেজনা থেকে বহু দূরে মানসলোকের নির্জন সৈকতে বন্ধনহীন মন মুক্তি চাইত মেমসাহেবের অন্তরে।

সপ্ত দেখতাম আমি ঘরে ফিরেছি। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই আমি স্মৃচ্ছা ‘অফ’ করে দিয়ে মেমসাহেবকে অকস্মাৎ একটু আদর করে তার সর্বাঙ্গে ভালবাসার চেউ তুলেছি। ছুটি বাহুর মধ্যে তাকে বন্দিনী করে নিজের মনের সব দৈন্য দূর করেছি, সারাদিনের সমস্ত গ্লানি মুছে ফেলেছি।

মেমসাহেব আমার ছুটি বাহু থেকে মুক্তি পাবার কোন চেষ্টা করে না, কিন্তু বলে, আঃ ছাড় না।

ঐ ছুটি একটি মুহূর্তের অঙ্ককারেই মেমসাহেবের ভালবাসার জ্ঞেনারেটরে আমার মনের সব বালব্গুলো জালিয়ে নিই।

তারপর মেমসাহেবকে টানতে টানতে ডিভানের ‘পর ফেলে দিই। আমিও হৃষি খেয়ে পড়ি ওর উপর। অবাক বিশ্বয়ে ওর

ছটি চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মেমসাহেবও হির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে। অত নিবিড় করে দৃঢ়নে দৃঢ়নকে কাছে পাওয়ার দৃঢ়নেরই চোখে নেশা লাগে। সে নেশায় দৃঢ়নেই হয়ত একটু মাতলামি করি।

হয়ত বলি, জান মেমসাহেব, তোমার ঐ ছটো চোখের দিকে তাকিয়ে যখন আমার নেশা হয়, যখন আমি সমস্ত সংযম হারিয়ে মাতলামি পাগলামি করি, তখন ক্রিগের মুরাদাবাদীর একটা ‘শ্রে’ মনে পড়ে।

পাশ ফিরে আর শোয় না মেমসাহেব। চিৎ হয়ে শুয়ে দুহাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে, বল না, কোন ‘শ্রেটা’ তোমার মনে পড়ছে।

আমি এবার বলি, তেরী আঁখো কা কুছ কসুর নেহি, মুখকো খারাপ হোনা থা।...বুঝলে মেমসাহেব, তোমার চোখের কোন দোষ নেই, আমি খারাপ হতামই।

চোখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু চলচল ভাবে ও বলে, তাতো একশ’বার সত্যি ! আমি কেন তোমাকে খারাপ করতে যাব ?

আমি কানে কানে ফিসফিস করে বলি, আমার আবার খারাপ হতে ইচ্ছে করছে।

ও তিড়িং করে একলাফে উঠে বসে আমার গালে একটা ছোট্ট মিষ্টি চড় মেরে বলে, অসভ্য কোথাকার !

আরো কত কি ভাবতাম। ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হবার উপক্রম হতাম। শত-সহস্র কাজকর্ম চিষ্টা-ভাবনার মধ্যেও মেমসাহেবের ছবিটা সবসময় আমার মনের পর্দায় ফুটে উঠত। তাইতো দিল্লী আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম করেজে ইয়ে মরেঙে হয়ে অদৃষ্টের বিরক্তে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কর্মজীবনে। আর ? মেমসাহেবকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমার জীবনে।

দোলাৰ্বোদি, আমি শিবনাথ শান্তী বা বিঠাসাগৱ নই যে আঘুজীবনী লিখব। তবে বিখাস কৱ দিল্লীৰ মাটিতে পা দেৱাৱ সঙ্গে সঙ্গে আমি একেবাৱে পাপেট গিয়েছিলাম। যেদিন প্ৰথম দিল্লী স্টেশনে নামি, সেদিন একজন নগণ্যতম মানুষও আমাকে অভ্যৰ্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন না। এতবড় রাজধানীতে একটি বহু বা পৱিত্ৰ মানুষ খুঁজে পাইনি। একটু আশ্রয়, একটু সাহায্যেৰ আশা কৱতে পারিনি কোথাও। দিল্লীৰ প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মে ও শৈতে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে আমি যে কিভাবে ঘুৱে বেড়িয়েছি তা আজ লিখতে গেলেও গা শিউৱে ওঠে। কিন্তু তবুও আমি মাথা নীচু কৱিনি।

একটি বছৱেৱ মধ্যে রাতকে দিন কৱে ফেললাম। শুধু মনেৱ জোৱ আৱ নিষ্ঠা দিয়ে অনুষ্ঠৈৰ মোড় ঘূৱিয়ে দিলাম। পার্লামেন্ট হাউস বা সাউথ ব্লকেৱ এক্সটারন্যাল অ্যাক্ফেয়ার্স মিনিস্ট্ৰী থেকে বেলন্বাৱ মুখে দেখা হলে স্বয়ং প্ৰাইম মিনিস্টাৱ আমাকে বলতেন, হাউ আৱ ইউ ?

আমি বলতাম, ফাইন, ধ্যাক্ষ ইউ স্থাৱ !

তুমি ভাবছহয়ত গুল মাৱছি। কিন্তু সত্যি বলছি এমনিই হতো। একদিন আমাৱ সেই অতীতেৰ অখ্যাত উইকলিৱ একটা আর্টিকেল দেখাৰাৰ জন্য তিনমূৰ্তি ভবনে গিয়েছিলাম। আর্টিকেলটা দেখাৰাৰ পৱ প্ৰাইম মিনিস্টাৱ জিজাসা কৱলেন, আৱ ইউ নিউ টু দেলহি ?

‘ইয়েস স্থাৱ !’

‘কবে এসেছ ?’

‘এইত মাস চাৱেক !’

তাৱপৱ যখন শুনলেন আমি ঐ অখ্যাত উইকলিৱ একশ ‘টাকাৱ চাকৱি নিয়ে দিল্লী এসেছি, তখন প্ৰশ্ন কৱলেন, আৱ ইউ টেলিং এ লাই ?

‘নো স্থাৱ !’

‘এই মাইনেতে দিল্লীতে টি’কতে পারবে ?’

‘সাটেরলি স্থার !’

শেষে আইম মিনিস্টার বলেছিলেন, গুড লাক টু ইউ। সৌ মী  
ফ্রম টাইম টু টাইম।

দেখতে দেখতে কত অসংখ্য মাঝুরের সঙ্গে পরিচয় হলো,  
ঘনিষ্ঠতা হলো। কত মাঝুরের ভালবাসা পেলাম। কত অফিসার,  
কত এম-পি, কত মিনিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। নিয়-  
নতুন নিউজ পেতে শুরু করলাম। উইকলি থেকে ডেইলীতে  
চাকরি পেলাম।

আমি দিল্লীতে আসার মাসকয়েকের মধ্যেই মেমসাহেব একবার  
দিল্লী আসতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, না এখন নয়। একটি  
মুহূর্ত নষ্ট করাও এখন ঠিক হবে না। আমাকে একটু দাঢ়াতে দাও,  
একটু নিঃখাস ফেলার অবকাশ দাও। তারপর এসো।

তাবতে পার মুহূর্তের জন্য যে মেমসাহেবের স্পর্শ পাবার আশায়  
প্রায় কাঙালের মত ঘুরেছি, সেই মেমসাহেবকে আমি দিল্লী  
আসতে দিইনি। মেমসাহেব রাগ করে নি। সে উপজর্কি করেছিল  
আমার কথা। চিঠি পেলাম—

ওগো, কি আশ্চর্যভাবে তুমি আমার জীবনে এলে, সেকথা  
তাবলেও অবাক লাগে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির জীবনে, সোশ্যাল—  
রিইউনিয়ন বা রবীন্দ্রজয়ন্তী-বসন্তোৎসবে কত ছেলের সঙ্গে আলাপ-  
পরিচয় হয়েছে। কাউকে ভাল লেগেছে, কাউকে ভাল লাগে নি।  
হ’একজন হয়ত আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। আশুতোষ বিল্ডিং-এর  
ঝি কোণার ঘরে গান-বাজনার রিহার্সাল দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে  
মদন চৌধুরী হঠাতে আমার ডান হাতটা চেপে ধরে ভালবাসা  
জানিয়েছে। বিয়ে করতেও চেয়েছে। তালতলার ঘোড়ের সেই  
যে ভাবভোলা দেশপ্রেমিক, তিনিও একদিন আঞ্চনিকেন করেছিলেন  
আমাকে।

মুহূর্তের জন্য চমকে গেছি কিন্তু থমকে দাঢ়াই নি। তারপর যেদিন তুমি আমার জীবনে এলে, সেদিন কে যেন আমার সব শক্তি কেড়ে নিল। কে যেন কানে কানে ফিসফিস করে বলল, এই সেই!

তুমি তো জান আমি আর কোনদিকে ফিরে তাকাই নি। শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি। তোমাকে আমার জীবনদেবতার আসরে বসিয়ে পূজা করেছি, নিজের সর্বশ কিছু দিয়ে তোমাকে অঞ্চলি দিয়েছি। মন্ত্র পড়ে, যজ্ঞ করে সর্বসমক্ষে আমাদের বিয়ে আজও হয় নি। কিন্তু আমি জানি তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার ত্বিষ্ণুৎ সন্তানের পিতা।

মেমসাহেব বেশী কথা বলত না কিন্তু খুব শুন্দর বড় বড় চিঠি লিখতে পারত। এই চিঠিটাও অনেক বড়। সবটা তোমাকে লেখার প্রয়োজন নেই। তবে শেষের দিকে কি লিখেছিল জান? লিখেছিল—‘...তুমি যে এমন করে আমাকে চমকে দেবে, আমি ভাবতে পারিনি। তেবেছিলাম ঘুরে-ফিরে একটা কাগজে চাকরি যোগাড় করবে। কিন্তু এই সামান্য ক’মাসের মধ্যে তুমি এমন করে নিজেকে দিল্লীর মত অপরিচিত শহরে এত বড় বড় রথীমহারথীদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, সত্যি আমি তা কল্পনা করতে পারিনি। তোমার মধ্যে যে এতটা আগুন লুকিয়ে ছিল, আমি তা বুঝতে পারিনি।...’

যাই হোক তোমার গর্বে আমার সারা বুকটা ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে আমার চাইতে সুখী স্ত্রী আর কেউ হতে পারবে না। আমি সত্যি বড় খুশী, বড় আনন্দিত। তোমার এই সাফল্যের জন্য তোমাকে একটা বিরাট পুরস্কার দেব। কি দেব জান? যা চাইবে তাই দেব। বুঝলে? আর কোন আপত্তি করব না। আর আপত্তি করলে তুমিই বা শুনবে কেন?...’

দোলাবৌদি, তুমি কল্পনা করতে পার মেমসাহেবের ঐ চিঠি পড়ে

আমাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হলো ? প্ৰথমে ভেবেছিলাম ছ'একদিনেৰ  
জন্য কলকাতা যাই । মেমসাহেবেৰ পুৱনুৰাব নিয়ে আসি । কিন্তু  
কাজকৰ্ম পয়সাকড়িৰ হিসাবনিকাশ কৰে আৱ যেতে পাৱলাম না ।

তবে মনে মনে এই ভেবে শাস্তি পেলাম যে আমাকে বঞ্চিত  
কৰে কৃপণেৰ মত অনেক ঐশ্বৰ্য ভবিষ্যতেৰ জন্য অঙ্গায়ভাবে গচ্ছিত  
ৱেখে মেমসাহেবেৰ মনে অহুশোচনা দেখা দিয়েছে । আমি হাজাৰ  
মাইল দূৰে পালিয়ে এসেছিলাম । মেমসাহেব সেই আদৱ, ভাল-  
বাসা, সেই মজা, বসিকতা কিছুই উপভোগ কৱছিল না । আমাকে  
যতই বাধা দিক, আমি জানতাম রোজ আমাৰ একটু আদৱ না  
পেলে ও শাস্তি পেত না । আমি বেশ অমূমান কৱছিলাম ওৱ কি  
কষ্ট হচ্ছে ; উপলক্ষি কৱছিলাম আমাকে কাছে না পাৰাৰ অতুল্পি  
ওকে কিভাবে পীড়া দিচ্ছে ।

মনে মনে অনেক কষ্ট পেলেও ওৱ আসাটা বন্ধ কৰে ভালই  
কৱেছিলাম । দিল্লীতে আসাৰ জন্য ও যে বেশ উত্তলা হয়েছিল  
সেটা বুৰুতে কষ্ট হয় নি । তাইতো আৱো তাড়াতাড়ি নিজেকে  
প্ৰস্তুত কৱবাৰ জন্য আমি সৰ্বশক্তি নিয়োগ কৱলাম । ঠিক কৱলাম  
ওকে এনে চমকে দেব ।

ভগবান আমাকে অনেকদিন বঞ্চিত কৰে অনেক কষ্ট দিয়েছেন ।  
হংখে অপমানে বছৰেৰ পৱ বছৰ জলেপুড়ে মৱেছি । কলকাতাৰ  
শহৱে এমন দিনও গেছে যখন মাত্ৰ একটা পয়সাৰ অভাবে সেকেণ্ঠ  
ক্লাস ট্ৰামে পৰ্যন্ত চড়তে পাৱিনি । কিন্তু কি আশৰ্য ! দিল্লীতে  
আসাৰ পৱ আগেৰ সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল । সে  
পৱিবৰ্তনেৰ বিস্তৃত ইতিহাস তোমাৰ এই চিঠিতে লেখাৰ নয় ।  
সুযোগ পেলে পৱে শোনাৰ । তবে বিশ্বাস কৱ অবিশ্বাস্য পৱিবৰ্তন  
এলো আমাৰ কৰ্মজীবনে । সাফল্যেৰ আকঞ্চিক বন্ধায় আমি  
নিজেকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম ।

মাস ছয়েক পৱে মেমসাহেব যখন আমাকে দেখবাৰ জন্য দিল্লী

এলো, তখন আমি সবে বোর্ডিং হাউসের মাঝা কাটিয়ে ওয়েস্টার্ন কোর্টে এসেছি। নিশ্চিত জ্ঞানতাম মেমসাহেবে আমাকে দেখে, ওয়েস্টার্ন কোর্টে আমার ঘর দেখে, আমার কাজকর্ম, আমার জীবন-ধারা দেখে চমকে যাবে। কিন্তু আমি চমকে দেবার আগেই ও আমাকে চমকে দিল।

নিউদিল্লী স্টেশনে গেছি ডিল্যুক্স এয়ার কণ্ঠশন্ত এক্সপ্রেস অ্যাটেণ্ড করতে। মেমসাহেব আসছে। জীবনের এক অধ্যায় শেষ করে নতুন অধ্যায় শুরু করার পর ওর সঙ্গে এই প্রথম দেখা হবে

লাউডস্পীকারে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, এ-সি-সি এক্সপ্রেস এক্সুনি একনম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌছবে। আমি সানগ্লাসটা খুলে কুমাল দিয়ে মুখটা আর একবার মুছে নিলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে ত্ব'একটা টান দিতে না দিতেই ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে চুকে পড়ল। এদিক-ওদিক দেখতে না দেখতেই মেমসাহেব ছ' নম্বর চেয়ার কার থেকে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু একি? মেমসাহেবের কি বিয়ে হয়েছে? এত সাজ-গোছ? এত গহনা? মাথায় কাপড়, কপালে অতবড় সিঁহুরের টিপ।

মেমসাহেবকে কোনদিন এত সাজগোছ করতে দেখিনি। গহনা? শুধু ডানহাতে একটা কঙ্গ। ব্যাস, আর কিছু না। গলায় হার? না, তাও না। কোন এক বন্ধুর বিপদে সাহায্য করার জন্য গলায় হার দিয়েছেন। তাছাড়া মাথার কাপড় আর কপালে অতবড় একটা সিঁহুরের টিপ দেখে অবাক হবার চাইতে ঘাবড়ে গেলাম বেশী। মুহূর্তের জন্য পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে গেল। গলাটা শুকিয়ে এলো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। তুনিয়াটা ওলট-পালট হয়ে গেল।

প্রথমে ভাবলাম স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ঐ কয়েক হাজার লোকের

সামনে ওর গালে ঠাস করে একটা চড়. মারি। বলি, আমাকে  
অপমান করবার জন্য এত দূরে না এসে শুধু ইনভিটেশন লেটারটা  
পাঠালেই তো হতো !

আবার ভাবলাম, না, ওসব কিছু করব না, বলব না।

বিশেষ কথাবার্তা না বলে সোজা গিয়ে ট্যাঙ্কি চড়লাম।

ট্যাঙ্কিতে উঠেই মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করল। আমার  
বাঁ হাতটা টেনে নিল নিজের ডান হাতের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করল,  
কেমন আছ ?

‘আমার কথা ছেড়ে দাও। এখন বল তুমি কেমন আছ ?  
তোমার বিয়ে কেমন হলো ? বর কেমন হলো ? সর্বোপরি তুমি  
দিল্লী এলে কেন ?’

মেমসাহেব একেবারে গলে গেল, সত্যি বলছি, তুমি আমাকে  
ক্ষমা কর। এমন হঠাত সবকিছু হয়ে গেল যে কাউকেই খবর,  
দেওয়া হয় নি । . . .

‘ছেলেটি কেমন ?’

বেশ গর্বের সঙ্গে উত্তর এলো, ব্রিলিয়ান্ট !

‘কোথায় থাকেন ?’

‘এইত তোমাদের দিল্লীতেই।’

আমি চমকে উঠি, দিল্লীতে ?

ও আমার গালটা একটু টিপে দিয়ে বলে, ইয়েস স্নার ! তবে  
কি আমার বর আদি সপ্তগ্রাম বা মছলব্দপুর থাকবে ?

ট্যাঙ্কি কনটপ্লেস ঘুরে জনপদে ঢুকে পড়ল। আর এক মিনিটের  
মধ্যেই ওয়েস্টার্ন কোর্ট এসে যাবে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন  
কোথায় যাবে ?

‘কোথায় আবার ? তোমার শুধানে !’

ট্যাঙ্কি ওয়েস্টার্ন কোর্টে ঢুকে পড়ল। থামল। আমরা নামলাম।  
তাড়া মিটিয়ে ছোট স্টকেস্টা হাতে করে ভিতরে ঢুকলাম।

ରିସେପ୍ଶନ ଥେକେ ଚାବି ନିଯେ ଲିଫ୍ଟ-ଏ ଚଡ଼ଳାମ । ତିନ ତଳାମ୍ ପେଲାମ । ଆମାର ସରେ ଏଲାମ ।

ମାଥାର କାପଡ଼ ଫେଲେ ଦିଯେ ହୁହାତ ଦିଯେ ମେମସାହେବ ଆମାକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ବଲଲ, ଆଃ କି ଶାନ୍ତି !

ଆମାର ବୁକଟୀ ଜଳେ ଉଠେଛିଲ । କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ଥେମେ ଗେଲ । ଓର ସିଥିଁତେ ସିଂହର ନା ଦେଖେ ବୁଝଲାମ...

ଏବାର ଆମିଓ ଆର ହିର ଥାକତେ ପାରଲାମ ନା । ହୁହାତ ଦିଯେ ଟେନେ ନିଲାମ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ । ଆଦର କରେ, ଭାଲବାସା ଦିଯେ ଓକେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରେ ଦିଲାମ ଆମି । ମେମସାହେବଙ୍କ ତାର ଉନ୍ନତ ଘୋବନେର ଜୋଯାରେ ଆମାକେ ଅମେକ ଦୂର ଭାସିଯେ ନିଯେ ଗେଲ । ଆମାର ଦେହେ, ମନେ ଓର ଭାଲବାସା, ଆବେଗ ଉଚ୍ଛଳତାର ପଲିମାଟି ମାଖିଯେ ଦିଯେ ଗେଲ । ଆମାର ମନ ଆରୋ ଉର୍ବରା ହଲୋ ।

ଏତଦିନ ପରେ ଦୁଜନକେ କାହେ ପେଯେ ପ୍ରାୟ ଉନ୍ନାଦ ହୟେ ଉଠେଛିଲାମ । କତକ୍ଷଣ ଯେ ଏହି ଜୋଯାରେର ଜଳେ ଡୁବେଛିଲାମ, ତା ମନେ ନେଇ । ତବେ ସହିତ ଫିରେ ଏଲୋ, ଦରଜାଯ ନକ୍ କରାର ଆଓୟାଜ ଶୁଣେ ।

ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଦୁଜନେ ଆଲାଦା ହୟେ ବମ୍ବାମ । ଆମି ବଲଲାମ, କୋନ ?

‘ଛୋଟା ସାବ, ମ୍ୟାରଁ ।’

ଓ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ, କେ ?

ଆମି ବଲଲାମ, ଗଜାନନ ।

ଉଠେ ଗିଯେ ଦରଜା ଖୁଲେ ଡାକ ଦିଲାମ, ଏସୋ, ଭିତରେ ଏସୋ ।

ମେମସାହେବକେ ଦେଖେଇ ଗଜାନନ ହୁହାତ ଜୋଡ଼ କରେ ପ୍ରଣାମ କରଲ, ନମସ୍କେ ବିବିଜି !

ଓ ଏକଟୁ ହାସଲ । ବଲଲ, ନମସ୍କେ ।

ଆମି ବଲଲାମ, ‘ଗଜାନନ, ବିବିଜିକେ କେମନ ଲାଗଛେ ?’

‘ବହୁ ଆଛା, ଛୋଟା ସାବ ।’ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆବାର ବଲଲ, ଆମାର ଛୋଟ-ସାହେବେର ବିବି କଥନଙ୍କ ଖାରାପ ହତେ ପାରେ ?

আমরা ছজনেই হেসে ফেলি। মেমসাহেব বলল, গজানন,  
বাবুজি প্রত্যেক চিঠিতে তোমার কথা লেখেন।

গজানন ছ'হাত কচলে বলে, ছোটসাবকা মেহেরবানি।

আমি উঠে গিয়ে গজাননের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলি,  
জান মেমসাহেব, গজানন আমার লোক্যাল বস্ত। আমার  
গার্ডিয়ান !

‘কিয়া করেগা বিবিজি, বাতাও। ছোটসাব এমন বিক্রী কাজ  
করে যে কোন সময়ের ঠিক ঠিকানা নেই। তারপর কিছু সংসারী  
বুদ্ধি নেই। আমি না দেখলে কে দেখবে বল ? গজানন প্রায়  
খুনী আসামীর মত ভয়ে ভয়ে জেরার জবাব দেয়।

গজানন এবার মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করে, বিবিজি, ট্রেনে  
কোন কষ্ট হয় নি তো ?

গজানন চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিটের  
মধ্যেই আমাদের ছ'জনের ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসে। ব্রেকফাস্টের  
ট্রে নামিয়ে রেখে গজানন চলে যায়, আমি যাচ্ছি। একটু পরেই  
আসছি।

গজানন চলে যাবার পর আমি মেমসাহেবের কোলে শুয়ে  
পড়লাম। আর ও আমাকে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিতে লাগল।

দোলাবৌদি, মেমসাহেব আর আমি অনেক কাণ্ড করেছি।  
বাঙালী হয়েও প্রায় হলিউড ফিল্মে অভিনয় করেছি। শেষপর্যন্ত  
অবশ্য শরৎ চাটুজ্জ্যের ‘হিট’ বই-এর মত হয়ে গেছে। আস্তে,  
আস্তে, ধীরে ধীরে সব জানবে। বেশী ব্যস্ত হয়ো না।

## চৌল্দ

মেমসাহেবের দিল্লীবাসের প্রতিটি মুহূর্তের কাহিনী জানবার জন্য তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে উঠেছ। মেমসাহেব কি বলল, কি করল, কেমন করে আদর করল, কোথায় কোথায় ঘুরল ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার রকমের প্রশ্ন তোমার মনে উদয় হচ্ছে। তাই না? হবেই তো। শুধু তুমি নও, সবারই হবে।

আমি সবকিছুই তোমাকে জানাব। তবে প্রতিটি মুহূর্তের কাহিনী লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের সম্পর্ক এমন একটা স্তরে পেঁচেছিল যে, ইচ্ছা থাকলেও সবকিছু লেখা যায় না। তোমাকে কিছুটা অশুমান করে নিতে হবে। তাছাড়া মাঝুমের জীবনের ঐ বিচিত্র অধ্যায়ের সবকিছু কি ভাষা দিয়ে লেখা যায়?

বেলা এগারটার সময় ব্রেকফাস্ট খেয়ে দু'ঘণ্টা ধরে বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে দুজনে কত কি করেছিলাম! কখনও ও আমাকে কাছে টেনেছে, কখনও বা আমি ওকে টেনে নিয়েছি আমার বুকের মধ্যে। কখনও আমি ওর ওপ্পে বিষ ঢেলেছি, কখনও বা আমার ওপ্পে ভালবাসা ঢেলেছে। কখনও আবার দু'জনে দু'জনকে দেখেছি প্রাণভরে। সে-দেখা যেন শুভদৃষ্টির চাইতেও অনেক মিষ্টি, অনেক শ্বরণীয় হয়েছিল।

. আমি বললাম, কতদিন বাদে তোমাকে দেখলাম! সারাজীবন ধরে দেখলেও আমার সে-লোকসান পূরণ হবে না।

আমার বুকের 'পর মাথা রেখে শুয়ে শুয়েই ও একটু হেসে শুধু বললো, 'তাই বুঝি?'

'তবে কি?'

বন-হরিণীর মত মুহূর্তের মধ্যে মেমসাহেবের চোখের দৃষ্টিটা

একটা ঘূরপাক দিয়ে আকাশের কোলে ভেসে বেড়াল কিছুক্ষণ।  
একটু পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি কিন্তু তোমাকে  
রোজ দেখতে পেতাম।

আমি চমকে উঠলাম, তার মানে ?

ও একটু হাসল ! তু' হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে  
প্রায় মুখের 'পর মুখ দিয়ে বললো, সত্য তোমাকে রোজ দেখেছি।

এবার আর চমকে উঠিলি। হাসলাম। বললাম, কেন আজে-  
বাজে বকছ ?

'আজে-বাজে নয় গো আজে-বাজে নয়। রোজ সকালে  
কলেজে বেরবার পথে রাসবিহারীর মোড়ে এলেই মনে হতো তুমি  
দাঢ়িয়ে আছ, ইশারায় ডাকছ। তারপর আমরা চলেছি এসপ্লানেড,  
ডালহৌসী, হাওড়া।'

এবার মেমসাহেব উবুড় হয়ে শুয়ে ছমড়ি খেয়ে পড়ল আমার  
মুখের 'পর। 'বিকেলবেলায় ফেরার পথে তোমাকে যেন আরো  
বেশী স্পষ্ট করে দেখতে পেতাম। মনে হতো তুমি রাইটার্স বিল্ডিং-  
এর ডিউটি শেষ করে কোনদিন ডালহৌসী ক্ষায়ারের কোণায়,  
কোনদিন লাটসাহেবের বাড়ির ওপাশে দাঢ়িয়ে আছ !'

এবার যেন হঠাত মেমসাহেব কেঁদে ফেলল। 'ওগো, বিশ্বাস  
কর, কলেজ থেকে ফেরবার পর বিকেল-সন্ধ্যা যেন আর কাটিতে  
চাইত না...'

আমি চট করে গন্তব্য করলাম, রাত্রিটা বৃক্ষ মহাশাস্তিতে  
কাটাতে ?

হঠাত যেন লজ্জায় ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমার মুখের  
পাশে মুখটা লুকাল। আমি জানতে চাইলাম, কি হলো ?

মুখ তুলল না। মুখ গঁজে রেখেই ফিসফিস করে বললো, কিছু  
বলব না।

'কেন ?'

‘তোমার ডাঁটি বেড়ে যাবে ।’

‘ঠিক আছে। আমার কাছ থেকেও তুমি কিছু জানতে পারে না। তাছাড়া তোমার প্রাণের বন্ধু জয়া কি করেছিল, কি বলেছিল, সেসব কিছু তোমাকে বলব না ।’

মেমসাহেব আর স্থির থাকতে পারে না। উঠে বসল। আমার হাতছ’টো ধরে বললো, গুগো, বল না, কি হয়েছিল।

আমি মাথা নেড়ে গাইলাম, ‘কিছু বলব বলে এসেছিলেম, রইমু চেয়ে না বলে ।’

প্রথমে খুব বীরহৃ দেখিয়ে মেমসাহেব গাইল, ‘আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে ।’

আমি হাসতে হাসতে বললাম, খুব ভাল কথা। অত যখন বীরহৃ, তখন জয়ার কথা শুনে কি হবে ?

আমার সোল প্রোপাইটার-কাম-ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ঘাবড়ে গেল। বোধহয় ভাবল, জয়া এই উঠতি বাজারে শেয়ার কিনে ভবিষ্যতে বেশ কিছু মুনাফা লুঠতে চায়। হয়ত আরো শেয়ার কিনে শেষপর্যন্ত অংশীদার থেকে—

ও প্রায় আমার বুকের ’পর লুটিয়ে পড়ল। ‘বল না গো, জয়া কি করেছে ?’ এক সেকেণ্ট চুপ করে থেকে আবার বললো, জয়া আমার বন্ধু হলে কি হয় ! আমি জানি ও স্মৃতিধের মেয়ে নয়, ও সবকিছু করতে পারে।

জান দোলাবৌদি, জয়া আমাকে কিছুই করে নি। তবে ও একটু বেশী স্মার্ট, বেশী মডার্ন। তাছাড়া বড়লোকের আছরে মেয়ে বলে বেশ ঢলচল ভাব আছে। আমার মত ছোকরাদের সঙ্গে আজ্ঞা দিতে বসলে জয়ার কোন কাণ্ডজান থাকে না। হাসতে হাসতে হয়ত ছ’হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, হয়ত কাঁধে মাথা রেখেই হিঃ হিঃ করতে লাগল। মেমসাহেব এসব জানে।

একবার আমি, মেমসাহেব আর জয়া ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট  
বেড়াতে গিয়ে কি কাণ্ডটাই না হলো ! হি-হি হা-হা করে হাসতে  
হাসতে জয়ার বুকের কাপড়টা পাশে পড়ে গিয়েছিল । মেমসাহেব  
হ' একবার ওকে ইশারা করলেও ও কিছু গাহ করল না । রাগে  
হজগজ করছিল মেমসাহেব কিন্তু কিছু বলতে পারল না । আমি  
অবস্থা বুঝে চট করে উঠে একটু পায়চারি করতে করতে জয়ার  
পিছন দিকে চলে গেলাম । তারপর দেখি মেমসাহেব জয়ার আঁচল  
ঠিক করে দিল ।

কলকাতা ফিরে মেমসাহেব আমাকে বলেছিল, এমন অসভ্য  
মেরে আর দেখিনি !

দিল্লীতে জয়ার ছোটকাকা হোম মিনিস্ট্রি টেপুটি সেক্রেটারী  
ছিলেন । তাইতো মাঝে মাঝেই দিল্লী বেড়াতে আসত ।  
মেমসাহেব হয়ত ভাবল না জানি ওর অমৃপস্থিতিতে জয়া আরো  
কি করছে ।

জয়ারা এর মধ্যে হ'বার দিল্লী এলেও আমার সঙ্গে একবারই  
দেখা হয়েছিল । তাও বেশীক্ষণের জন্য নয় । আর সেই স্বল্প  
সময়ের মধ্যে জয়া আমার পবিত্রতা নষ্ট করবার কোন চেষ্টাও  
করে নি ।

শুধু শুধু মেমসাহেবকে ঘাবড়ে দেবার জন্য জয়ার কথা বললাম ।  
রিপোর্টার হলেও হঠাৎ পলিটিসিয়ান হয়ে মেমসাহেবের সঙ্গে  
একটু পলিটিক্স করলাম । কাজ হলো ।

শৰ্ত হলো মেমসাহেব আগে সবকিছু বলবে, পরে আমি জয়ার  
কথা বলব ।

বেল বাজিয়ে গজাননকে তলব করে ছক্কুম দিলাম, হাফ-সেট  
চায় সেআও ।

গজানন মেমসাহেবের কাছে আর্জি জানাল, বিবিজি, ছোটসাবকা  
চায় পিনা থোড়ি কমতি হোনা চাইয়ে ।

মেমসাহেব একবার আমাকে দেখে নিয়ে গজাননকে বললো,  
তোমার ছোটসাব আমার কিছু কথা শোনে না।

‘ওর কথা শুনে মেহাতুর বৃক্ষ গজাননও হেসে ফেলল। ‘এ-কথা  
ঠিক না বিবিজি ছোটসাব চবিশ ঘণ্টা শুধু তোমার কথাই  
বলে।’

‘গজানন, তুমিও তোমার ছোটসাব-এর পাল্লায় পড়ে মিথ্যা  
কথা বল।’

গজানন জিভ কেটে বললো, ভগবান কা কসম বিবিজি, ঝুট  
আমি কক্ষনো বলব না।

মেমসাহেব হাসল, আমি হাসলাম।

গজানন বললো, যদি তোমার গুস্মা না হয়, তাহলে তোমাকে  
একটা কথা বলতাম।

মেমসাহেব বললো, তোমার কথায় আমি কেন রাগ করব ?

‘ছোটসাব তোমাকে ভীষণ প্যার করে।’

‘কি করে বুঝলে ?’ মেমসাহেব জেরা করে।

গজানন হাসল। বললো, বিবিজি, আমি তোমাদের আংরেজি  
পড়িনি। তোমাদের মত আমার দিমাগ নেই। এই দিল্লীতে  
ଆয় পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল। অনেক বড় বড় লোক দেখলাম  
কিন্তু হামারা ছোটসাব-এর মত লোক খুব বেশী হয় না।

আমি গজাননকে একটা দাবড় দিয়ে বলি, যা, ভাগ। চা নিয়ে  
আয়।

গজানন চা আনল। চলে যাবার সময় আমি বললাম, গজানন,  
কিছু টাকা রেখে যেও।

গজানন চোখ দিয়ে মেমসাহেবকে ইশারা করে বললো, হাঁগো  
বিবিজি, টাকা দেব নাকি ?

আমি উঠে গজাননকে একটা থাঙ্গড় মারতে গেলেই ও দৌড়  
দিল।

চা খেতে খেতে মেমসাহেব কি বলল জান ? বলল অনেক  
কিছু ।

একদিন সকালে উঠে মেজদি ওকে বলল, আমি আর পারছি  
না ।

মেমসাহেব জানতে চাইল, কি পারছিস না রে ?

‘প্রকৃসি দিতে ?’

‘কিসের প্রকৃসি ? কার প্রকৃসি ?’

‘কার আবার ? রিপোর্টারের ?’

মেমসাহেব বলল, অসভ্যতা করবি না মেজদি । মনে মনে  
কিন্তু সত্যি একটু চিন্তিতা হলো ।

একটু পরে একটু ফাঁকা পেয়ে মেমসাহেব মেজদিকে ধরল ।  
‘হারে কি হয়েছে রে ?’

মেজদি দুর কথাকষি করে, যা চাইব তাই দিবি বল ।

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নিল মেমসাহেব । দাঁত  
দিয়ে ঠোঁটটা একটু কামড়ে ভ্র কুঁচকে এক মুহূর্তের জন্য ভেবে নিল ।  
‘ঠিক আছে যা চাইবি তাই দেবে ।’

মেজদি ওস্তাদ মেয়ে । কাঁচা কাজ করবার পাত্রী সে নয় ।  
তাই গ্যারান্টি চাইল । ‘মা কালীর ফটো ছুঁয়ে প্রতিষ্ঠা কর, আমি  
যা চাইব তাই দিবি ।’

ও ঘাবড়ে যায় । একবার ভাবে মেজদি ঠকিয়ে কিছু আদায়  
করবে । আবার ভাবে, না, না, কিছু দিয়েও থবরটা জানা দরকার ।  
মেমসাহেবের দোটানা মন শেবপর্যন্ত মেজদির ফাঁদে আটকে যায় ।  
মা কালীর ফটো ছুঁয়েই প্রতিষ্ঠা করল, আমাকে সবকিছু খুলে  
বললে তুই যা চাইবি, তাই দেব ।

মেজদি ওকে টানতে টানতে ঝি কোণার ছোট বসবার ঘরে  
নিয়ে দরজা আটকে দেয় । মেমসাহেবের বুকটা চিপটিপ করে । গোল  
টেবিলের পাশ থেকে দুটো চেয়ার টেনে দুজনে পাশাপাশি বসল ।

মেজদি শুন্দি করল, রাস্তিয়ে তুই কি করিস, কি বকবক করিস,  
তা জানিস ?

‘কি করি রে মেজদি ?’

‘কি আর করবি ? আমাকে রিপোর্টার ভেবে কত আদর  
করিস, তা জানিস ?’

লজ্জায় আমার কালো মেমসাহেবের মুখও লাল হয়েছিল।  
বলেছিল, যা যা, বাজে বকিস না।

মেজদি সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঢ়িয়ে বলে, ঠিক আছে।  
না শুনতে চাস, ভাল কথা।

ও তাড়াতাড়ি মেজদির হাত ধরে বসিয়ে দেয়, আচ্ছা যা বলবি  
বল।

‘তোর আদরের চোটে তো আমার প্রাণ বেঙ্গবার দায়  
হয়।’...

‘কেন মিথ্যে কথা বলছিস ?’

মেজদি মুচকি হাসতে হাসতে বললো, মা কালীর ফটো ছুঁয়ে  
বলব ?

‘না, না, আর মা কালীর ফটো ছুঁয়ে বলতে হবে না।’

‘শুধু কি আদর ? কত কথা বলিস !’

‘যুমিয়ে ? যুমিয়ে ?’

মেজদি মুচকি হেসে বলল, ‘আজে হ্যাঁ। বিশ্বাস না হয় মাকে  
জিজ্ঞাসা কর।’

‘মা শুনেছে ?’ মেমসাহেব চমকে ওঠে।

‘একদিন তো ডেফিনিট শুনেছে, হয়ত রোজই শোনে।’

ও তাড়াতাড়ি মেজদির হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল, কি  
কথা বলেছি রে ?

নিলিপ্তভাবে মেজদি উত্তর দিল তুই ওকে যা যা বলে আদর  
করিস, তাই বলেছিস। আবার কি বলবি ?

সোফায় বসে সেন্টার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে আমরা গল করছিলাম। মেমসাহেব ডান হাত দিয়ে আমার মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল, দেখেছ, ঘুমিয়েও তোমাকে ভুলতে পারি না।

একটু চূপ করে এবার ফিসফিস করে বলল, দেখেছ, তোমাকে কত ভালবাসি!

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে এক গাল ধুঁয়া ছেড়ে বললাম, ঘোড়ার ডিম ভালবাস। যদি সত্যি সত্যিই ভালবাসতে, তাহলে আজও মেজদি তোমার পাশে শোবার সাহস পায়?

মেমসাহেব আমাকে ভেংচি কেটে বলল, শুভে দিচ্ছি আর কি!

এবার আমি ওর কানে কানে বললাম, আজ তো আমার হাতে লাটাই। আজ কোথায় উড়ে যাবে? তাছাড়া আজ তো তুমি আমাকে পুরস্কার দেবে।

‘পুরস্কার?’

‘সেই যে—যা চাইবে, তাই পাবে—পুরস্কার!’

মেমসাহেব আমার পাশ থেকে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি আজই কলকাতা পালাচ্ছি।

নাটকের এই এক চরম শুরুত্পৃষ্ঠ মুহূর্তে আবার গজাননের আবির্ভাব হলো। বেশ মেজাজের সঙ্গে বলল, ছটো বেজে গেছে। তোমরা কি সারাদিনই গঞ্জ-গঞ্জব করবে? খাওয়া-দাওয়া করবে না?

ছ’টো বেজে গেছে? ছ’জনেই এক সঙ্গে ঘড়ি দেখে তীব্র লজ্জিত বোধ করলাম। গজাননকে বললাম, লাঞ্চ নিয়ে এস। দশ মিনিটে আমরা স্নান করে নিচ্ছি।

দিল্লীতে আমাদের বৈত জীবনের উদ্বোধন সঙ্গীত কেমন লাগল? মনে হয় খারাপ লাগে নি। আমারও বেশ লেগেছিল।

অনেক হংখ কষ্ট, সংগ্রামের পর এই আনন্দের অধিকার অর্জন করেছিলাম। তাইতো বড় মিষ্টি লেগেছিল এই আনন্দের আত্মপ্রিয় আনন্দানন্দ।

মেজদিকে ম্যানেজ করে কলেজ থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে ও আমার কাছে এসেছিল। এসেছিল অনেক কারণে, অনেক প্রয়োজনে। সমাজ-সংস্কারের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করে একটু মিশতে চেয়েছিলাম আমরা তবেই। মেমসাহেবের দিল্লী আসার কারণ ছিল সেই মুক্তির স্বাদ, আনন্দ উপভোগ করা।

আরো অনেক কারণ ছিল। শৃঙ্খলার মধ্যে তবেই অনেক দিন ভেসে বেড়িয়েছিলাম। তবেই মন চাইছিল একটু নিরাপদ আশ্রয়। সেই আশ্রয়, সেই সংসার বাঁধার জন্য অনেক কথা বলবার ছিল। তবেই মনে মনে অনেক কল্পনা আর পরিকল্পনা ছিল। সেসব সম্পর্কেও কথাবার্তা বলে একটা পাকা সিদ্ধান্ত নেবার সময় হয়েছিল।

যাই হোক এক সপ্তাহ কোন কাজকর্ম করব না বলে আমিও ছুটি নিয়েছিলাম। প্রতিষ্ঠা করেছিলাম মেমসাহেবকে ট্রেনে চড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত টাইপরাইটার আর পার্লামেন্ট হাউস স্পর্শ করব না। চেয়েছিলাম প্রতিটি মুহূর্ত মেমসাহেবের সাম্মিধ্য উপভোগ করব।

সত্যি বলছি দোলাবৌদ্ধি, একটি মুহূর্তও নষ্ট করিনি। তগবান আমাদের বিধি-নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ জানতেন বলে একটি মুহূর্তও অপব্যয় করতে দেননি। কথায়, গল্পে, গানে, হাসিতে ভরিয়ে তুলেছিলাম ঐ ক'টি দিন।

লাঞ্ছ খেতে খেতে অনেক বেলা হয়েছিল। চৰিশ ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে নামবার পর থেকে মেমসাহেব একটুও বিশ্রাম করতে পারে নি। আমি বললাম, মেমসাহেব, তুমি একটু বিশ্রাম কর, একটু শুমিয়ে নাও।

‘এই ক’মাসে কলকাতায় অনেক ঘুমিয়েছি, অনেক বিশ্রাম করেছি। তুমি আর আমাকে ঘুমুতে বল না।’

এক মিনিট পরেই বলল, তার চাইতে তুমি বরং একটু খোও। আমি তোমার গায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

‘আমি কেন শোব?’

‘শোব না। আমি তোমার পাশে বসে বসে গল্প করব।’

শোবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না। দিল্লীর কাব্যহীন জীবনে অনেকদিন এমনি একটি পরম দিনের স্বপ্ন দেখেছি।

মেমসাহেব বিশ্রাম করল না কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই শুয়ে পড়লাম। ও আমার পাশে বসে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গুনগুন করে গান গাইছিল। কখনও কখনও আবার একটু আদর করছিল। কি আশ্চর্য আনন্দে যে আমার সারা মন ভরে গিয়েছিল, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। স্বপ্ন যে এমন করে বাস্তবে দেখা দিতে পারে, তা ভেবে আমি অন্তুত সাফল্য, সার্থকতার স্বাদ উপভোগ করলাম।

বালিশ ছ’টোকে ডিভোর্স করে মেমসাহেবের কোলে মাথা রেখে ছ’হাত দিয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে চোখ বুজলাম।

ও জিজ্ঞাসা করল, ঘুম পাচ্ছে?

কথা বললাম না, শুধু মাথা নেড়ে জানালাম, না।

‘ক্লান্ত লাগছে?’

‘না।’

‘তবে?’

‘স্বপ্ন দেখছি।’

‘স্বপ্ন?’

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখছি।

‘মুখটা আমার মুখের কাছে এনে ও জানতে চাইল, কি স্বপ্ন দেখছ?’

‘তোমাকে স্বপ্ন দেখছি।’

‘আমাকে?’

‘হ্যাঁ, তোমাকে।’

‘আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি। আমাকে আবার কি স্বপ্ন দেখছ?’

ওর কোলের ‘পর মাথা রেখেই চিৎ হয়ে শুলাম। ছ’হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বললাম, হ্যাঁ, তোমাকেই স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন দেখছি, জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমি এমনি করে তোমার কোলে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাচ্ছি, ভালবাসা পাচ্ছি, ভরসা পাচ্ছি।

মুহূর্তের জন্ত গর্বের বিহুৎ চমকে উঠে মেমসাহেবের সারা মুখটা উজ্জ্বল করে তুললো। পরের মুহূর্তেই ওর ঘন কালো গভীর উজ্জ্বল ছুটে চোখ কোথায় যেন তলিয়ে গেল। আমাকে বলল, ওগো, তুমি আমাকে অমন করে চাইবে না, তুমি আমাকে এত ভালবাসবে না।

‘কেন বল তো?’

‘যদি কোনদিন কোন কিছু দুর্ঘটনা ঘটে, যদি কোনদিন আমি তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে না পারি, সেদিন তুমি সে ছঃখ, সে আঘাত সহ করতে পারবে না।’

আমি মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, তা হতে পারে না মেমসাহেব। আমার স্বপ্ন ভেঙে দেবার সাহস তোমারও নেই, ভগবানেরও নেই।

আমার কথা শুনে বোধহয় ওর একটু গর্ব হলো। বলল, আমি জানি তুমি আমাকে ছাড়া তোমার জীবন কল্পনা করতে পার না কিন্তু তাই বলে অমন করে বলো না।

‘কেন বলব না মেমসাহেব? তোমার মনে কি আজ্ঞা কেন সন্দেহ আছে?’

‘সন্দেহ থাকলে কেউ এমন করে ছুটে আসে।’

মেমসাহেব আবার ধামে। আবার বলল, তোমার দিক থেকে  
যে আমি কোন আঘাত পাব না, তা আমি জানি। ভয়হয়  
নিজেকে নিয়েই। আমি কি পারব তোমার আশা পূর্ণ করতে?  
পারব কি সুখী করতে?

‘তুমি না পারলে আর কেউ তো পারবে না মেমসাহেব। তুমি  
না পারলে স্বয়ং ভগবানও আমাকে সুখী করতে পারবেন না।’

আরো কত কথা হলো। কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে যায়,  
বিকেল ঘুরে সন্ধ্যা হলো। ঘর-বাড়ি রাস্তাঘাটে আলো ঝলে  
উঠল।

মেমসাহেব বলল, ছাড়। আলোটা জ্বলে দিই।

‘না, না, আলো জ্বলো না। এই অঙ্ককারেই তোমাকে বেশ  
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আলো জ্বাললেই আরো অনেক কিছু দেখতে  
হবে।’

‘পাগল কোথাকার !’

‘এমন পাগল আর পাবে না।’

ও আমাকে চেপে জড়িয়ে ধরে বলল, এমন পাগলীও আর  
পাবে না।

‘ভগবান অনেক হিসাব করেই পাগলার কপালে পাগলী  
জুটিয়েছেন। তা না হলে, কি এত মিল, এত ভালবাসা হয় ?’

ঞ অঙ্ককারের মধ্যেই আরো কিছু সময় কেটে গেল।

মেমসাহেব বলল, চলো, একটু ঘুরে আসি।

‘তোমার কি বেড়াতে ইচ্ছা করছে ?’

‘কলকাতায় তো কোনদিন শান্তিতে বেড়াতে পারিনি।  
এখানে অন্ততঃ কোন ছশ্চিষ্টা নিয়ে ঘুরতে হবে না।’

মেমসাহেব আলো আলল। ‘বেল’ টিপে বেয়ারা ডাকল।  
চা আনাল। চা তৈরী করল। আমি শুয়ে শুয়েই এক কাপ চা  
খেলাম।

এবার মেমসাহেব তাড়া দেয়, নাও, চটপট তৈরী হয়ে নাও।

আমি শুয়েই শুয়েই বললাম, ওয়াড্রবটা খোল। আমাকে একটা প্যান্ট আর বুশশার্ট দাও।

মেমসাহেব সহা বেগী ছলিয়ে বেশ হেলেছলে এগিয়ে গিয়ে ওয়াড্রব খুলেই প্রায় চৌকার করে উঠল, একি তোমার ওয়াড্রবে শাড়ি ?

একবার শাড়িগুলো নেড়ে বলল, এ যে অনেক রকমের শাড়ি। ঘুরে ঘুরে কালেকশন করেছ বুবি ?

ও আমার প্যান্ট-বুশ-শার্ট না দিয়ে হাঙ্গার থেকে একটা কটকি শাড়ি এনে আমার কাছে আবার করল, আমি এই শাড়িটা পরব ?

‘তবে কি আমি পরব ?’

শাড়িটার হৃ-একটা ভাঁজ খুলে একটু জড়িয়ে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঢ়িয়ে বলল, লাভলি !

‘কি লাভলি ? শাড়ি না আমি ?’

শাড়িটা গায়ে জড়িয়েই আয়নার সামনে একটু ঘুরে গেল মেমসাহেব। বলল, ইউ আর নটেরিয়াস বাট শাড়ি ইঞ্জ লাভলি।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে মেমসাহেবকে জড়িয়ে ধরতেই ও বকে উঠল, সব সময় জড়াবে না। শাড়িটার ভাঁজ নষ্ট করো না।

চট করে ও এবার আমার দিকে ঘুরে আমার মুখের দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে বলল, ওগো ব্রাউজের কি হবে ? তুমি নিশ্চয়ই ব্রাউজ পিস কেননি ?

আমি ওর কানটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ঘরের কোণায় নিয়ে গিয়ে একটা ছোট শুটকেস খুলে দিলাম। ‘নটি গার্ল ! হাত এ লুক !’

হাসতে হাসতে বলল, ব্রাউজ তৈরী করিয়েছ ?

‘আজ্জে হ্যাঁ।’

‘মার্প পেলে কোথায় ?’

‘তোমার ব্লাউজের মাপ আমি জানি না ?’

আমার মাথায় হষ্টুমি বুদ্ধি আসে। কানে কানে বলি, শুড়  
আই টেল ইউ ইউর ভাইট্যাল স্ট্যাটিকটিকস ?

মেমসাহেব আমার পাশথেকে পালিয়ে যেতে যেতে বলল, কেবল  
অসভ্যতা ! জার্নালিস্টগুলো বড় অসভ্য হয়, তাই না ?’

‘তোমাদের মত ইয়ং আনম্যারেড প্রফেসারগুলো বড় ধার্মিক  
হয়, তাই না ?’

‘কি করব ? তোমাদের মত এক-একটা দস্ত্য-ডাকাতের হাতে  
পড়লে আমাদের কি নিষ্ঠার আছে ?

আমি যেন আরো কি বলতে গিয়েছিলাম, ও বাধা দিয়ে বলল,  
এবার তর্ক বন্ধ করে বেরুবে কি ?

মেমসাহেব শাড়িটা সোফার ‘পর রেখে নিজের শুটকেস থেকে  
ধূতি-পাঞ্জাবি বের করে বলল, এই নাও পর।

‘এবারও জড়িপাড় ধূতি দিলে না ?’

‘জড়িপাড় ধূতি না পাবার জন্য তোমার কি কিছু অস্বিধা বা  
ক্ষতি হচ্ছে ?’

দোলাবৌদি, আমার জীবনের সেসব শ্রবণীয় দিনের কথা  
শৃঙ্খিতে অমর অক্ষয় হয়ে আছে। আজ আমি রিক্ত, নিঃস্ব।  
ভিখারী। আজ আমার বুকের ভিতরটা জলে-পুড়ে ছারখার হয়ে  
যাচ্ছে। মনের মধ্যে অহরহ রাবণের চিতা জ্বলছে। গঙ্গা-যমুনা  
নর্মদা-গোদাবরীর সমস্ত জল দিয়েও এ আগুন নিভবে না, নেভাতে  
পারে না।

বাইরে থেকে আমার চাকচিক্য দেখে, আমার পার্থিব সাফল্য  
দেখে, আমার মুখের হাসি দেখে সবাই আমাকে কত শুধী ভাবে।  
কত মাঝুষ আরো কত কি ভাবে। আমার ব্যক্তিগত জীবন  
সম্পর্কে কতজনের কত বিচ্ছি ধারণা ! মনে মনে আমার হাসি

পায়। একবার যদি চিংকার করে কান্দতে পারতাম, যদি তারঘরে চিংকার করে সব কিছু বলতে পারতাম, যদি হমুমানের মত বুক চিরে আমার অস্তরটা সবাইকে দেখাতে পারতাম তবে হয়ত—

দেখেছ, আবার কি আজে-বাজে বকতে শুরু করেছি? তোমাকে তো আগেই লিখেছি ঐ পোড়াকপালীর কথা লিখতে গেলে, ভাবতে গেলে, মাঝে মাঝেই আমার মাথাটা কেমন করে উঠে। আরো একটু ধৈর্য ধর। তুমি হয়ত বুবে আমার মনের অবস্থা।

দোলাবৌদ্ধি আমাদের হজ্জনের কাহিনী নিয়ে ভলিউম ভলিউম বই লেখা যায়। সেই সাত দিনের দিল্লী বাসের কাহিনী নিয়েই হয়ত একটা চমৎকার উপন্থ্যাস লেখা হতে পারে। তাছাড়া তিন দিনের জন্য জয়পুর আর সিলিসের ঘোরা? আহাহা! সেই তিনটি দিন যদি তিনটি বছর হতো। যদি সেই তিনটি দিন কোন দিনই ফুরাত না?

দিল্লীতে সেই প্রথম রাত্রিতে আমরা এক মিনিটের জন্যও ঘুমুলাম না। সারা রাত্রি কথা বলেও ভোরবেলায় মনে হয়েছিল যেন কিছুই বলা হলো না? মনে হয়েছিল যেন বিধাতাপুরষের রসিকতায় রাত্রিটা হঠাতে ছেট হয়েছিল। সকালবেলায় স্মর্যকে অসহ মনে হয়েছিল।

মোটা পর্দার ফাঁক দিয়ে স্মরণশি চুরি করে আমাদের ঘরে চুকে বেশ উৎপাত শুরু করেছিল। কিন্তু তবুও ও আমার গলা জড়িয়ে শুয়ে ছিল আর গুণগুন করে গাইছিল, আমার পরাগ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।...

আমি প্রশ্ন করলাম, সত্যি?

ও বলল, তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো। তুমি স্মৃত যদি নাহি পাও, যাও স্মরণের সঙ্গানে যাও—

‘আমি আবার কোথায় যাব?’

মেমসাহেব মাথা নেড়ে আমাকে ধন্তবাদ জানিয়ে আবার গাইতে  
থাকে, ‘আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আর কিছু নাহি চাই  
গো।

‘সিওর !’

‘সিওর !’ ও এবার কল্পই-এর ভর দিয়ে ডান হাতে মাথাটা  
রেখে বাঁ হাত দিয়ে আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গাইল—  
আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন,

তোমাতে করিব বাস—

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,

দীর্ঘ বরষ-মাস।

যদি যদি আর-কারে ভালবাস.....

আমি বললাম, তুমি পারমিশ্রন দেবে ?

মেমসাহেব হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই আবার গাইল—

আর যদি ফিরে নাহি আস,

তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও,

আমি যত দুঃখ পাই গো।

আমি বললাম, আমি আর কিছু চাইছি না, তুমিও দুঃখ পাবে  
না।

ও আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে চেপে ধরে ঠোঁটে একটু  
ভালবাসা দিয়ে বলল, আমি তা জানি গো, জানি।

সকালবেলায় চা খেতে খেতে মেমসাহেব বলল, ওগো, চলো না  
হৃদিনের জন্য জয়পুর যুরে আসি।

আইডিয়াটা মন লাগল না। ঐ চা খেতে খেতেই প্র্যান হয়ে  
গেল। একদিন জয়পুর, একদিন সিলিসের ফরেস্ট বাংলোয় থাকব।  
তারপর দিল্লী ফিরে এসে কিছু ঘোরাঘুরি, দেখাশুনা আর সংসার  
পাতার বিধিব্যবস্থা করা হবে বলেও ঠিক করলাম।

## পনের

আমাকে কিছু করতে হলো না, মেমসাহেব আমার একটা  
অ্যাটাচির মধ্যে দুদিনের প্রয়োজনীয় সব কিছু ভরে নিয়েছিল।  
আমি হ'একবার এটা ওটা নেবার কথা বলেছিলাম। ও বলেছিল,  
তুমি চুপ করো তো !

আমি চুপ করেছিলাম। রাত্রে আমেদাবাদ মেল ধরে পরদিন  
ভোরবেলায় জয়পুর পৌঁছিলাম।

ট্রেনে ?

ট্রেনের কথা কি লিখব ? সেকেশ ঝাসে গিয়েছিলাম।  
কম্পার্টমেন্টে আরো প্যাসেঞ্জার ছিলেন। অনেক কিছুই তো ইচ্ছা  
করেছিল কিন্তু...। তবে হজনে এক কোণায় বসে অনেক রাত  
পর্যন্ত গল্ল করেছিলাম। মেমসাহেবকে শুতে বলেছিলাম কিন্তু রাজ্জী  
হয় নি। ও বলেছিল, তুমি শোও। আমি তোমাকে ঘূম পাড়িয়ে  
দিচ্ছি।

‘না, না, তা হয় না।’

‘কেন হবে না ?’

‘তুমি জেগে থাকবে আর আমি ঘুমাব ?’

‘আগে তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। পরে আমি ঘুমাব।’

আমার ঘুমুতে ইচ্ছা ফরছিল না। তাই বললাম, তাছাড়া  
এইটুকু জায়গায় কি ঘুমান যায় ?

‘এইত আমি সরে বসছি। তুমি আমার কোলে মাথা দিয়ে  
শুয়ে পড়।’

আমার হাসি পেল।

‘হাসছ কেন ?’

হাসতে হাসতেই আমি জবাব দিলাম, ‘রেলের এই  
কম্পার্টমেন্টেও কি তুমি আমাকে আদর করবে ?’

ও রেগে গেল। ‘বেশ করব। একশবার করব। আমি কি  
পরপুরুষকে আদর’ করছি ?’

‘মেমসাহেব একটু সরে বসল। আমি ওর কোলে মাথা রেখে  
শুয়ে পড়লাম।

ও আমার মাথায় মুখে হাত দিয়ে আদর করে ঘূম পাড়াবার  
চেষ্টা শুরু করল। কয়েক মিনিট বাদে মুখটা আমার মুখের ‘পর  
এনে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ঘূমছ ?’

‘না।’

‘ঘূমবে না ?’

‘না।’

‘কেন ?’

‘এত স্বর্থে, এত আনন্দে ঘূম আসে না।’

এবাব মেমসাহেব হাসল। জিজ্ঞাসা করল, ‘সত্যি ভাল লাগছে ?’

‘খুব ভাল লাগছে।’

ও চুপ করে যায়। কিছু পরে ও আবাব হৃমড়ি খেয়ে আমার  
মুখের ‘পর পড়ল। বললো, ‘একটা কথা বসব ?’

‘বল।’

‘তুমি রোজ এমনি করে আমার কোলের ‘পর মাথা রেখে  
শোবে, আর আমি তোমাকে ঘূম পাড়িয়ে দেব।’

‘কেন ?’

‘কেন আবাব ? আমার ইচ্ছা করে, ভাল লাগে।’

আমি কোন উত্তর দিলাম না। ওর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে  
দিয়ে হাসছিলাম।

মেমসাহেব ছ’হাত দিয়ে আমার মুখটা নিচৰে দিকে থুরিয়ে  
নিয়ে বললো, ‘হাসছ কেন ?’

‘এমনি !’

‘না, তুমি অমন করে হাসবে মা !’

‘বেশ !’

মেমসাহেব আবার আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আমার ভীষণ ভাল লাগছিল যে সত্য সত্যিই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘূম ভেঙেছিল একেবারে তোরবেলায়। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে চারটে। মেমসাহেবও ঘুমছিল। ছহতে আমার মুখটা জড়িয়ে থরে মাথাটা হেলান দিয়ে বসে বসেই ঘুমছিল। ভীষণ লজ্জা, ভীষণ কষ্ট লাগল। আমি উঠে বসতেই ওর ঘূম ভেঙে গেল। আমি কিছু বলবার আগেই ও জিজ্ঞাসা করল, ‘উঠলে যে ?’

আমি ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কটা বাজে জান ?’

‘কটা ?’

‘সাড়ে চারটে !’

‘তাই বুঝি !’

‘তুমি সারা রাত্রি এইভাবে বসে বসেই কাটালে ?’

ঐ আবছা আলোতেই আমি দেখতে পেলাম একটু হাসিতে মেমসাহেবের মুখটা উজ্জল হয়েছিল। বললো, ‘তাতে কি হলো !’

আমি রেগে বললাম, ‘তাতে কি হলো ? সারা রাত্রি আমি মজ্জা করে শুয়ে রইলাম আর তুমি বসে বসে কাটিয়ে দিলে ?’

শাস্তি স্বিন্দ মেমসাহেব আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, ‘রাগ করছ কেন ? বিশ্বাস কর, আমার একটুও কষ্ট হয় নি !’

আমি উপহাস করে বললাম, ‘না, না, কষ্ট হবে কেন ? বড় আরামে ঘুমিয়েছি !’

আবার সেই মিষ্টি হাসি, স্লিপ শান্ত কষ্ট। ‘আরাম না হলেও আনন্দ তো পেয়েছি।’

জান দোলাবৌদ্ধি, পোড়াকপালী এমনি করে ভালবেসে আবার সর্বনাশ করেছে।

অয়পুরে গিয়ে কি করেছিল জান ? হোটেলে গিয়ে জ্ঞান করে ব্রেকফাস্ট খাবার পর আমি বললাম, ‘কাপড়-চোপড় পালটে নাও।’

‘কেন ?’

‘কেন আবার ? ঘুরতে বেরুব ?’

‘কোথায় আবার ঘুরবে ?’

‘অয়পুর এসে সবাই ষেখানে ঘুরতে যায়।’

ও বললো, ‘আমি তো অস্বর প্যালেস বা হাওয়া মহল দেখতে আসিনি।’

‘তবে জয়পুর এলে কেন ?’

‘কেন আবার ? তোমাকে নিয়ে বেড়াতে এলাম। এতদিন ধরে পরিশ্রম করছ। তাই একটু বিশ্রাম পাবে বলে জয়পুর এলাম।’

আমি বললাম, ‘দিলীতেই তো বিশ্রাম করতে পারতাম।’

‘ভাবলাম আমার সঙ্গে একটু বাইরে গেলে আরো ভাল লাগবে, তাই এলাম।’

জনের এক কোণায় একটা গাছের ছায়ায় বসে বসে সারা সকাল কাটিয়ে দিলাম আমরা।

‘ওগো তুমি যখন গাড়ি কিনবে তখন প্রত্যেক উইক-এণ্ডে আমরা বাইরে বেরুব। কেমন ?’

আঙুল দিয়ে নিজের দিকে দেখিয়ে বললাম, ‘আমি গাড়ি কিনব ?’

‘তবে কি আমি কিনব ?’

‘তুমি কি পাগল হয়েছ ?’

‘কেন তুমি বুঝি গাড়ি কিনবে না ?’

‘দূর পাগল ! আমি গাড়ি কেনার টাকা পাব কোথায় ?’

ও যেন সত্যি একটু রেগে গেল। ‘তুমি কথায় কথায়, আমায় পাগল পাগল বলবে না তো !’

‘পাগলের মত কথা বললেও পাগল বলব না ?’

জি কুঁচকে ও প্রায় চীৎকার করে বললো, ‘না !’

একটু পরে আবার বললো, ‘গাড়ি কেনবার কথা বলায় পাগলামি কি হলো ?’

আমি একটা সিগরেট ধরিয়ে ওর মুখে ধুঁয়া ছেড়ে বললাম,  
‘কিছু না !’

আশ্চর্য আঞ্চলিকসের সঙ্গে ও বললো, ‘দেখ না এক বছরের  
মধ্যে তোমার গাড়ি হবে ।’

‘তুমি জান ?’

‘একশ’ বার জানি ।’

একটু পরে আবার কি বললো জান ? মেমসাহেব আমার  
গা ঘেঁষে বসে আমার কাঁধের ‘পর মাথা রেখে আধো-আধো  
স্বরে বললো, ‘ওগো, তুমি আমাকে ডাইভিং শিখিয়ে দেবে ?’

ও তখন বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেনের চাইতেও অনেক বেশী  
গতিতে উপরে উঠছিল। সুতরাং আমি অথবা বাধা দেবার ব্যর্থ  
চেষ্টা না করে বললাম, ‘নিশ্চয়ই ।’

মনে মনে আমার হাসি পাছিল কিন্তু অনেক চেষ্টায় সে হাসি  
চেপে রেখে বেশ স্বাভাবিক হয়ে জানতে চাইলাম, ‘কি গাড়ি  
কিনতে চাও ?’

আমার প্রশ্নে ও খুব খুশি হলো। হাসিতে মুখটা ভরে গেল।  
টানা টানা চোখ ছটো যেন আরো বড় হলো। বললো, ‘তোমার  
কোন গাড়ি পছন্দ ?’

ওকে সম্পর্ক করবার জন্য বললাম, ‘গাড়ি কিনলে তো তোমার পছন্দ মতই কিনব।’

ও মনে মনে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল। তাইতো মুহূর্তের মধ্যে উক্তর দিল, ‘স্ট্যাগার্ড হেরল্ড।’

‘তোমার বুবি স্ট্যাগার্ড হেরল্ড খুব পছন্দ’, আমি জানতে চাইলাম।

‘গাড়িটা দেখতেও ভাল তাছাড়া...’

মেমসাহেব এগুতে গিয়ে একটু থামল। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তাছাড়া কি?’

হাসি হাসি মুখে ও উক্তর দিল, ‘ঝি গাড়িটা যে টু-ডোর।’

‘তাতে কি হলো?’

যেন মহা বোকামি করেই ঐ অশ্বটা করেছিলাম। ও বললো, ‘বাঃ, তাতে কি হলো?’

খুব সিরিয়াস হয়ে বললো, ‘বাচ্চাদের নিয়ে ঐ গাড়িতে যাওয়ায় কত সুবিধা জান? হঠাৎ দরজা খুলে পড়ে যাবার কোন ভয় নেই, তা জান?’

মেমসাহেবের কল্পনার বোয়িং সেতেন-জিরো-সেভেন তখন চলিপ হাজার ফুট উপরে উড়ছে। তাছাড়া আয় সাড়ে পাঁচশ-ছ'শো মাইল স্পীডে ছুটে চলেছিল। আমি সেই উড়ো জাহাজের কো-পাইলট হয়েও ওকে পালামের মাটিতে নামাতে পারলাম না। মনে মনে কষ্ট হলো। তাছাড়া আগামী দিনের ওর স্বপ্ন হয়ত আমারও ভাল লেগেছিল। মুখে শুধু বললাম, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।’

তপুর বেলা লাঞ্ছের পর দুজনে শুয়ে শুয়ে আরো কত গল্প শুলাম।...

‘ওগো, খোকনের খুব ইচ্ছা একবার তোমার কাছে আসে।’

আমি বললাম, ‘পাঠিয়ে দিও না।’

‘না, না, এখন না। আগে আমাদের সংসার হোক, তারপর আসবে।’

আমি জানতে চাইলাম, ‘আচ্ছা মেমসাহেব, তুমি খোকনকে খুব ভালবাস, তাই না ?’

মেমসাহেব বললো, ‘কি করব বল ? কাকাবাবুকে তো আমরা কোনদিনই ভাড়াটে ভাবি না। কাকিমা বেঁচে থাকলে হয়ত অত মেলামেশা ভাব হতো না। তাছাড়া কাকাবাবু অফিস আর টিউশনি নিয়ে প্রায় সারাদিনই বাড়ির বাইরে। তাই আমরা ছাড়া খোকনকে কে দেখবে বলো ?’

আমি বললাম, ‘তাত্ত্ব বুঝলাম কিন্তু তুমি খোকনকে একটু বেশী ভালবাস।’

পাশ ফিরে শুয়ে আমাকে আর একটু কাছে টেনে নিয়ে ও বললো, ‘কেন তোমার হিংসা হয় ?’

আমি উত্তর দিলাম, ‘আমার হিংসা হবে কেন ?’

আমিও একটু পাশ ফিরে শুলাম। বললাম, ‘গতবার খোকন যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল, তখন তুমি কি কাঙ্টাই না করলে ?’

‘করব না ? আমরা ছাড়া ওর কে আছে বল ?’

‘আমরা, আমরা বলছ কেন ? বল আমি ছাড়া কে করবে ?’

ও কোন উত্তর দিল না। শুধু হাসল। একটু পরে আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, ‘আমি বাড়ির মধ্যে সব চাইতে ছোট। কেউ আমাকে দিদি বলে ডাকে না। ছোটবেলা থেকেই আমার একটা ভাই’-এর শখ।.....’

‘তাই বুঝি ?’

কি যেন ভেবে ও হাসল। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হাসছ কেন ?’

‘ছোটবেলার একটা কথা মনে হলো।’

‘কি কথা ?’

মেমসাহেব আবার হাসল। বললো, ‘ছোটবেলায় একটা ‘তাই’ দেবার জন্ম আমি মাকে থুব বিরক্ত করতাম।’  
আমি হাসলাম।

হাসতে হাসতেই ও বললো, ‘সত্যি বলছি, অনেকদিন পর্যন্ত একটা তাই দেবার জন্ম মাকে বিরক্ত করেছি। আর আমি যেই তাই’-এর কথা বলতাম সঙ্গে সঙ্গে দিদিরা চলে যেত আর মা আমাকে বকুনি দিয়ে ভাগিয়ে দিতেন।’

‘তাই বুঝি তুমি খোকনকে এত ভালবাস?’

‘অনেকটা তাই। তাছাড়া খোকন ছেলেটাও ভাল আর আমাকেও ভীষণ ভালবাসে।’

‘সেকথা সত্যি।’

ও চাই করে আমার ঠোটে একটু ভালবাসার স্পর্শ দিয়ে বললো,  
‘ধ্যাক ইউ।’

পরে আবার মেমসাহেব বলেছিল, ‘সকাল বেলায় ধূতি পাঞ্জাবি  
পরে খোকন যখন কলেজে যায়, তখন আমার ভীষণ ভাল লাগে।’

‘লাগবেই তো! নিজে হাতে নিজের স্নেহ দিয়ে যাকে এত  
বড় করেছ, সেই ছেলে বড় হলে, ভাল হলে, নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।’

একটু ধামি, একটু হাসি। ও জিজ্ঞাসা করল, ‘আবার হাসছ  
কেন?’

‘এমনি।’

‘এমনি কেন?’

আবার হাসলাম, আবার বললাম, ‘এমনি।’

মেমসাহেব পৌড়াপীড়ি শুরু করে দিল। ‘এমনি কেন হাসছ  
বল না।’

হাসতে হাসতেই আমি বললাম, ‘বলব?’

‘বলো।’

আবার হাসলাম। বললাম, ‘সত্যি বলব?’

মেমসাহেব কহুই'এর ভর দিয়ে আমার মুখের ওপর ছমড়ি খেয়ে  
বললো, 'বলছি তো বল না।'

ছ'হাত দিয়ে শর মুখটা টেনে নিয়ে কানে কানে জিজ্ঞাসা  
করলাম, 'আমাদের খোকন কবে হবে ?'

মেমসাহেবও আমার কানে কানে বললো, 'তুমি যেদিন  
চাইবে ?'

'সিওর ?'

'সিওর ?'

ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললাম, 'ধ্যাক ইউ ভেরী মাচ !'

ও হাসতে হাসতে উত্তর দিল, 'নট, অ্যাট অল ! ইট উইল বী  
মাই প্রেজার !'

'আর ইউ সিওর ম্যাডাম ?'

'ইয়েস স্থার, আই এ্যাম সিওর !'

এই কথার পর দুজনেরই যেন কি হলো। কি যেন সব ছষ্টুমি  
বুদ্ধির ঝড় উঠল দুজনেরই মাথায়। সেদিন দুপুরে ঐ শান্ত স্নিফ  
মেমসাহেব যে কি কাণ্ডটাই করল ! পরে আমি বলেছিলাম, 'জান  
মেমসাহেব, তোমাকে দেখে বুঝা যায় না তোমার মধ্যে এত ছষ্টুমি  
বুদ্ধি লুকিয়ে আছে !'

ও পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে বললো, 'বাজে বকো না।'

পরের দিন ভোরবেলায় এলাম সিলিসের। লেকের ধারে  
পাহাড়ের পর এককালের রাজপ্রাসাদ এখন সরকারী পাইশালা।  
দোতলার ম্যানেজারের খাতায় নাম ধাম লিখে ঘরের চাবি নিয়ে  
তিন-তলার ছাদে এসে ঢাঢ়াতেই মেমসাহেব সেক আর পাহাড়  
দেখে মুঝ হলো। বললো, 'চমৎকার !'

মাথায় ঘোমটা, কপালে বিরাট সিঁহুরের টিপ, চোখে সানগ্লাস  
দিয়ে মেমসাহেবকে এই পরিবেশে আমার যেন আরো হাজার  
হাজার গুণ ভাল লাগল। আমি বললাম, 'সত্য চমৎকার !'

‘তা আমার দিকে তাকিয়ে বশচ কেন ?’

‘এই লেক, পাহাড় আৱ এই রাজপ্রাসাদেৱ চাইতেও তোমাকে বেশী জাল লাগছে ।’

আমাৱ প্ৰশংসা গ্ৰাহ না কৱে ও ছাদেৱ চাৱপাশ ঘুৱে ঘুৱে লেক আৱ পাহাড় দেখছিল। ইতিমধ্যে ছাদেৱ শুগাশ থেকে অকস্মাৎ এক সন্ত বিবাহিতা মহিলা মেমসাহেবেৱ কাছে এসে জিজ্ঞাসা কৱলেন, ‘আপনাৱা বাঙালী ?’

ও একবাৱ ঘাড় বেঁকিয়ে সানঁঘাসেৱ মধ্য দিয়ে আমাৱকে দেখে নিয়ে বললো, ‘হ্যাঁ ।’ একটু থেমে জানতে চাইল, ‘আপনি ?’

ভদ্ৰমহিলা বত্ৰিশ পাটি দাত বাৱ কৱে বললেন, ‘আমৱাও বাঙালী ।’

আমি মনে মনে বললাম, এখানেও কি একটু নিশ্চিষ্টে থাকতে পাৱব না ?

ভদ্ৰমহিলা থামলেন না। আমাৱ প্ৰশ্ন কৱলেন, ‘কোথায় থাকেন আপনাৱা ?’

মেমসাহেব অস্বস্তিবোধ কৱলেও ভদ্ৰমহিলাৱ আগ্ৰহেৱ তৃষ্ণা না মিটিয়ে আসতে পাৱছিল না। বললো, ‘দিল্লী ।’

‘দিল্লীতে ? কোথায় ? গোদী কলোনী ?’

‘না, ওয়েস্টাৰ্ন কোটে ।’

‘আপনাৱ স্বামী কি গৰ্ভন্মেটে আছেন ?’

‘না, উনি জাৰ্নালিস্ট ।’

বেয়াৱা ঘৰেৱ দৱজা খুলে অ্যাটাচ্টা রেখে দিল। আমি এবাৱ ডাক দিলাম, ‘শোন ।’

মেমসাহেব মাথাৱ ঘোমটাটা একটু টেনে বললো, ‘এখন আসি। পৰে দেখা হবে ।’

‘আমৱা আজ বিকেলেই আজমীড় চলে যাৱ ।’

‘আজই ?’ মেমসাহেব মনে মনে দৃঢ় পাৰার ভান কৱল।

ও ঘরের দরজায় আসতেই আমি বললাম, ‘তুমি ওকে বলো  
এক্সুনি বিদায় নিতে।’

সানগ্লাসটা খুলতে খুলতে ও বললো, ‘আঃ, শুনতে পাবেন।’

মেমসাহেব চুল খুলতে বসল। আমি বাথরুমে ঢুকলাম। স্নান  
সেরে বেরিয়ে আসতেই ও আমাকে বললো, ‘তুমি সাবান, তোয়ালে  
নিয়ে যাওনি?’

‘বাথরুমেই তো ছিল।’

‘ওতো হোটেলের।’

‘তাতে কি হলো? কাচান তোয়ালে নতুন সাবান ব্যবহার  
করলে কি হয়েছে?’

‘কিছু হোক আর নাই হোক, আমার তোয়ালে-সাবান থাকতে  
তুমি কেন হোটেলের জিনিস ব্যবহার করবে?’

মেমসাহেবও স্নান সেরে নিল। বেয়ারাকে ডেকে বললাম,  
মাস্তা লে আও।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে সোফায় এসে বসলাম দৃজনে। মেমসাহেবকে  
বললাম, ‘একটা গান শোনাও।’

‘চারিদিকে লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। এখন নয়, সন্ধ্যাবেলায়  
পাহাড়ের পাশ দিয়ে লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে তোমাকে  
অনেক গান শোনাব।’

সেদিন সারাদিন মেমসাহেবের গলার রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা হয় নি  
সত্য। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গীত রচনা করেছিলাম দৃজনে।।।।

‘ওগো, এর পর তোমার আর কিছু আয় বাড়লেই তুমি একটা  
থ্রি-রুম ফ্ল্যাট নেবে।’

‘এখনই ফ্ল্যাট নিয়ে কি হবে?’

‘দৃজনেই আস্তে আস্তে সংসারের সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে নেব।’

‘তাছাড়া থ্রি-রুম ফ্ল্যাট নিয়ে কি হবে? একটা ঘরের একটা  
ছোট্ট ইউনিট হলেই তো যথেষ্ট।’

‘না, না, তা হয় না। একটা ঘরের ফ্ল্যাটে আমাদের ছজনেরই  
তো হাত-পা ছড়িয়ে থাকা অসম্ভব।’

‘ছজন ছাড়া তিনজন পাছ কোথায়?’

এবার মেমসাহেবের সব গান্ধীর্ঘ উধাও হয়ে গেল। হাসতে  
হাসতে বললো, ‘তোমার মত ডাকাতের সঙ্গে সংসার করতে শুরু  
করলে ছ’জন থেকে তিনজন, তিনজন থেকে চারজন পাঁচজন হতেও  
সময় লাগবে না।’

ওর কথা শুনে আমি স্তুপ্তি না হয়ে পারলাম না। অবাক  
বিশ্বাসে আমি ওর দিকে চেয়ে রাখলাম।

‘অমন হঁ করে কি দেখছ?’

‘তোমাকে।’

‘আমাকে?’

মাথা নেড়ে বললাম, ‘হঁ, তোমাকে।’

‘আমাকে কোনদিন দেখনি?’

ওর দিকে চেয়ে চেয়েই বললাম, ‘দেখেছি।’

এবার মেমসাহেবও একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল।  
‘তবে অমন করে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখছ?’

আমি ছ’হাত দিয়ে ওর মুখখানা তুলে ধরে বললাম, ‘জান  
মেমসাহেব, তুমি নিশ্চয়ই সুখী সার্থক স্ত্রী হবে। কিন্তু সন্তানের  
জননী হিসাবে বোধহয় তোমার তুলনা হবে না।’

মেমসাহেব অথবে ধীরে ধীরে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিল। তারপর  
আলতো করে মাথাটা আমার বুকের ‘পর রাখল। ছটো আঙুল  
দিয়ে পাঞ্জাবির বোতামটা ঘুরাতে ঘুরাতে বললো, ‘আমার ষে  
ছেলেমেয়ের ভৌষণ শখ। রাস্তা-ঘাটে ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা দেখলেই  
মনে হয়...’

‘যদি তোমার হতো, তাই না?’

মেমসাহেব আমার কথায় সম্মতি জানিয়ে মাথা নেড়ে হাসল।

তারপর আস্তে আস্তে ওর মুখটা আমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। আমার ঘনে হলো কি যেন লজ্জায় বলতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কিছু বলবে ?’

মুখটা লুকিয়ে রেখেই আস্তে আস্তে বললো, ‘তোমার ইচ্ছা করে না ?’

আমি হেসে ফেললাম। ‘জান মেমসাহেব, স্বপ্ন দেখতে বড় ভয় হয়।’

আমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা মুখটা ঘুরিয়ে আমার দিকে চাইল। বললো, ‘কেন ভয় হয় ?’

‘জীবনে চলতে গিয়ে বারবার পিছনে পড়ে গেছি। তাইতো ভবিষ্যতের কথা ভাবতে, ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতে ভয় হয়।’

ও হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরে বললো, ‘না, না, ভয়ের কথা বলো না। তয় কি ? একটু আতঙ্কে, একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জানতে চাইল, ‘আমি কি তোমার হবো না ?’

এবার আমি ওর মুখটা চেপে ধরে বললাম, ‘ছি, ছি, ওসব আজেবাজে কথা ভাবছ কেন ? তুমি তো আমারই।’

ওর মুখে তখনও বেশ চিন্তার ছাপ। বললো, সে তো জানি কিন্তু তবুও তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ?’

আমি হ'হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে তুলে নিলাম। সান্ত্বনা জানলাম, ‘কিছু ভয় করো না। তোমার স্বপ্ন, তোমার ভালবাসা কোনদিন ব্যর্থ হতে পারে না।’

একটু ব্যাকুলতা মেশানো ঘরে বললো, ‘সত্যি বলছ ?’

‘একশ’বার বলছি। যদি বিধাতার ইচ্ছা না হতো তাহলে কি ঐ আশ্চর্য ভাবে আমাদের দেখা হতো ? নাকি এমনি করে আজ আমরা সিলিসের লেকের পাড়ে মিলতে পারতাম ?’

‘আমারও তো তাই মনে হয়। যদি তগবানের কোন নির্দেশ,

কোন ইঙ্গিত না থাকত তাহলে সত্য আমরা কোনদিন মিলতে পারতাম না।’

‘তবে এত ঘাবড়ে ঘাজ্ছ কেন?’

অশুয়োগের শুরু মেমসাহেব বললো, ‘তুমিই তো ঘাবড়ে দিচ্ছ।’

‘ঘাবড়ে দিচ্ছ না, সতর্ক করে দিচ্ছি।’

‘হ’ আঙুল দিয়ে আমার গালটা চেপে ধরে বললো, ‘কি আমার সতর্ক করার ছিরি?’

দোলাবৌদি, সেই অরণ্য আর পর্বতের কোলে যে ছুটি দিন কাটিয়েছিলাম, তা আমার জীবনের মহা স্মরণীয় দিন। এত আপন করে, এত নিবিড় করে মেমসাহেবের এত ভালবাসা আমি এর আগে কোনদিন পাইনি। ঐ ছুটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত মেমসাহেবের ভালবাসা আর উষ্ণ সান্নিধ্য উপতোগ করেছিলাম আমি। তাইতো তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাহচর্যে আসতে মন চায় নি।

মেমসাহেব বলেছিল, ‘অনেক বেলা হলো। চলো লাঙ খেয়ে আসি।’

আমি সোজা জানিয়ে দিয়েছিলাম, ‘আমি ঘর ছেড়ে বেঁকচ্ছি না।’

‘তবে?’

‘তবে আবার কি? বেয়ারাকে ডেকে বল ঘরে খাবার দিয়ে যেতে।’

আমি অতীত দিনের রাজপ্রাসাদের রাজকুমারের শয়নকক্ষে মহারাজার মত শুয়ে রইলাম। ও বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললো, ‘সাহাবকা তবিয়ত আচ্ছা নেই হায়। মেহেরবানি করকে থানা ইথারই লে-আনা।’

‘জো হকুম মেমসাব।’

ঘরে খাবার এসেছিল। সেটার টেবিলে খাবার-দাবার সাজিয়ে ও ডাক দিয়েছিল, ‘এসো খেতে এসো।’

বড় সোকায় ছ'জনে পাশাপাশি বলে খেয়েছিলাম। খেতে খেতে এক টুকরো নরম মাংস আমার মুখে তুলে দিয়ে বলেছিল, ‘এই নাও খেয়ে নাও।’

‘তুমি খাও না।’

‘আমি দিচ্ছি, তুমি খাও না।’

মাংসের টুকরোটা ধাবার সময় ওর হাটো আঙুলে কামড় দিয়ে বললাম, ‘তোমাকেও খেয়ে ফেলি।’

হাসতে হাসতে বললো, ‘আমাকে কি খেতে বাকি রেখেছ?’

খেয়ে-দেয়ে ও একটা চাদর গায় দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সতর্ক করে দিল, ‘এখন চুপটি করে ঘুমোও, একটুও বিরক্ত করবে না।’

‘সত্ত্বি?’

‘সত্ত্বি নয়ত কি মিথ্যে?’

আমি একটু ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, ‘বিরক্ত না করে যদি তোমাকে সুশ্রী করি?’

আমাকে হাত দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে হেসে বললো, ‘দূর থেকে সুশ্রী করো।’

‘অনেক দূরে সরে যাব?’

‘ইঁয়া, যাও।’

‘তাই কি হয়? তোমার কষ্ট হবে।’

বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে বললো, ‘কলা হবে। দেখি কেমন থেতে পারে।’

মেমসাহেব জ্ঞানত ও পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে পারবে না, আমিও দূরে সরে থাকব না। ওর মনের কথা আমি জ্ঞানতাম, আমার মনের কথাও ও জ্ঞানত। তবুও হয়ত একটু বেশি আদর, একটু বেশি ভালবাসা পাবার জন্য ও এমনি ছঁটুমি করতে ভালবাসত। আমারও মন্দ লাগত না।

পরের দিন সারা গেস্টহাউস ফাঁকা হয়েছিল। শুধু আমরা ছজম আর দোতলায় এক বৃক্ষ দশ্পতি ছাড়া আর কোন গেস্ট ছিল না।

সক্যাবেলায় আমরা ছজনে লেকের ধার দিয়ে পাহাড় আর অরণ্যের মধ্যে কত ঘূরে বেড়িয়েছিলাম। মেমসাহেব কত গান শুনিয়েছিল। রাত্রে কিরে এসে ছাতের কোণে লেকের মিষ্টি হাওরায় বসে বসে ছজনে জিনার খেলাম। তারপর সাইটগুলো অফ করে দিয়ে বিরাট মুক্ত আকাশের তলায় বসে রইলাম আমরা ছজনে। আকাশের তারাগুলো মিট-মিট করে জলঙ্গে সেদিন ঈ আবৃছা অঙ্ককারে আমাদের ছজনের মনের আকাশ পূর্ণিমার আলোয় ভরে গিয়েছিল।

আশপাশে ছনিয়ার আর কোন জনপ্রাণী ছিল না। মনে হয়েছিল শুধু আমরা ছজনেই যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক। ভগবান যেন আমাদের মুখ চেয়ে, আমাদের শাস্তির জন্য আর সবাইকে ছুটি দিয়েছিলেন এই পৃথিবী থেকে অন্ত কোথাও একটু ঘূরে আসতে।

জ্ঞানণ্যের বাইরেও এর আগে কয়েকবার মেমসাহেবকে কাছে পেয়েছি কিন্তু এমন করে কাছে পাইনি। এত পূর্ণ, পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণভাবে আগে পাইনি।

‘মেমসাহেব, তুলে যাবে নাতো এই রাত্রির কথা ?’

বোতল বোতল ভালবাসার ছইক্ষি খেয়ে মেমসাহেবের এমন নেশা হয়েছিল যে কথা বলার ক্ষমতাও ছিল না। তাইতো শুধু মাথা নেড়ে বললো, ‘না।’

‘কোনওদিন না ?’

‘না।’

‘যাদ কোনদিন তুমি আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাও—’

‘তোমার এই ভালবাসা আর এই স্মৃতি বুকে নিয়ে কোথায় যাব বলো ?’

‘তবুও মাঞ্ছের অদৃষ্টের কথা তো বলা যায় না।’

জিভ দিয়ে ঠোট্টা একটু ভিজিয়ে নিল, হটো দাত দিয়ে এ ঠোটের কোনটা একটু কামড়ে নিল মেমসাহেব। তারপর বললো, ‘তোমার এই ভালবাসা পাবার পর আর একজনের সঙ্গে সারাজীবন ধরে ভালবাসার অভিনয় করতে আমি পারব না।’

একটু থামল। আমাকে আর একটু কাছে টেনে নিল। একটু বেশি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো, ‘তাছাড়া তোমার জীবনটা সর্বনাশ করে আর একজনকে আবার ঠকাব কেন?’ একটু জোর গলায় বলে উঠল, ‘না, না, আমি তা কোনদিন পারব না।’

আমিও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। আমিও বেশ জোর করে শুকে জড়িয়ে ধরলাম। একটু যেন ভেজা গলায় বলেছিলাম, ‘সত্য বলছি মেমসাহেব, তগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি সে দুর্দিন যেন কোনদিন না আসে। কিন্তু যদি কোনদিন আসে, সেদিন আমি আর বাঁচব না। হয় উন্মাদ হবো নয়ত তোমার স্মৃতি বুকে নিয়েই এই লেকের জলে চিরকালের জন্য ডুব দেব।’

ও তাড়াতাড়ি আমার মুখটা চেপে ধরল। বললো, ‘ছি, ছি, শুকথা মুখে আনে না। এই তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।’

একটু থেমে, আমাকে একটু আদর করে মেমসাহেবে আবার বলেছিল, আমি যেতে চাইলেই তুমি আমাকে যেতে দেবে কেন? আমি না তোমার জী? তোমার ঘনে কোন দ্বিধা, কোন চিন্তা থাকলে আজ এই রাত্তিরেই তুমি আমার সিঁথিতে সিঁহুর পরিয়ে দাও, হাতে শঁখা পরিয়ে দাও। আমি সেই শঁখা-সিঁহুর পরেই কলকাতা ফিরে যাব।’

মেমসাহেবের কথায় আমার ঘন থেকে অবিশ্বাসের ছোট ছোট টুকরো টুকরো মেঘগুলো পর্যন্ত কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমার মুখটা হাসিতে ঝলমল করে উঠল। বললাম, ‘না, না, আমার ঘনে

কোন দিকে নেই। তুমি যদি আমার না হতে তাহলে কি অমন  
হাসিমুখে তোমার সমস্ত সম্পদ, সব ঐশ্বর্য আর ভালবাসা এমন  
করে দিতে ?'

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। হাতে ঘড়ি ছিল  
কিন্তু দেখার মনোযুক্তি কাঙ্করই ছিল না। ঘরে এসে আর  
মেমসাহেব পাশ ফিরে শুয়ে দূরে থাকেনি। এত আপন, এত নিবিড়,  
এত অনিষ্ট হয়েছিল সে রাত্রে যে সে কাহিনী লেখা সম্ভব নয়। শুধু  
জেনে রাখ আমাদের ছাতি মন, ছাতি প্রাণ, ছাতি আঝা আর আশা-  
আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধনা সব একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল সে  
চিরস্মরণীয় রাত্রে।

## ବୋଲ

ପରେର ଦିନ ସୁମ ଭାଙ୍ଗତେ ଅନେକ ବେଳା ହେଁଛିଲ । ହୟତ ଆରୋ ଅନେକ ବେଳା ହତୋ । କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋ ଚୋଥେ ପଡ଼ାଯା ଆମାର ସୁମ ଭେତେ ଗେଲ । ପାଶେର ଖାଟେ ମେମସାହେବ ଆମାର ଦିକେ ଫିରେ ଶୁଯେଛିଲ । ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋ ଓର ଚୋଥେ ପଡ଼ିଛିଲ ନା । ମନେ ହଲୋ ମହାନଲେ ସ୍ଵପ୍ନେ ବିଭୋର ହୟେ ଆଛେ ।

ଓର ସୁମ ଭାଙ୍ଗତେ ଆମାର ମନ ଚାଇଲ ନା । ଓ ଏତ ନିଶ୍ଚିଷ୍ଟେ, ଶାସ୍ତିତେ ସୁମୁଚ୍ଛିଲ ଯେ ଦେଖତେ ବେଶ ଲାଗିଛିଲ । ବହୁକ୍ଷଣ ଧରେ ଶୁଧୁ ଚେଯେ ଚେଯେ ଦେଖଲାମ । ତାରପର ଉଠେ ବସେ ଆରୋ ଭାଲ କରେ ଦେଖଲାମ । ଓର ସର୍ବାଙ୍ଗେ 'ପର ଦିଯେ ବାର ବାର ଚୋଥ ବୁଲିଯେ ନିଲାମ । ଏକଟୁ ହୟତ ହାତ ବୁଲିଯେ ଦିଯେଛିଲାମ ଓର ଗାୟ ।

ମନେ ମନେ କତ କି ଭାବଲାମ । ଭାବଲାମ, ଏଇ ମେମସାହେବ । ଏଇ ଆମାର ଜୀବନ-ନାଟ୍ୟର ନାୟିକା ! ଏଇ ସେଇ ଚପଳା ଚକଳା ବାଲା ଯେ ଆମାର ଜୀବନ ଇତିହାସେର ମୋଡ଼ ସୁରିଯେଛେ ? ଏଇ ସେଇ ଶିଳ୍ପୀ ଯେ ଆମାର ଜୀବନେ ସ୍ଵର ଦିଯେଛେ, ଚୋଥେ ସ୍ଵପ୍ନ ଦିଯେଛେ । ଭାବଲାମ, ଏଇ ସେଇ ମେଯେ ଯେ ଆମାର ଜୀବନେ ନା ଏଲେ ଆମି କୋଥାଯା ସବାର ଅଳକ୍ଷ୍ୟ ହାରିଯେ ଯେତାମ, ଶୁକନୋ ପାତାର ମତ କାଳବୈଶାଶ୍ଵିର ମାତାଳ ହାଓଯାଯ ଅଞ୍ଜାନା ଭବିଷ୍ୟତେର କୋଲେ ଚିରକାଳେର ଝଞ୍ଜ ଲୁକିଯେ ପଡ଼ିତାମ ?

ଭାବତେ ଭାବତେ ଭାରୀ ଭାଲ ଲାଗଲ । ଓର କପାଳେର 'ପର ଥେକେ ଚଲଗୁଲୋ ସରିଯେ ଦିଯେ ଏକଟୁ ଆଦର କରଲାମ ।

ମେମସାହେବ କାତ ହୟେ ଶୁଯେଛିଲ । ଓର ଦୀର୍ଘ ମୋଟା ବିମୁନିଟୀ କୀଧର ପାଶ, ବୁକେର 'ପର ଦିଯେ ଏସେ ବିଛାନାୟ ଲୁଟିଯେ ପଡ଼ିଛିଲ । ଆମି ମୁଝ ହୟେ ଆରୋ ଅନେକକ୍ଷଣ ଚେଯେ ରଇଲାମ । ଓର ଛନ୍ଦୋବନ୍ଧ ଦେହେର ଚଢାଇ-ଉତ୍ତରାଇ ଦେଖେ ଯେନ ମନେ ହଲୋ ଆଞ୍ଜିଟିଲୀସ'ର ଭେନାସ

বা সাঁচীর ষষ্ঠী টর্সো ! নাকি ধাঙ্গুরাহো'র নারিকা, অজস্তার  
মারকশ্চা !

মনে পড়ল ঈত্তার প্রতি মিলটনের কথা—‘O fairest of  
creation last and best, of all God’s works’

ঈত্তার মত মেমসাহেবের নিশ্চয়ই অত স্বন্দরী ছিল না কিন্তু  
আমার চোখে আমার মনে সে তো অনশ্চা ! আমার শ্বামা  
মেমসাহেবকে মুঝ হয়ে দেখলাম অনেকক্ষণ। তাবলাম বাইবেলের  
মতে তো নারাই ভগবানের শেষ কৌর্তি, শ্রেষ্ঠ কৌর্তি। কিন্তু সবাই  
কি মেমসাহেব হয় ? দেহের এই মাধুর্য, চোখে এমনি স্পন,  
চরিত্রে এই দৃঢ়তা, মনের এই প্রসারতা তো আর কোথাও  
পেলাম না ।

ঘূমিয়ে ঘূমিয়েও যেন ও আমাকে ইশারা করল। মনে হলো  
যেন ডাক দিল ওগো, কাছে এসো না, দূরে কেন ? তুমি কি  
আমাকে তোমার বুকের মধ্যে তুলে নেবে না ?

আমি হাসলাম। মনে মনে বললাম, পোড়ামুঢ়ী তুই তো  
জানিস না, তোকে বেশী আদর করতেও আমার ভয় হয়। তোকে  
বেশীক্ষণ বুকের মধ্যে ধরে রাখলে জালা করে, ভয় ধরে ।

ভয় ?

হ্যা, হ্যা, ভয়। ভয় হবে না ? যদি কোনদিন কোন কারণে  
কোন দৈবছর্বিপাকে আমার বুকটা খালি হয়ে যায় ? তখন ?

ঘূমিয়ে ঘূমিয়েই মেমসাহেব ওর ডান হাতটা আমার কোলের  
'পর ফেলে একটু জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করল। যেন বলল, না গো,  
না, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না ।

আমি মেমসাহেবকে একটু কাছে টেনে নিলাম, একটু আদর  
করলাম ।

ঞি সকালবেলার মিষ্টি সূর্যের আলোয় মেমসাহেবকে আদর  
করে বড় ভাল লাগল। কিন্তু আনন্দের ঞি পরম মুহূর্তেও একবার

মনে হলো, সক্ষ্যায় তো স্থৰ্য অস্ত যায়, পৃথিবীতে তো অস্কার নেমে  
আসে।

জান দোলারোদি, ঐ হতচাড়ী মেয়েটাকে যখনই বেশী করে  
কাছে পেয়েছি তখনই আমার মনের মধ্যে ভয় করত। কেন করত  
তা জানি না কিন্তু আজ মনে হয়—

থাকগে। ওসব কথা বলতে শুরু করলে আবার সব কিছু  
গুলিয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে আমার  
মেমসাহেবের কাহিনী শোনাতে হবে। সময় বাঢ়ের বেগে এগিয়ে  
চলেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা শুভলগ্নে আমাকে তো  
তোমার পাত্রীক্ষ করতে হবে। তাই না ? তাছাড়া আমারও তো  
বয়স বাঢ়ছে। বয়স বেশী হয়ে গেলে কি আমার কপালে কিছু  
জুটবে ?

ঐ অরণ্য-পর্বত-লেকের ধারের রাজপ্রাসাদে ছুটি দিন, ছুটি রাত্রি  
স্বপ্ন দেখে আমরা আবার দিল্লী ফিরে এলাম। ফিরে এলাম ঠিকই  
কিন্তু যে মেমসাহেব আর আমি গিয়েছিলাম সেই আমরা ফিরে  
এলাম না। ফিরে এলাম সম্পূর্ণ নতুন হয়ে।

দিল্লীতে ফিরে এসে মেমসাহেব একটি মুহূর্তও নষ্ট করে নি।  
সংসার পাতার কাজে মেতেছিল। একটা স্কুটার রিঙ্গা নিয়ে তুঞ্জনে  
মিলে দিল্লীর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছিলাম তবিষ্যতের আস্তানা পছন্দ  
করবার আশ্য। করোলবাগ, ওয়েস্টার্ন এক্সটেনশন, নিউ  
রাজেশ্বরগর, ইস্ট প্যাটেল নগর থেকে দক্ষিণে নিজামুদ্দীন, জংপুরা,  
ডিফেল, সাউথ এক্সটেনশন, কৈলাস, হাউসখাস, গ্রীনপার্ক পর্যন্ত  
ঘুরেছিলাম। সব দেখেশুনে ও বলেছিল, গ্রীনপার্কেই একটা ছোট  
কটেজ নেব আমরা।

‘এত জায়গা থাকতে গ্রীনপার্ক ?’

‘শহর থেকে বেশ একটু দূরে আর বেশ কাঁকা কাঁকা আছে।’

‘বড় দূর।’

‘তা, হোক। ভুগ থেকে শাস্তি পাওয়া থাবে।’

‘তা ঠিক।’

পরে আবার বলেছিল, হ'তিন মাসের মধ্যেই বাড়ি ঠিক করবে।  
তারপর একটু গোছগাছ করে নিয়েই আমরা সংসার পাতব।

হাত দিয়ে আমার মুখটা নিজের দিকে ঝুরিয়ে নিয়ে মেমসাহেব  
জিজ্ঞাসা করল, কেমন? তোমার আপত্তি নেই তো?

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, না।

আরো হ'চারটে কি যেন কথাবার্তা বলার পর ও আমার গলাটা  
জড়িয়ে ধরে বলল, দেখ না, বিয়ের পর তোমাকে কেমন জরু  
করি!

‘কি জরু করবে?’

‘আজেবাজে খাওয়া-দাওয়া ফালতু আড়া দেওয়া সব বক্ষ করে  
দেব।’

‘তাই বুঝি?’

‘তবে কি?’

এবার আমিও একটা হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে  
বললাম, আর কি করবে মেমসাহেব?

আধো আধো গলায় উভয় দিল, সব কথা বলব কেন?

‘তাই বুঝি?’

‘তবে কি? বাট ইউ উইল সী আই উইল মেক ইউ হাপি।’

‘তা আমি জানি। তবে মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়।’

‘কি ভয় হয়?’

আমি ওর কানে কানে কিসফিস করে বললাম, আমি বোধহয়  
ন্ত্রেণ হবো!

মেমসাহেব আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, বাজে বকো  
না।

একটু মুচকি হাসলেও বেশ সিরিয়াসলি বললাম, বাজে না

মেমসাহেব ! বিয়ের পর বোধহয় তোমাকে ছেড়ে আমি পাল্লাস্টে  
বা অফিসেও ষেতে পারব না !

এবার মেমসাহেব একটু ঘূচকি হালে ! বললে, চরিশ ঘটা  
বাড়ি বলে কি করবে ?

আবার কানে কানে ফিসফিস করে বললাম, তোমাকে নিম্নে  
শুয়ে থাকব ।

ও হেসে বললে, অসভ্য কোথাকার ! একটু থেমে আবার  
বললে, শুতে দিলে তো ?

আমি বললাম, শুতে না দিলে আমি চীৎকার করে, কান্নাকাটি  
করে সারা পাড়ায় জানিয়ে দেব ।

মেমসাহেব এবার আমার পাশ থেকে উঠে পড়ে । মুখ টিপে  
হাসতে হাসতে বললে, বাপরে বাপ ! কি অসভ্য !

আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরতে গেলাম । ও ছুটে বারান্দায়  
বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, পারল না । ঝাচল ধরে টানতে টানতে  
নিয়ে এলাম সোফার ওপর । ‘যদি বলি এখনই.....

হাতে ঘুঁষি পাকিয়ে বললে, নাক ফাটিয়ে দেব ।

‘সত্য ?’

এমনি করে মেমসাহেবের দিল্লীবাসের মেয়াদ ধীরে ধীরে শেষ  
হয়ে গেল । রবিবার বিকেলে ডিল্যুক্স এয়ার কণ্ট্রিসনড এক্সপ্রেস  
কলকাতা চলে গেল । ওয়েস্টার্ন কোর্ট থেকে স্টেশন রওনা হবার  
আগে মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করল, আমার বুকে মাথা রেখে  
জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদল ।

আমি ওকে আশীর্বাদ করলাম, আদর করলাম, চোখের জল  
মুছিয়ে দিলাম ।

এক সপ্তাহ ধরে ছজনে কত কথা বলেছি কিন্তু সেদিন ওর  
বিদায় মুহূর্তে ছজনের কেউই বিশেষ কথা বলতে পারিনি । আমি  
শুধু বলেছিলাম, সাবধানে থেকো । ঠিকমত চিঠিপত্র দিও ।

ও বলেছিল, ঠিকমত ধাওয়া-দাওয়া করো। তোমার শরীর কিন্তু ভাল না।

শেষে নিউ দিল্লী স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগে বলেছিল, তুমি কিন্তু আমাকে বেশীদিন একলা রেখো না। কলকাতায় আমি একলা থাকতে পারি না।

মেমসাহেব চলে গেল। আমি আবার ওয়েস্টার্ন কোর্টের শৃঙ্খলারে ফিরে এলাম। মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। খেতে গেলাম না। ডাইনিং হলে আমাকে দেখতে না পেয়ে গজানন এলো আমার ঘরে খবর নিতে। আমাকে অনেক অহুরোধ করল কিন্তু তবুও আমি খেতে গেলাম না। বললাম, শরীর খারাপ।

গজানন আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিল। সেজন্ত সেও আর দ্বিতীয়বার অহুরোধ না করে বিদায় নিল।

কলকাতা থেকে মেমসাহেবের পৌছনো সংবাদ আসতে না আসতেই আমি আবার কাজকর্ম শুরু করেছিলাম। পুরো একটা সপ্তাহ পার্লামেন্ট যাইনি, সাউথ ব্রক-নর্থ ব্রক যাইনি, মন্ত্রী-এম-পি-অফিসার-ডিপ্লোম্যাট দর্শন করিনি। এমন কি টাইপ রাইটার পর্যন্ত স্পর্শ করিনি।

হ'একদিন এদিক ঘোরাঘুরি করলাম কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন খবর-টবর পেলাম না। পার্লামেন্টে তখন আকশাই চীন সড়ক নিয়ে ঝড় বইছিল আয়ই। আইম মিনিস্টারও বেশ গরম গরম কথা বলছিলেন মাঝে মাঝেই। হ'চারজন পলিটিসিয়ান যুদ্ধ করবার পরামর্শ দিলেও আইম মিনিস্টার তা মানতে রাজী হলেন না। অথচ এইভাবে বক্তৃতার লড়াই কর্তব্য চলতে পারে? অল ইণ্ডিয়া রেডিও আর পিকিঙ বেতারের রাজনৈতিক মন্তব্যক তেতো হয়ে উঠেছিল। লড়াই করার কোন উঠোগ, আরোজন বা মনোবৃত্তি সরকারী মহলে না দেখায় আমার মনে স্থির বিশ্বাস হলো আলোচনা হতে বাধ্য।

হঁচারজন মিনিস্টারের ক্যাবিনেট মিনিস্টারের বাড়তে আর অফিসে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে কোন কিছুর হিদিশ পেলাম না। শেষে সাউথ ইন্ডিয়াকে ঘোরাঘুরি শুরু করলাম। পরবর্তী মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী ও স্পেশ্যাল সেক্রেটারীকেও তেল দিয়ে কিছু ফল হলো না।

শেষে আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি এমন সময়...

আফ্রিকা ডেঙ্গের মিঃ চোপরার সঙ্গে আড়া দিয়ে বেরুতে বেরুতে প্রায় সাড়ে ছ'টা হয়ে গেল। বেরুবার সময় প্রাইম মিনিস্টারের ঘরের সামনে উঁকি দিতে গিয়ে দেখলাম, প্রাইম মিনিস্টার লিফট'এ ঢুকেছেন। আমি তাড়াতাড়ি ছড়মুড় করে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

প্রাইম মিনিস্টার গাড়ির দরজার সামনে এসে গিয়েছেন, পাইলট তার মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়েছে, অয়ারলেস আর সিকিউরিটি কারও স্টার্ট দিয়েছে কিন্তু চলতে শুরু করে নি, এমন সময় ফরেন সেক্রেটারী প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলেন। কানে কানে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কি যেন কথা বললেন। প্রাইম মিনিস্টার আর ফরেন সেক্রেটারী আবার লিফট'এ ঢেউ উপরে চলে গেলেন।

আমি একটু পাশে দাঢ়িয়ে সব কিছু দেখলাম। বুবলাম, সামথিং তেরী সিরিয়াস অথবা সামথিং ভেরী আর্জেন্ট। তা নয়ত ঐভাবে ফরেন সেক্রেটারী প্রাইম মিনিস্টারকে অফিসে ফেরত নিয়ে যেতেন না।

আমি প্রাইম মিনিস্টারের অফিসের পাশে ভিজিটার রুমে বসে রইলাম। দেখলাম, বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে প্রাইম মিনিস্টার আবার বেরিয়ে গেলেন। প্রাইম মিনিস্টারকে এবার দেখে মনে হলো, একটু যেন স্বস্তি পেয়েছেন মনে মনে।

আমি আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম। দেখলাম

প্রাইম মিনিস্টার চলে যাবার পর পরই চাইনা ডিভিশনের অরেক্ষ সেক্রেটারী মিঃ মালিক ফরেন সেক্রেটারীর ঘর থেকে বেরিয়ে আলেন।

আমার আর বুঝতে বাকি রাইল না চীন সম্পর্কেই কিছু জরুরী অবর এসেছে।

সেদিনকার মত আমি বিদায় নিলাম। পরের দিন থেকে মিঃ মালিকের বাড়ি আর অফিস ঘূরঘূর করা শুরু করলাম। তবুও কিছু স্মৃতিধা হলো না।

শেষে ইউনাইটেড নেশনস ডিভিশনের একজন সিনিয়র অফিসারের কাছে খবর পেলাম সীমান্ত বিরোধ আলোচনার জন্য চীন। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইকে দিল্লী আসার আমন্ত্রণ জানান হয়েছে এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

খবরটি সে বাজারে প্রায় অবিষ্কাশ হলেও যাচাই করে দেখলাম, ঠিকই। দিল্লীর বাজার তখন অত্যন্ত গরম কিন্তু তবুও আমি খবরটা পাঠিয়ে দিলাম। ট্রাঙ্ককল করে নিউজ এডিটরকে ব্রিফ করে দিলাম। পরের দিন ডবল কলম হেডিং দিয়ে সেকেণ্ড লীড হয়ে ছাপা হলো, চৌ এন-লাই দিল্লী আসছেন।

এই খবরটা দেবার জন্য প্রায় সবাই আমাকে পাগল ভাবল। আমার এডিটরের কাছেও অনেকে অনেক বিক্রম মন্তব্য করলেন। এডিটর চিন্তিত হয়ে আমাকে ট্রাঙ্ককল করলেন। আমি বললাম, একটু ধৈর্য ধরুন।

এক সপ্তাহ ঘূরতেই লোকসভায় কোশেন-আওয়ারের পর অয়ঃ প্রাইম মিনিস্টার ঘোষণা করলেন, প্রিমিয়ার চৌ এন-লাই তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সীমান্ত বিরোধ আলোচনার জন্য দিল্লী আসছেন।

বিনা মেষে বজ্জাঘাত হলো অনেকের মাথায়। আমি কিন্তু আনন্দে ধৈর্য ধেই করে নাচতে শুরু করলাম। রাতে এডিটরের

টেলিগ্রাম পেলাম, কনগ্রাচুলেশনস্ স্পেশ্যাল ইনক্রিপ্টে ট্রি-ফিফ্টি উইথ ইমিডিয়েট একেক্ট। হুঁহাত তুলে ভগবানকে প্রণাম করলাম।

সেই রাত্রেই মেমসাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে সুখবরটা জানিয়ে দিলাম।

পরের দিন মেমসাহেবেরও একটা টেলিগ্রাম পেলাম, এ্যাকসেপ্ট কনগ্রাচুলেশনস্ অ্যাণ্ড প্রণাম স্টপ লেটার ফলোজ।

মেমসাহেবের চিঠি পাবার পরও ভাবতে পারিনি ভবিষ্যতে আরো কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে আমার জীবনে। কিন্তু সত্য সত্যিই ঘটল। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে ইউরোপ যাবার তুর্লত সুযোগ এলো আমার জীবনে কয়েক মাসের মধ্যেই।

বিদ্যায় জ্ঞানাবার জন্য মেমসাহেব দিলী ছুটে এসেছিল। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমাকে সী-অফ করার জন্য তুমি কলকাতা থেকে দিলী এলো ?

হৃটি হাত দিয়ে আমার হৃটি হাত দোলাতে দোলাতে বলেছিল, তুমি প্রথমবারের জন্য ইউরোপ যাচ্ছ আর আমি চুপ করে বসে থাকব কলকাতায় ?

ঝি কালো হরিণ চোখ শুরিয়ে-ক্রিয়ে বললো, তাও আবার প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে চলেছ ! আমি না এসে থাকতে পারি ?

পাগলীর কথাবার্তা শুনে আমার হাসি পেতো। কত হাজার হাজার লোক বিদেশ যাচ্ছ ! তার জন্য এক হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে এসে বিদ্যায় জ্ঞানাতে হবে ?

হুঁহাত দিয়ে আমার মুখখানা তুলে ধরে মেমসাহেব বললো, এসেছি, বেশ করেছি ! তোমাকে কৈকীয়ত দিয়ে আসব ?

বল দোলাবৌদ্ধি, অমন পাগলীর সঙ্গে কি তর্ক করা যায় ? যায় না। তাই আমিও আর তর্ক করিনি।

পাশপোর্ট-ভিসা-ফরেন এজচেঞ্জ আগেই ঠিক ছিল। এয়ার-

প্রায়সেই আগের খেকেই বুক করা ছিল। ছজনে মিলে এয়ার ইণ্ডিয়ার  
অফিসে গিয়ে টিকিটটা নেবার পর কটনপ্লেসে কয়েকটা ছোটখাট  
জিনিসপত্র কিনলাম। তারপর কফি হাউসে গিয়ে কফি খেয়ে ফিরে  
এলাম ওয়েস্টার্ন কোর্টে।

কেবার পথে মেমসাহেব বললো, দেখ তোমার কাজকর্ম আজই  
শেষ করবে। কালকে কোন কাজ করতে পারবে না।

‘কেন? কাল কি হবে?’ আমি জানতে চাইলাম।

ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ শুরিয়ে ও বললো, বাঃ পরশু ভোরেই তো  
চলে যাবে। কালকের দিনটাও আমি পেতে পারি না?

লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম করে বেরিয়েছিলাম বাকি কাজগুলো  
শেষ করার জন্য। তারপর এক্টারনাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি তে  
গিয়ে দেখাশুনা করে ফিরে এলাম সঙ্ক্ষার পরই।

এসে দেখি মেমসাহেব একটা চমৎকার বালুচরী শাড়ি পরেছে,  
বেশ চেপে কান ঢেকে চুল বেঁধেছে, বিরাট ঝোপায় ঝোপার কাটা  
গুঁজেছে। ঝোপার চেন’এ টিবেটিয়ান লকেট লাগানো একটা হার  
ছাড়া আরো কয়েকটা ঝোপার গহনা পরেছে। কপালে টকটকে  
লাল একটা বিরাট টিপ ছাড়াও চোখে বোধ হয় একটু সুরমার টান  
আগিয়েছিল।

আমি ঘরে ঢুকে মেমসাহেবকে দেখেই থমকে দাঢ়িলাম। ও  
মুখটা একটু নীচু করে চোখটা একটু শুরিয়ে আমার দিকে তাকাল।  
একটু হাসল।

আমি হাসলাম না, হাসতে পারলাম না। আগের মতই স্থির  
দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

ও আবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল। জিজ্ঞাসা  
করল, অমন স্থির হয়ে কি দেখছ?

‘তোমাকে’

স্থাকামি করে ও আবার বললো, আমাকে?

‘বুঝতে পারছ না ?’

একটু হাসল। বললো, তা তো বুঝতে পেরেছি কিন্তু অমন করে দেখবার কি আছে ?

‘কেন দেখছি তা বুঝতে পারছ না ? দেখবার কি কোন কারণ নেই ?’

মেমসাহেব এবার আর তর্ক না করে থীর পদক্ষেপে দেহটাকে একটু ছলিয়ে ছলিয়ে আমার সামনে এসে দাঢ়াল। আমার হাত ছট্টো ধরে মুখটা একটু বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, খুব খারাপ লাগছে ?

আমি প্রায় চৌৎকার করে উঠলাম, অসহ, অসহ !

‘সত্য খারাপ লাগছে ?’

‘অত খারাপ কি না তা জানি না, তবে তোমাকে আমি সহ করতে পারছি না !’

ও এবার সত্য একটু চিন্তিতা হয়ে প্রশ্ন করল, এসব খুলে ফেলব ?

এতক্ষণ প্রায় আমার সামনে দাঢ়িয়ে কথা বলছিল। এবার শুকে পাশে টেনে নিয়ে বললাম, হে নিরূপমা, চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।...আর হে নিরূপমা, আঁধি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।

দোলাবৌদি, মেমসাহেবও কোন কথা বলল না। ছুটি হাত দিয়ে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে মাথাটা হেলান দিয়ে খুব মিহিমুরে গাইল, আমি কৃপে তোমায় ভোলাব না ভালবাসায় ভোলাব।

আমি প্রশ্ন করলাম, আর কি করবে ?

মেমসাহেব গাইতে গাইতে বললো, ভৱাব না ভূষণভাবে, সাজাব না ফুলের হারে—সোহাগ আমার মালা করে গলায় তোমার দোলাব।

আমি বললাম, সত্যি ?

‘হাজারবার লক্ষবার সত্ত্বি !’

মেমসাহেব গজাননকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল। চা এলো।

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি এয়ার ইঙ্গিয়া বা ট্রাইস্টবুরোর চাকরির ইটারভিউ দিতে যাচ্ছ ?

‘কেন বলতো ?’

‘তা নয়ত এত ক্লিপার গহনা চাপিয়েছ কেন ?’

‘আমার খুব ভাল লাগে।’ কেন তোমার খারাপ লাগছে ?

‘পাগল হয়েছ ?’ খারাপ লাগবে কেন ? খুব ভাল লাগছে !

‘সত্ত্বি ?’

‘সত্ত্বি ছাড়া কি মিথ্যা বলছি ?’

‘যাই হোক এত সাজলে কেন ?’

‘তোমার ভাল লাগবে বলে।’

একটু খেমে আবার বললো, তাছাড়া...

‘তাছাড়া কি ?’

মুখটা একটু লুকিয়ে, বললো, ইউরোপ যাচ্ছ। না জানি কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবে। তাই যাতে চট করে ভুলে না যাও...

‘আমাকে নিয়ে আজো তোমার এত ভয় ?’

আমাকে একটু আদর করে মেমসাহেব বললো, না গো না। এমনি সেজেছি।

সেদিন সন্ধ্যা-রাত্রি আর পরের দিনটা পুরোপুরি মেমসাহেবকে দিয়েছিলাম।

তারপর বিদায়ের দিন এয়ারপোর্ট রওনা হবার আগে মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করেছিল, আমি ওকে আশীর্বাদ করেছিলাম। কিন্তু তবুও ও চুপ করে দাঢ়িয়ে রইল। মনে হলো যেন কিছু বলবে। জানতে চাইলাম, কিছু বলবে ?

কিছু কথা না বলে মাথা নীচু করে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মুচকি মুচকি হাসছিল।

আমি ওর মুখ্টা আলতো করে তুলে ধরে আবার জানতে ছাইলাম, কি, কিছু বলবে ?

অনেকক্ষণ ধরে অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পর হতচ্ছাড়ী আমার কানে কানে কি বলেছিল জান দোলাবৌদি ? বলেছিল, আমাকে আর একটু ভাল করে আদুর কর ।

কি করব ? বিদ্যায়বেলায় এই অহুরোধ না রেখে আমি পারিনি । সত্য একটু ভাল করেই আদুর করলাম আর ওর দেহে একটা চিহ্ন রেখে গেলাম, যে চিহ্ন শুধু মেমসাহেবই দেখেছিল কিন্তু ছনিয়ার আর কেউ দেখতে পারে নি ।

পালামের মাটি ছেড়ে আমি চলে গেলাম ।

ঘূরতে ঘূরতে শেষে লগুন পৌঁছে মেমসাহেবের চার-পাঁচটা চিঠি একসঙ্গে পেলাম । বার বার করে লিখেছিল, কেরার সময় তুমি দিল্লীতে না গিয়ে যদি সোজা কলকাতা আস, তবে খুব ভাল হয় । কলেজে টেস্ট শুরু হয়েছে ; স্বতরাং এখন ছুটি নেওয়া যাবে না । অথচ তুমি ফিরবে আর আমি তোমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করব না, তা হতে পারে না ।

শেষে লিখেছিল, তুমি করে, কোন্ ফ্লাইটে, কখন দমদমে পৌঁছবে, সে খবর আর কাউকে জানাবে না । দমদমে যেন ভিড় না হয় । শুধু আমিই তোমাকে রিসিভ করব, আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি যেন এয়ারপোর্টে না থাকে ।

মেমসাহেব আমাকে বিদ্যায় জানাবার জন্য কলকাতা থেকে দিল্লী ছুটে এসেছিল । স্বতরাং আমি ওর এই অহুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না । বগু স্ট্রীটে এয়ার ইণ্ডিয়া অফিসে গিয়ে আরো কিছু পেমেন্ট করে টিকিটটা চেঙ্গ করে আনলাম । তারপর রওনা হবার আগে মেমসাহেবকে একটা কেবল করলাম, রিচিং ডামডাম এয়ার ইণ্ডিয়া স্টারডে মর্গিং । মঙ্গা করবার জন্য শেষে উপদেশ দিলাম, ডোক্ট ইনফর্ম এনিবড়ি ।

সেদিন দমদমে অরেঞ্জ পাত্রের একটা তাঁতের শাড়ি আৱ অৱেঞ্জ  
ৱং-এন্ড একটা ব্লাউজ পৰে, রোদুৰেৰ মধ্যে মাথায় ষেমটা  
দিয়ে মেমসাহেব রেলিং'এৱ ধাৰে হাড়িয়েছিল আমাৱ আগমন  
প্ৰত্যাশায়। আমাৱ হু'হাতে ব্ৰিফকেশ, টাইপৱাইটাৱ, কেবিন-  
ব্যাগ আৱ ওভাৱকোট থাকায় হাত নাড়তে প্ৰাৱলাম না।  
শুধু একটু মুখেৰ হাসি দিয়ে ওকে জানিয়ে দিলাম, কিৱে  
এসেছি।

কাস্টমস-ইমিগ্ৰেশন কাউন্টাৱ পার হয়ে বাইৱে বেৱিয়ে  
আসতেই ও আমাৱ হাত থেকে টাইপৱাইটাৱ আৱ কেবিনব্যাগটা  
নিয়ে নিল। টাৰ্মিনাল বিল্ডিং থেকে বেৱিবাৱ সময় জিজ্ঞাসা কৱল,  
ভাল আছ তো ?

‘মাথা নেড়ে বললাম, হঁ্যা। তাৱপৰ জিজ্ঞেস কৱলাম, তুমি ?  
‘ভাল আছি।’

তাৱপৰ ট্যাঙ্কিতে উঠে মেমসাহেব আমাকে প্ৰণাম কৱল।  
আমি ওৱ মাথায় হাত দিয়ে বললাম, সুখে থাক, মেমসাহেব।

‘নিশ্চয়ই সুখে থাকব।’

তাৱপৰ আমি বলেছিলাম, জান, এই শাড়িটা আৱ ব্লাউজ পৰে  
তোমাকে তাৱী ভাল লাগছে।

খুব খুশি হয়ে হাসিমুখে ও বললো, সত্যি বলছ ?

‘সত্যি বলছি। তোমাকে বড় শাস্ত্ৰ, স্নিফ, মিষ্টি লাগছে।’

একটু পৰে আবাৱ বলেছিলাম, ইচ্ছা কৱছে তোমাকে জড়িয়ে  
থৰে একটু আদৰ কৱি।

মেমসাহেব হু'হাত জোড় কৱে বলেছিল, দোহাই তোমাৱ, এই  
ট্যাঙ্কিৰ মধ্যে আছৰ কৱো না।

দোলাৰোদি, এমনি কৱে এগিয়ে চলেছিলাম আমি আৱ  
মেমসাহেব। আমি দিল্লীতে থাকতাম, ও কলকাতায় থাকত।  
কখনও লুকিয়ে-চুৱিয়ে মেজদিকে হাত কৱে ও দিলী আসত, কখনও

বা আমি কলকাতা যেতাম। মাঝে মাঝেই আমাদের দেখা হতো।  
বেশীদি ন দেখা না হলে আমরাও শান্তি পেতাম না।

ইতিমধ্যে একজন শাভাল অফিসারের সঙ্গে মেমসাহেবের  
মেজদির বিয়ে হলো। বিয়ের নিম্নৰূপ রক্ষা করতে আমি কলকাতা  
গিয়েছিলাম। একটা তাল প্রেজেন্টেশনও দিয়েছিলাম।

মেজদির বিয়েতে গিয়ে ভালই করেছিলাম। এই উপলক্ষ্যে  
আমার সঙ্গে ওদের পরিবারের অনেকের আলাপ-পরিচয় হলো।  
তাছাড়া এই বিয়ে বাড়িতেই মেজদি আমাদের ব্যাপারটা পাকাপাকি  
করে দিয়েছিলেন। আমার হাত ধরে টানতে টানতে মেজদি ওর  
মা'র সামনে হাজির করে বলেছিলেন, হঁয় মা, এই রিপোর্টারের  
সঙ্গে তোমার এই ছোটমেয়ের বিয়ে দিলে কেমন হয় ?

এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম  
না। লজ্জায় আমার চোখ-মুখ-কান লাল হয়ে উঠেছিল। তবুও আমি  
অনেক কষ্টে ভণিতা করে বললাম, আঃ মেজদি ! কি যা তা বলছেন ?

মেজদি আমাকে এক দাবড় দিয়ে বললেন, আর ঢং করবেন  
না। চুপ করুন।

তারপর মেজদি আবার বললেন, কি মা ? তোমার পছন্দ হয় ?

এত সহজে এই কালো-কুচ্ছিত হতভাড়ী মেয়েটাকে যে আমার  
মত শুপাত্রের হাতে সমর্পণ করতে পারবেন, মেমসাহেবের মা তা  
স্বপ্নেও ভাবেন নি। তাই বললেন, তোদের যদি পছন্দ হয় তাহলে  
আর আমার কি আপত্তি থাকবে বল ?

বিয়ে বাড়ি। ঘরে আরো অনেক লোকজনে ভর্তি ছিল। ওদের  
সবার সামনেই মেজদি আমার ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন,  
নিন, মাকে প্রণাম করুন।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। কিন্তু কি করব ? প্রণাম করলাম।

এবার মেজদি আমার মাথাটা চেপে ধরে বললেন, নিন, এবার  
আমাকে প্রণাম করুন।

আমি প্রতিবাদ করলাম, আপনাকে কেন প্রণাম করব ?

মেজদি চোখ রাঞ্জিয়ে বললেন, আঃ ! যা বলছি তাই করুন।  
তা নয়ত সবকিছু কাস করে দেব ।

আশেপাশের সবাই গিলে গিলে মেজদির কথা শুনছিলেন আর  
হাঁ করে আমাকে দেখছিলেন ।

আমি এদিক-ওদিক বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে মেজদিকে চোখ টিপে  
ইশারা করলাম ।

গুভাল অফিসারকে পেয়ে মেজদির প্রাণেতখন আনন্দের বশ্য।  
আমার ইশারাকে সে তখন গাহু করবে কেন ? তাই সবার সামনেই  
বলে ফেললেন, ওসব ইশারা-টিসারা ছাড়ুন । আগে প্রণাম করুন  
—তা নয়ত.....

দোলাবোদি, তুমি আমার অবস্থাটা একবার অহুমান কর ।  
বিয়ে বাঢ়ি । চারদিকে লোকজন গিজ্জিজ করছে । তারপর ঐ  
রংগুলিধারী বধুবেশী মেজদি ! বীরত দেখিয়ে বেশী তর্ক করলে না  
জানি হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙে মেজদি কি সর্বনাশই করত ! টিপ  
করে একটা প্রণাম করেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু মেজদি  
আবার টেনে ধরে বললেন, আহা-হা ! একটু দাঢ়ান ।

হুক্কার ছেড়ে বললেন, এ যে দিদি দাঢ়িয়ে আছে । দিদিকে  
প্রণাম করুন ।

আমি একটু ইতস্তত করতেই মেজদি আবার তয় দেখালেন,  
খবরদার রিপোর্টার । অবাধ্য হলেই...

দিদিকেও প্রণাম করলাম ।

দিল্লী আসার দিন মেমসাহেব স্টেশনে এসে বলেছিল, জান,  
তোমাকে সবার খুব পছন্দ হয়েছে ।

স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সবার সামনেই ও আমাকে প্রণাম করল,  
আমি ওকে আশীর্বাদ করলাম । দিল্লী মেল ছেড়ে দিল ।

## সতের

মেজদি যে এত তাড়াতাড়ি আমাদের এত বড় উপকার করবেন,  
তা কোনদিন ভাবিনি। শুধু ভাবিনি নয়, কল্পনাও করিনি।  
মেমসাহেব আমাকে ভালবাসত, আমি মেমসাহেবকে ভালবাসতাম।  
সে ভালবাসায় কোন ফাঁকি, কোন ভেজাল ছিল না। আমরা  
নিশ্চিত জানতাম আমরা মিলবই। শত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ করেও  
আমরা মিলতাম।

কিন্তু তবুও মেজদির ঐ সাহায্য ও উপকারটুকুর একান্ত  
প্রয়োজন ছিল এবং মেজদির প্রতি আমরা দৃঢ়নেই কৃতজ্ঞ  
ছিলাম।

আসলে মেজদি বরাবরই আমাকে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন।  
আমারও মেজদিকে বড় ভাল লাগত। প্রথম দিন থেকেই মেজদিরও  
আমাকে ভাল লেগেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মেজদি আমাদের  
দৃঢ়নের ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই মনে মনে  
ছোট বোনকে তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে।

এবার তো সারা ছনিয়াকে জানিয়ে দিলেন, মেমসাহেব আমার,  
আমি মেমসাহেবের। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা। মূল্যের সম্পত্তির  
হস্তান্তরের সবকিছু পাকাপাকি হয়ে গেল। শুধু এক সাব-  
রেজিস্ট্রারের সই আর সৌলমোহর লাগান বাকি রইল। এই  
কার্জটুকুর জন্য আমি বিশেষ চিহ্নিত ছিলাম না।

মেমসাহেব অনেকদিন আগে বললেও আমি এতদিন বাড়ি  
ভাড়া নেবার কথা খুব সিরিয়াসলি ভাবিনি। সেবার কলকাতা  
থেকে ফিরে সত্য সত্যই গ্রীনপার্ক ঘোরাঘুরি শুরু করলাম, তু'  
চারজন বন্ধু-বন্ধুবকেও বললাম।

হ' চারটে বাড়ি দেখলাম কিন্তু ঠিক পছন্দ হলো না। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলাম। আরো কিছু বাড়ি দেখলাম। বন্ধুবদের সঙ্গে আরো কিছু পরামর্শ করলাম। কয়েকটা বাড়ির জন্য দরদন্তরও করলাম।

এমনি করে আরো মাস দুই কেটে যাবার পর সত্য সত্যই তিনখানা ঘরের একটা ছোট কটেজ পেলাম তিনশ' টাকায়। বাড়িটা আমার বেশ পছন্দ হলো। মেহরলী রোড থেকে বড় জ্বোর দুশ্মা গজ হবে। গ্রীনপার্ক মার্কেট বেশ কাছে, মিনিট তিন-চারের রাস্তা। বাজার দূরে হলে মেমসাহেবের পক্ষে কষ্টকর হতো। তাছাড়া বাড়িটাই বেশ ভাল। কর্নার প্লট। সামনে আর পাশে মাঝারি সাইজের লন। গেটের ভিতর দিয়ে বৃক্ষের ভিতরে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। ড্রাইং-ডাইনিং রুমটা তো বেশ বড়। কুড়ি বাই পনের। একটা বেডরুম বড়, একটা ছোট। ছুটো বেডরুমেই লফট আর ওয়ারড্রব। বড় বেডরুম আর ড্রাইং-ডাইনিং রুমের মাঝে একটা ওয়েস্টার্ন স্টাইলের বাথরুম। বাড়ির ভিতরে একটা ইণ্ডিয়ান স্টাইলের প্রিভি। সামনের বারান্দাটা অনেকটা লম্বা থাকলেও বিশেষ চওড়া ছিল না। ভিতরের বারান্দাটা ক্ষোঘার সাইজের বেশ বড় ছিল। রান্নাঘর? দিল্লীর নতুন বাড়িতে যেমন হয়, তেমনিই ছিল। আলমারী—মিটসেফ—সিঙ্ক-কাপবোর্ড সবই ছিল। লক্ট, আলমারী ওয়ারড্রব থাকার জন্য আলাদা কোন স্টোর ছিল না কিন্তু ছাদে একটা দরজা-বিহীন ঘর ছিল।

লন ছুটো বেশ ভাল ছিল সত্য কিন্তু দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত বাড়ির মত এই বাড়িটায় কোন ফুলগাছ ছিল না। আগে যিনি ভাড়া ছিলেন, তার নিশ্চয়ই ফুলের শখ ছিল না। তবে সামনের বারান্দার এক পাশ দিয়ে একটা বিরাট মাধবীলতা উঠেছিল।

শোটকথা সব মিলিয়ে বাড়িটা আমার বেশ ভাল লেগেছিল। তাছাড়া আমার মত ডাকাতের হাতে পড়ে মেমসাহেব ফ্যামিলি

প্লানিং এসোসিয়েশনের সভানেত্রী হলেও এ বাড়িতে থাকতে অসুবিধা হবে না বলে বাড়িটা আরো ভাল লেগেছিল।

বাড়িটা নেবার পর মেমসাহেবকে কিছু জানালাম না। ঠিক করলাম ও দিলী আসার আগেই বেশ কিছুটা সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে চমকে দেব। আবার ভাবলাম, ওয়েস্টার্ন কোর্ট ছেড়ে এই বাড়িতেই চলে আসি। পরে ভাবলাম, না, না, তা হয় না। একলা একলা থাকব এই বাড়িতে? অসম্ভব। ঠিক করলাম ওকে নিয়েই এই বাড়িতে চুকব।

গজাননকে আমার এই নতুন বাড়িতে থাকতে দিলাম। আমি ওকে বললাম গজানন, তুমি আমার বাড়িটার দেখাশুনা কর। আমি এর জন্য তোমাকে মাসে মাসে কিছু দেব।

গজানন সাফ জবাব দিয়েছিল, নেই নেই, ছোটসাব, তুমি আমার হিসেব-টিসেব করতে পারবে না। আমি বিবিজির কাছ থেকে যা নেবার তাই নেব।

গজানন বাসে যাতায়াত করত। ডিউটি শেষ হবার পর এক মিনিটও অপেক্ষা করত না। সোজা চলে যেত গ্রীনপার্ক।

আমি আমার বাড়িত আড়াইশ' টাক! দিয়ে কেনাকাটা শুরু করে দিলাম। একটা সোফা সেট কিনলাম, একটা ডবল বেডের খাট কিনলাম। ওয়েস্টার্ন কোর্ট থেকে আমার বইপত্র এই বাড়িতে নিয়ে গেলাম। বিদেশ থেকে কিনে আনা ডেকরেশন পিসগুলোও সাজালাম।

তারপর এক মাসে সমস্ত ঘরের জন্য পর্দা করলাম। তাছাড়া যখন যেরকম বাতিক আর সামর্থ্য হয়েছে, তখন কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ এস্পোরিয়াম্ বা অন্য কোন সেট এস্পোরিয়াম্ থেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনে ঘরদোর সাজাছিলাম।

গজানন বড় দুরদ নিয়ে বাড়িটার দেখাশুনা করছিল। দীর্ঘদিন ওয়েস্টার্ন কোর্টে কাজ করার ফলে ওর বেশ একটা কুচিবোঝ

হয়েছিল। মানি প্যান্ট, ক্যাকটাস, ফার্ন দিয়ে বাড়িট চমৎকার সাজাল।

আমি যখনই দিলীর বাইরে গেছি, গজানন তখনই করমায়েশ করে ছোটখাট সুন্দর সুন্দর জিনিস আনিয়েছে। হায়দ্রাবাদ থেকে দশ-পনের টাকা দামের ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর উড় কাণ্ডং এনেছি, বেনারস থেকে পাথরের জিনিস এনেছি, কলকাতা থেকে বাঁকুড়ার টেরেকোটা ঘোড়া আর কৃষ্ণনগরের ডঙ্গ এনেছি। উড়িষ্যা থেকে শ্বাশুর্স্টোনের কোনারক মূর্তি, কালীঘাট আর কটকি পটও এনেছিলাম আমাদের ড্রাইংরুমের জন্য।

বুক-সেলফ’এর উপর ছ’কোনায় ছটো ফটো রেখেছিলাম। একটা প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আমার ছবি আর একটা মেমসাহেবের প্রোট্রেট।

এদিকে যে এতকাণ্ড করছিলাম, সেসব কিছুই মেমসাহেবকে জানালাম না। ইচ্ছা করেই জানালাম না। ইতিমধ্যে বোম্বে থেকে মেজদির কাছ থেকে চিঠি পেলাম—  
ভাই রিপোর্টার,

যুক্ত না করেও যারা যোদ্ধা, ইণ্ডিয়ান নেতীর তেমনি এক অফিসারকে বিয়ে করে কি বিপদেই পড়েছি। সংসার করতে গিয়ে রোজ আমার সঙ্গে যুক্ত করছে, রোজ হেরে যাচ্ছে। রোজ বন্দী করছি, রোজ মুক্তি দিচ্ছি। তবে বার বার তো যুদ্ধ-বন্দীর প্রতি এত উদার ব্যবহার করা যায় না। এবার তাই শাস্তি দিয়েছি, দিল্লী যুরিয়ে আনতে হবে। তবে ভাই একথা স্বীকার করব বন্দী এক কথায়, বিনা প্রতিবাদে, শাস্তি হাসিমুখে মেনে নিয়েছে।

আর কিছুদিনের মধ্যেই তুমিও বন্দী হতে চলেছ। শাস্তি তোমাকেও পেতে হবে। তবে তুমি তোমার মেমসাহেবের কাছ থেকে শাস্তি পাবার আগেই আমরা হজনে তোমাকে শাস্তি দেবার জন্য দিল্লী আসছি।

প্রেসিডেন্টের খুব ইচ্ছা কে আমরা রাষ্ট্রপতি ভবনে ওর অতিথি হই। কিন্তু ভাই, তোমাকে ছেড়ে কি রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকা তাল দেখায়? তোমার মনে কষ্ট দিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকতে আমি পারব না। আমাকে ক্ষমা করো।

আগামী বুধবার ফ্রন্টিয়ার মেল অ্যাটেণ্ড করতে ভুলে যেও না। তুমি স্টেশনে না এলে অনিচ্ছা সঙ্গে বাধ্য হয়েই আবার সেই রাষ্ট্রপতি ভবনে যেতে হবে।

তোমার মেজদি।

বুধবার আমি ফ্রন্টিয়ার মেল অ্যাটেণ্ড করেছিলাম। মেজদিদের নিয়ে এসেছিলাম আমার গ্রীনপার্কের নতুন আস্তানায়। সারা জীবন কলকাতায় ঐ চারখানা ঘরের তিনতলার ফ্ল্যাটে কাটিয়ে আমার গ্রীনপার্কের বাড়ি মেজদির ভীষণ পছন্দ হয়েছিল।

যুক্ত না করেও যিনি যোদ্ধা, মেজদির সেই ভাগ্যবান বন্দী ঘরবাড়ি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, দেখেশুনে মনে হচ্ছে ম্যাডাম সপিং করতে গিয়েছেন। এক্সুনি এসে ড্রাইংরুমে বসে এককাপ কফি খেয়েই বেডরুমে লুটিয়ে পড়বেন।

তারপর জিঞ্জাসা করেছিলেন, ম্যাডাম'এর জন্য এত আয়োজন করার পর এ বাড়িতে আপনার একলা থাকতে কষ্ট হয় না?

আমি বলেছিলাম, আমি তো এখানে থাকি না। আমি শয়েস্টার্ন কোর্টেই থাকি।

আমার কথায় ওরা ছজনেই অবাক হয়েছিল। বোধহয় খুশি হয়েছিলেন। খুশি হয়েছিলেন এই কথা ভেবে যে একলা ভোগ করার জন্য আমি এত উত্তোল আয়োজন করিনি।

মেজদিরা তিনদিন ছিলেন। কখনো ওরা ছজনে, কখনও বা আমরা তিনজনে ঘুরে বেড়িয়েছি। ওদের দিল্লী ত্যাগের আগের দিন সক্ষ্যায় গ্রীনপার্কের বাড়ির ড্রাইংরুমে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমরা আজড়া দিয়েছিলাম।

কথায় কথায় মেজদি একবার বললেন, সংসার করার প্রাঙ্গ  
সবকিছুই তো আপনি যোগাড় করে ফেলেছেন। বিয়েতে  
আপনাদের কি দেব বলুন তো ?

আমি উত্তর দেবার আগেই বল্লী উত্তর দিলেন, আজেবাজে  
কিছু না দিয়ে একটা ফোমড় রাবারের গদি দিও। শয়ে আরাম  
পাবে আর প্রতিদিন তোমাকে ধ্যবাদ জানাবে।

এইসব আজেবাজে আলতু-ফালতু কথাবার্তা বলতে বলতে  
অনেক রাত হয়েছিল। মেজদি বললেন, আজ আর ওয়েস্টার্ন কোর্ট  
যাবেন না, এইখানেই থেকে যান।

আমি হেসে বলেছিলাম, না, না, তা হয় না।

‘কেন হয় না ?’

‘ওখানে নিশ্চয়ই জরুরী চিঠিপত্র এসেছে...’

মেজদি মাঝপথে বাধা দিয়ে বললেন, এত রাত্তিরে আর  
চিঠিপত্র দেখে কি করবেন। কাল সকালে দেখবেন।

আবার বললাম, না, না, মেজদি, আমি এখন এ-বাড়িতে  
থাকব না।

এবার মেজদি হাসলেন। বললেন, কেন ? প্রতিজ্ঞা করেছেন  
বুঝি যে, একলা একলা এই বাড়িতে থাকবেন না ?

আমি কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসলাম। একটু পরে  
বিদায় নিয়ে চলে এলাম ওয়েস্টার্ন কোর্ট।

পরের দিন স্টেশনে বিদায় জানাতে গেলে মেজদি আমাকে  
একটু আড়ালে ডেকে নিলেন। বললেন, আপনার মেমসাহেব  
বোঝে দেখেনি। তাই সামনের ছুটিতে আমাদের কাছে আসবে।  
ক'দিনের জন্য দিল্লী পাঠিয়ে দেব, কেমন ?

‘আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপকা মেহেরবানি !

মেজদি বললেন, মেহেরবানির আবার কি আছে ? বিয়ের  
আগে একবার সবকিছু দেখেশুনে যাক।

আমি এ-কথারও কোন জবাব দিলাম না। মাথা নীচু করে চুপটি করে দাঢ়িয়ে রইলাম। ট্রেন ছাড়ার মুখে মেজদি বললেন, ফাস্তনে বিয়ে হলে আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

আমি মাথা নীচু করেই বললাম, সে-সময় যে পার্লামেন্টের বাজেট সেসন চলবে।

‘তা চলুক গে! বেশী দেরী আৱ তাল লাগছে না।’

শেষে মেজদি বলেছিলেন, সাবধানে থাকবেন তাই। চিঠি দেবেন।

মেজদি চলে যাবার পৱ মন্টা সত্ত্ব বড় খারাপ লাগল। পরমাঞ্চায়ের বিদায়-ব্যথা অমুত্ব করলাম মনে মনে।

ক'দিন পৱ মেমসাহেবের চিঠি পেলাম।

...‘তুমি কি কোন তুক-তাক বা কবচ-মাহলী দিয়ে মেজদিকে বশ করেছ? ও মা-ৱ কাছে ছ’ পাতা আৱ আমাৱ কাছে চার পাতা চিঠি লিখেছে। সাৱা চিঠি ভৰ্তি শুধু তোমাৱ কথা, তোমাৱ প্ৰশংসা। তোমাৱ মত ছেলে নাকি আজকাল পাওয়া মুশকিল। তুমি নাকি ওদেৱ খুব যত্ন করেছ? ওৱা নাকি খুব আৱামে ছিল?’

তাৱপৱ মা-ৱ চিঠিতে ফাস্তন মাসে বিয়ে দেবাৱ কথা লিখেছে। তোমাৱও নাকি তাই মত? মা-ৱ কোন আপত্তি নেই। আজ মেজদিৰ চিঠিটা মা দিদিৰ কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আৱ ক'দিন পৱেই আমাদেৱ কলেজ বন্ধ হবে। ছুটিতে মেজদিৰ কাছে যাব। যদি মেজদিকে ম্যানেজ কৱতে পাৱি তবে ওদেৱ কাছে ছ’ সপ্তাহ থেকে এক সপ্তাহেৱ জন্ম তোমাৱ কাছে যাব।

আমাদেৱ এখানকাৱ আৱ সব খবৱ মোটামুটি ভাল। তবে ইদানীং খোকনকে নিয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আমাৱ মনে হচ্ছে ও রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। পড়াশুনা এখনও অবশ্য ঠিকই কৱছে কিন্তু ভয় হয় একবাৱ যদি রাজনীতি নিয়ে বেশী মেতে

ওঠে, তার পড়াশুনার ক্ষতি হতে বাধ্য। খোকন ঘদি কোন কারণে  
ধারাপ হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য আমারও কিছুটা দায়ী হতে  
হবে। সর্বোপরি বৃক্ষ বিপরীক কাকাবাবু বড় আঘাত পাবেন।'...

আমি মেমসাহেবকে লিখলাম, মেজদি যা লিখেছে তা বর্ণে বর্ণে  
সত্য। ফাস্টন মাসে পার্লামেন্টের সেসন চলবে। কিন্তু তা চলুক  
গে। চুলোর ছয়োরে যাক পার্লামেন্ট! ফাস্টন মাসে আমি বিয়ে  
করবই। আমার আর দেরী সহ হচ্ছে না। তুমি যে আমার  
চাইতেও বেশী অধৈর্য হয়েছ, তা আমি জানি।

আরো অনেক কিছু লিখেছিলাম। শেষের দিকে খোকনের  
সম্পর্কে লিখেছিলাম, তুমি ওকে নিয়ে অত চিন্তা করবে না।  
বাঙালীর ছেলেরা যৌবনে হয় রাজনীতি, না হয় কাব্য-সাহিত্য চর্চা  
করবেই। শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত ঋতুর মত এসব চিরস্থায়ী নয়।  
ছ'চারদিন ইন্কিলাব বা বন্দেমাতরম্ চিংকার করে ডালহৌসী  
ঙ্কোয়ারের স্তীম রোলারের তলায় পড়লে সব পাঞ্চে যাবে। খোকনও  
পাঞ্চে যাবে।

এ-কথাও লিখলাম, তুমি খোকনের জন্য অত ভাববে না।  
হাজার হোক আজ সে বেশ বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে। তাছাড়া  
তার বাবা তো আছেন। ছেলেমেয়েদের এই বয়সে তাদের  
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে গেলে অনেক সময়েই হিতে বিপরীত  
হয়। তোমারও হতে পারে। সুতরাং একটু খেয়াল করে চলবে।

শেষে লিখলাম, খোকন যখন ছোট ছিল, যখন তাকে মাতৃস্নেহ  
দিয়ে, দিদির তালবাসা দিয়ে অভাবিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা  
করার প্রয়োজন ছিল, তুমি ও মেজদি তা করেছ। তোমাদের  
মেহচাঁয়ায় যে একটা মাতৃহারা শিশু আজ যৌবনে পদার্পণ করে  
মাথা উঁচু করে দাঢ়িয়েছে, সেইটুকুই তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কার।  
এর চাইতে বেশী আশা করলে হয়ত দুঃখ পেতে পার।

জান দোলাবৌদি, খোকন সম্পর্কে এত কথা আমি লিখতাম না।

କିନ୍ତୁ ଇଦାନୀଂକାଳେ ମେମସାହେବ ଖୋକନକେ ନିଯେ ଏତ ବେଶୀ ମାତାମାତି, ଏତ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରା ଶୁଣ କରେଛିଲ ଯେ-ଏସବ ନା ଲିଖେ ପାରଲାମ ନା । ଆଜକାଳ ଓର ଅତ୍ୟେକଟା ଚିଠିତେ ଖୋକନେର କଥା ଥାକତ । ଲିଖିତ, ଖୋକନେର ଏଇ ହେଁଥେ, ଏହି ହେଁଥେ । ଖୋକନେର କି ହଲେ, କି ହବେ ? ଖୋକନ କି ମାନୁଷ ହବେ ନା ? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହାଜାର କଥା ଲିଖିତ । ତୁମି ତୋ ଜାନ ଆଜକାଳକାର ଦିନେ ନିଜେଦେଇ ଖୋକନକେଇ ମାନୁଷ କରିବେ ମାନୁଷ ପାଗଳ ହେଁ ଉଠିଛେ ତାହାଡ଼ା ମେହ-ଭାଲବାସା ଦେଓୟା ସହଜ କିନ୍ତୁ ବିନିମୟେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଓୟା ଛର୍ଲିତ ।

ଖୋକନେର ପ୍ରତି ଓର ଏତ ମେହ-ଭାଲବାସାର ଜଣ୍ମ ସତି ଆମାର ଭୟ କରତ । ତଯ ହତୋ ଯଦି କୋନଦିନ ଖୋକନ ଓର ଏହି ମେହ-ଭାଲବାସାର ମୂଳ୍ୟ ନା ନେଇ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନା ଦେଇ, ତଥନ ସେ-ହୃଦୟ, ସେ-ଆଘାତ ସହ କରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହବେ । ତାଇ ନା ?

ଏହି ଚିଠିର ଉତ୍ତରେ ମେମସାହେବ କି ଲିଖିଲ ଜାନ ? ଲିଖିଲ, ତୁମି ଯତ ସହଜେ ଖୋକନ ସମ୍ପର୍କେ ଯେସବ ଉପଦେଶ ପରାମର୍ଶ ଦିଯେଛୁ, ଆମାର ପକ୍ଷେ ଅତ ସହଜେ ସେସବ ଗ୍ରହଣ କରା ବା ମେନେ ନେଓୟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଯ । ତାର କାରଣ ଥୁବ ସହଜ । ମାତୃହାରୀ ଛ'ବିଛରେର ଶିଶୁ ଖୋକନକେ ନିଯେ କାକାବାବୁ ଆମାଦେର ବାଡିତେ ଏସେଛିଲେନ । ସେ ଅନେକ ଦିନେର କଥା । ମାତୃମେହ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଆମାଦେର ଛିଲ ନା କିନ୍ତୁ ଦିଦି, ମେଜଦି ଆର ଆମି ଓକେ ବଡ଼ କରେଛି । ଓକେ ଥାଇଯେଛି, ପରିଯେଛି, ଶୁଣ କରେ ଛଡ଼ା ବଲତେ ବଲତେ କୋଲେର ମଧ୍ୟେ ନିଯେ ଘୁମିଯେଛି । ଏକଦିନ ନୟ, ଛୁଦିନ ନୟ, ବହରେର ପର ବହର ଖୋକନକେ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଜଡ଼ିଯେ ନିଯେ ଶୁଯେଛି ଆମରା । ତିନ ବୋନେ ।

କୟେକ ବହର ପର ଦିଦିର ବିଯେ ହେଁ ଗେଲେ ଆମି ଆର ମେଜଦି ଓକେ ଦେଖେଛି । ଓର ଅସୁଖ ହଲେ ମେଜଦି ଛୁଟି ନିଯେଛେ, ଆମି କଲେଜ କାମାଇ କରେଛି, ମା ମାନତ କରେଛେ । ମେଜଦିରଙ୍ଗ ବିଯେ ହେଁ ଗେଲ । ଆଜ ଖୋକନକେ ଦେଖବାର ଜଣ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ଆମି ପଡ଼େ ରଯେଛି । ତୁମିଓ କଲକାତା ଛେଡ଼େ ଚଲେ ଗେଲେ । ମା-ବାବାର କଥା ବାଦ ଦିଲେ ଖୋକନ

\*

ছাড়া এখানে আমার আর কি আকর্ষণ আছে বল ? হাতেও অচুর  
সময়। তাইতো খোকনের কথা না ভেবে উপায় কি ?

এই চিঠির উত্তরে আমি আর খোকন সম্পর্কে বিশেষ কিছু  
লিখলাম না। ভাবলাম মেমসাহেবের ছুটিতে দিল্লী এলেই কথা-  
বার্তা বলব।

ছুটিতে মেমসাহেব বোঝে গিয়েছিল। একবার ভেবেছিলাম  
তু'তিনদিনের জন্য বোঝে ঘুরে আসি। খুব মজা হতো। কিন্তু  
শেষপর্যন্ত গেলাম না। মেজদির ওখানে সতের-আঠারো দিন  
কাটিয়ে মেমসাহেব কলকাতায় যাবার পথে দিল্লী এসেছিল।  
কলকাতায় সবাই জানত ও বোঝেতেই আছে। মেমসাহেব আমার  
কাছে মাত্র চার-পাঁচদিন ছিল।

মেমসাহেবকে গ্রীনপার্কের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম।  
গুর খুব পছন্দ হয়েছিল। বলেছিল, লাভলি।

তারপর বলেছিল, তুমি যে এর মত্যেই এত সুন্দর করে সাজিয়ে-  
গুছিয়ে নেবে, তা ভাবতে পারিনি।

আমি বলেছিলাম, তোমাকে বিয়ে করে তো যেখানে-সেখানে  
তুলতে পারি না !

ঞি লম্বা সরু কালো জ্ব ছটো টান করে উপড়ে তুলে ও বলেছিল,  
ইজ ইট ?

‘তবে কি ?’

মেমসাহেব গঁজাননকে অশেষ ধন্তবাদ জানাল অত সুন্দর করে  
বাগান করবার জন্য। জিজ্ঞাসা করল, গঁজানন, তোমার কি চাই  
বল ?

গঁজানন বলেছিল, বিবিজি, আভি নেই। আগে তুমি এসো,  
সবকিছু বুঁধে-ঢুঁধে নাও, তারপর হিসাব-চিসাব করা যাবে।

বিকেল হয়ে এসেছিল ? গঁজাননকে কিছু খাবার-দ্বাবার আর  
কফি আনতে মার্কেটে পাঠিয়ে দিলাম। মেমসাহেব ও-পাশের

সোফটা ছেড়ে আমার পাশে এসে বসল। আমার একটা হাত  
নিজের হাতের ঘধ্যে তুলে নিয়ে মাথা নীচু করে কি যেন দেখছিল,  
কি যেন ভাবছিল। আমি কিছু বললাম না, চুপ করেই বসে  
রইলাম। কয়েক মিনিট ঐভাবেই কেটে গেল। তারপর ঐ মাথা  
নীচু করেই নরম গলায় ও বললো, সত্যি, তুমি আমাকে স্বীকৃত  
জন্ম করেছ।

‘কেন? আমি বুঝি স্বীকৃত হবো না?’

‘নিশ্চয়ই হবে। তবুও এত বড় বাড়ি এত সব আয়োজন তো  
আমার জন্মই করেছ।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, সেজন্ম কিছু পুরস্কার দাও না!

মেমসাহেব হেসে ফেললো। বললো, তোমার মাথায় শুধু ঐ  
এক চিন্তা!

‘তোমার মাথায় বুঝি সে চিন্তা আসে না?’

ও চিৎকার করে বললো, নো, নো, নো!

এক মুহূর্তের জন্ম আমিও চুপ করে গেলাম। একটু পরে  
বললাম, এদিকে তো গলাবাজি করে খুব নো, নো বলছ, আর ওদিকে  
বিয়ের আগেই ছেলেমেয়ের ঘর ঠিক করছ।

মেমসাহেব ঐভাবে ফাস্ট ওভারের ফাস্ট বলে বোলড হবে,  
ভাবতে পারে নি। আমার কথার কোন জবাব ছিল না ওর কাছে।  
শুধু বললো, তোমার মত ডাকাতের সঙ্গে ঘর করতে হলে একটু  
ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে উপায় আছে?

গ্রীনপার্ক থেকে শয়েস্টার্ন কোর্টে ফিরে আসার পর মেমসাহেব  
বললো, জান, মেজদি বলছিল বিয়েতে তোমার কি চাই তা জেনে  
নিতে।

আমি ঙুঁচকে বেশ অবাক হয়ে বললাম, সে কি? মেজদি  
জানে না?

‘তুমি বলেছ নাকি?’

‘একবাৰ ! হাজাৰবাৰ বলেছি !’

আমাৰ রাগ দেখে ও যেন একটু ধাৰড়ে গেল। বললো, হয়ত  
কোম কাৰণে ..

‘এৱ মধ্যে কাৰণ-টাৱণ কিছু নেই।’

মেমসাহেবেৰ মুখটা চিঞ্চায় কালো হয়ে গেল। মুখ নীচু কৰে  
বললো, মেজদি হয়ত ভেবেছে তুমি ফ্ৰাঙ্কলি আমাকে সবকিছু খুলে  
বলতে পাৰ...’

‘তোমাকে যা বলব, মেজদিও তা জানে !’

মেমসাহেব নিশ্চল পাথৱেৰ মত মাথা নীচু কৰে বসে রাইল।  
আমি চুৱি কৰে ওৱ দিকে ঢাইছিলাম আৱ হাসছিলাম।

একটু পৱে ও আমাৰ কাছে এসে হাতহুটো ধৰে বললো, ওগো,  
বল না, বিয়েতে তোমাৰ কি ঢাই।

আমি প্ৰায় চিংকার কৰে বললাম, তোমাৰ মেজদি জানেন  
না যে আমি তোমাকে ঢাই ?

একটা বিৱাট দীৰ্ঘনিশ্চাস ছেড়ে হাসতে হাসতে ও বললো,  
বাপৱে বাপ ! কি অসভ্য ছেলেৱে বাবা !

আমি অত্যন্ত স্বাভাৱিকভাৱে বললাম, এতে অসভ্যতাৰ কি  
কৱলাম ?

মেমসাহেব আমাকে এক দাবড় দিয়ে বললো, বাজে বকো না।  
ছি, ছি, অমন কৰে কেউ ভাবিয়ে তোলে ?

পৱে ও আবাৰ আমাকে জিজ্ঞাসা কৱেছিল, বল না, বিয়েতে  
তুমি কি ঢাও ?

আমি বললাম, তোমাৰ এসব কথা জিজ্ঞাসা কৱতে সজ্জা কৱছে  
না ? তুমি কি ভেবেছ আমি সেই তত্ত্ববেশী অসভ্য ছোটলোক-  
গুলোৱ দলে যে লুকিয়ে লুকিয়ে নগদ টাকা নিয়ে পৱে চালিয়াতি  
কৱব ?

পৱে মেজদিকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, আপনাৱা

আমাকে ঠিক চিনতে পারেন নি। বিয়েতে ঘোরুক বা উপটোকন  
তো দূরের কথা, অন্ত কোন মাঝুবের দয়া বা কৃপা নিয়ে আমি  
জীবনে দাঢ়াতে চাই না। সে মনোবৃত্তি থাকলে বেহালায় সরকারী  
জমিতে সরকারী অর্থে একটা বাড়ি বা কলকাতার শহরে বেনামীতে  
হৃষ্টো-একটা ট্যাক্সি অনেক আগেই করতাম। আর খণ্ডের পয়সায়,  
খণ্ডের কৃপায় সমাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠা? ছিঃ, ছিঃ! মেরুদণ্ডীন  
হীনবীর্য পুরুষ ছাড়া এ কাজ কেউ পারবে না। খড়কির দরজা দিয়ে  
আঘ করে, সম্পত্তি করে চালিয়াতি করতে আমি শিখিনি। নিজের  
কর্মক্ষমতা ও কলমের জোরে যেটুকু পাব, তাতেই আমি সুখী ও  
সন্তুষ্ট থাকব।

এই চিঠির উভয়ে মেজদি লিখেছিলেন, ভাইরিপোর্টার, তোমার  
চিঠি পড়ে মনে হলো তুমি আমাদের ভুল বুঝেছ। তোমার সঙ্গে  
আমাদের সবচাইতে ছেট বোনের বিয়ে হচ্ছে। তাইতো তোমরা  
হ'জনে আমাদের কত প্রিয়, কত আদরের। তোমাদের বিয়েতে  
আমরা কিছু দেব না, তাই কি হয়? তোমাদের কিছু না দিলে কি  
বাবা-মা শাস্তি পাবেন?

আমি আবার লিখলাম, সেচিমেগ্টের লড়াই লড়বার ক্ষমতা  
আমার নেই। তবে আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, আমার কিছু  
চাই না। যদি নিতান্তই কিছু দিতে চান, তাহলে কন্টেম্পোরারি  
হিস্ট্রীর কিছু বই দেবেন। দয়া করে আর কিছু দিয়ে আমাকে বিব্রত  
করবেন না।

যাক্কগে ওসব কথা। মেমসাহেব কলকাতা যাবার আগের দিন  
হ'জনে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে শেষে  
বুক্স-জয়ন্তী পার্কে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। কথায় কথায় মেমসাহেব  
খোকনের কথা বলেছিল, তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে আসার পর  
বুবলাম তোমাকে কত ভালবাসি। এমন একটা অনুভ নিঃসঙ্গতা  
আমাকে ঘিরে ধরল যে তোমাকে কি বলব! কোনমতে সেই

লেডিজ ট্রামে চেপে কলেজ ষেতাম আৱ আসতাম। আৱ কোথাও  
ষেতাম না। আঞ্চলীয়সম্ভজন, বঙ্গ-বাঙ্কি, সিলেমা টিনেমা কিছু তাল  
লাগত না।

আমি বললাম, ঠিক সেইজন্তই তো খোকনকে বেশী আৰকচে  
ধৰেছ, তা আমি বৃখি।

‘তাইতো সন্ধ্যাৰ পৱ খোকনকে পড়াতে বসতাম। পড়াগুনা  
হয়ে গেলে থাওয়া-দাওয়াৰ পৱ ছাদে গিয়ে দুজনে বসে বসে গল  
কৰে কাটাতাম। কোন কোনদিন মা আসতেন। গান গাইতে  
বলতেন কিন্তু আমি গাইতে পারতাম না। গান গাইবাৰ মত মন  
আমি হাৰিয়ে ফেলেছিলাম।’

একটু পৱে আবাৰ বললো, গৱমকালে কলকাতাৰ সন্ধ্যাবেলা  
যে কি সুন্দৰ তা তো তুমি জান। তোমাৰ সঙ্গে কত ঘূৰে  
বেড়িয়েছি ঐ সন্ধ্যাবেলায় কিন্তু তুমি চলে আসাৰ পৱ আমি কলেজ  
থেকে ফিরে চুপচাপ শুয়ে থাকতাম আমাৰ থাটে।

‘তাই বৃখি?’

‘সত্যি বলছি, জানলা দিয়ে পাশেৰ শিউলি গাছটা দেখতাম  
আৱ এক টুকৱো আকাশ দেখতে পেতাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতাম  
শুধু তোমাৰ কথা।’

আমি ওৱ হাতটা আমাৰ হাতেৰ মধ্যে টেনে নিলাম। বললাম,  
তুমি যে আমাকে ছেড়ে শাস্তিতে থাকতে পার না, তা আমি জানি  
মেমসাহেবে।

ওৱ চোখছটো কেমন যেন ছলছল কৰছিল। গলাৰ শ্বরটাও  
স্বাভাৱিক ছিল না। তেজা তেজা গলায় বললো, এখন শুধু  
খোকন ছাড়া কলকাতায় আমাৰ কোন আকৰ্ষণ নেই। কিন্তু  
ছেলেটা আজকাল যে কি লাগিয়েছে তা ওই জানে।

‘কি আবাৰ লাগাল?’

‘মনে হচ্ছে খুব জোৱ পলিটিক্স কৰছে।’

‘তার জন্ত ভয় পাবার বা চিন্তা করবার কি আছে?’

‘তুমি কলকাতায় রিপোর্টারী করেছ, অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন দেখছ। সুতরাং তুমি দেখলে বুঝতে পারতে কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না ও কি করছে। সেইজন্তই বেশী ভয় হয়।’

‘চুরি-জোচুরি তো করছে না, সুতরাং তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন?’

মেমসাহেব দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে কেমন যেন অসহায়ার মত আমার দিকে তাকাল। বললো, জান, এই ত কিছুদিন আগে হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফিরল। প্রথমে কিছুই বলছিল না। বার বার জিজ্ঞাসা করার পর বললো, পুলিসের লাঠি লেগেছে। এবার মেমসাহেব আমার হাতহটো চেপে ধরে বললো, আচ্ছা বলতো, এই লাঠিটাই যদি মাথায় লাগত, তাহলে কি সর্বনাশ হতো?

আমি বেশ বুঝতে পারলাম খোকন রাজনৌতিতে খুব বেশী মেতে উঠেছে। সভা-সমিতি মিছিল-বিক্ষোভ করছে সে এবং আজ হাতে লাঠি পড়েছে, কাল মাথায় পড়বে, পরশু হয়ত গুলীর আঘাতে আহত হয়ে মেডিক্যাল কলেজের অপারেশন থিয়েটারে যাবে। চিন্তার নিশ্চয়ই কারণ আছে কিন্তু এ-কথাও জানি ছেলেরা একবার মেতে উঠলে ফিরিয়ে আনা খুব সহজ নয়। খবরের কাগজের রিপোর্টারী করতে গিয়ে কলকাতার রাজপথে বহুজনকে পুলিশের লাঠিতে আহত, গুলীতে নিহত হতে দেখেছি। সব রিপোর্টারই এসব দেখে থাকেন, নিশ্চল নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মত দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে দেখেন। চুপ করে দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে আমি ও সবকিছু দেখেছি, এককেঁটাও চোখের জল ফেলিনি।

আজ মেমসাহেব খোকনের কথা বলায় হঠাৎ মূহর্তের জন্ত এইসব দৃশ্যের ঝড় বয়ে গেল মনের পর্দায়ে। কেন, তা বুঝতে পারলাম না। মনে মনে বেশ একটু চিন্তিতও হলাম। ওকে সেসব

কিছু ব্যতে দিলাম না। সাক্ষনা জানিয়ে বললাম, হাতে একটু লাঠি লেগেছে বলে অত ঘাবড়ে ঘাচ্ছ কেন? কলকাতায় বাস করে যে পুলিসের এক ঘা লাঠি খায়নি, সে খাঁটি বাঞ্ছাই না।

হ' ফোটা চোখের জল ইতিমধ্যেই গড়িয়ে পড়েছিল মেমসাহেবের গালের 'পর। আমার কাছ থেকে লুকোবার জন্ম তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে সারা মুখটা মুছে নিয়ে বললো, হয়ত তোমার কথাই ঠিক কিন্তু যদি কোনদিন কিছু হয়।...

মেমসাহেব আর বলতে পারল না। হই ইঁটুর 'পর মাথাটা রাখল। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, অত ভয় পাচ্ছ কেন মেমসাহেব? আবার বললাম, অত চিন্তা করলে কি খাঁচা যায়?

মেমসাহেব রাজনীতি করত না কিন্তু কলকাতাতে জনেছে, স্কুল-কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। সুতরাং ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, অনেক কিছু দেখেছে। হয়ত শুলিতে মরতে দেখে নি কিন্তু লাঠি বা টিয়ার-গ্যাস বা ইট-পাটকেলের লড়াই নিশ্চয়ই অনেকবার দেখেছে। তাছাড়া খবরের কাগজও পড়ে, ছবি দেখে। সেই সামাজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই খোকন সম্পর্কে মেমসাহেব একটু অস্তির না হয়ে পারে নি।

ওয়েস্টার্ন কোর্টে ফিরে আসার পর আমি মেমসাহেবকে বলেছিলাম, তুমি বরং খোকনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। এখানে পড়াশুনা করবে আর আমাকেও একটু-আধটু সাহায্য করবে।

আমার প্রস্তাবে ও আমলে সাফিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, সত্য ওকে পাঠিয়ে দেব?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাও!'

'কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

‘ক’মাস পরেই তো ওর ফাইশ্যাল !’

আমি বললাম, টিক আছে। পরীক্ষা দেবার পরই পাঠিয়ে  
দিও, এখানে বি-এ পড়বে।

মেমসাহেব একটু হাসল, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরল।  
বললো, ততদিনে আমিও তো তোমার কাছে এসে যাব, তাই না ?

আমি ওর মাথায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে একটু আদর করে  
বললাম, তখন খুব মজা হবে, তাই না ?

ও আমার বুকের ‘পর মাথা রেখে বললো, সত্য খুব-মজা হবে।

## আঠারো

ভাৰতবৰ্ষের রাজনৈতিক ছনিয়ায় আস্তে আস্তে বেশ জল ঘোলা হতে শুৱ কৱল। সীমান্ত নিয়ে মাৰে মাৰেই অস্বস্তিকৰ খবৰ ছাপা হতে লাগল পত্ৰ-পত্ৰিকায়। সঙ্গে সঙ্গে পাৰ্লামেন্টে ঝড় বয়ে ষেত —স্ট নোটিশ, কলিং অ্যাটেনশান, অ্যাডজৰ্নমেণ্ট মোশান ! সরকাৰ আৱ বিৰোধী পক্ষেৱ লড়াই নিয়-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঢ়াল। শুধু তাই নয়। কংগ্ৰেস পার্টিৰ মধ্যেও সরকাৰী নীতিৰ সমালোচনা শুৱ হল গোপনে গোপনে। সরকাৰী নীতিৰ গোপন সমালোচনাৰ এসব খবৰ কংগ্ৰেসীৱাই নেমন্তন্ত্ৰ কৱে আমাদেৱ পৱিবেশন কৱতেন। তবে সবাইকে নয়, অনেককে। যমুনাৰ জল আৱো গড়িয়ে গেল। কংগ্ৰেস পাৰ্লামেন্টীৱী পার্টিৰ সাধাৰণ সভায় সরকাৰী নীতিৰ সমালোচনাৰ শুল্কন শোনা যেতে লাগল মাৰে মাৰে। তবে নিয়মিত নয়। সমষ্টিগতভাৱেও নয়। পাঁচশ-সাড়ে পাঁচশ জন কংগ্ৰেসী এম-পি'ৰ মধ্যে মাত্ৰ দু-চারজন সরকাৰী নীতিৰ প্ৰশংসা কৱতে কৱতে শেষেৱ দিকে ভুল কৱে সরকাৰেৱ সমালোচনা কৱছিলেন।

ৰাজনৈতিক ছনিয়াৰ জল আৱো ঘোলা হল। যমুনাৰ জল আৱো গড়িয়ে গেল। কংগ্ৰেস পাৰ্লামেন্টীৱী পার্টিতে সরকাৰী নীতিৰ সমালোচকদেৱ সংখ্যা বাড়ল, সমালোচনা তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণত হল। মাৰে মাৰে নয়, প্ৰতি মিটিংয়েই সমালোচনা শুৱ হল। এখন আৱ গোপনে নয়, প্ৰকাশ্যে সৰ্বজনসমক্ষে ঢাক-চোল বাজিয়ে কংগ্ৰেস পাৰ্লামেন্টীৱী পার্টিৰ সেক্ৰেটাৰীৱা এই সব সমালোচনাৰ খবৰ দিতেন কৱসপনডেন্টদেৱ। ভাৰতবৰ্ষেৱ প্ৰতিটি

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় মোটা মোটা বড় বড় হুরফে এসব খবর ছাপা হত ।

ওদিকে উত্তর সীমান্তের নামা দিক থেকে নামা খবর আসছিল মাঝে মাঝেই । কখনো নেফার জঙ্গল থেকে, কখনো লাডাকের পার্বতা মরুভূমি থেকে, কখনো ওয়ালঙ থেকে, কখনো দৌলত-বেগ-ওলডি বা চুশুল, মাগার, ডেমচক থেকে গুলীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল । ঐসব গুলীর আওয়াজ নিউজ এজেন্সীর টেলিপ্রিন্টার মারফত দিল্লী পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই ‘মিস্টার স্পীকার, স্থার’-এর টেবিলে জমা হত কলিং অ্যাটেনশন-অ্যাডজর্নমেণ্ট মোশানের নোটিশ । এয়ার-কণ্ট্রিসন্ড লোকসভা চেম্বার রাজনৈতিক উত্তেজনায় দাউ দাউ করে জলত সারা দিন ।

ডিফেন্স মিনিস্ট্রি-এক্টারগ্রাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রিতেও চাকচল্য বেড়ে গেল অনেক । মিটিং-কনফারেন্স প্রেসমোট-প্রটেস্ট মোটের ঠেলায় আমাদের কাজের চাপ সহজ গুণ বেড়ে গেল ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সে এক ঐতিহাসিক অধ্যায় । তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস আর একবার মোড় ঘূরছিল । আমরা দিল্লীপ্রবাসী করসপনডেন্টের দল প্রতিদিন সেই ইতিহাসের টুকরো টুকরো সংগ্রহ করে পরিবেশন করছিলাম অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার জন্য ।

এই বাজারে দিল্লীর গুরুত্ব আরো বেশী বেড়ে গেল । এক দল ফরেন করসপনডেন্ট আগেও ছিলেন কিন্ত এই বাজারে আরো অনেকে এলেন সান্ক্রান্তিসকো-নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন-অটোয়া-লণ্ডন-প্যারিস - ব্রাসেলস - মঙ্গো - প্রাগ-কায়রো - করাচী- সিডনি-টোকিও থেকে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকেও আরো অনেক করসপনডেন্ট এলেন দিল্লী । ইউনাইটেড নেশনস-লণ্ডন-প্যারিস-মঙ্গো-কায়রো-টোকিওর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীও পৃথিবীর অন্তর্ম প্রধান নিউজ সেন্টার হল ।

আমার কাগজের ডাইরেক্টর ও সম্পাদক এবার উপলক্ষ্য করলেন আমাকে শুধু মাইনে দিলেই চলবে না, দিলী থেকে গরম গরম খবর পাবার জন্য আরো কিছু করতে হবে। সাধারণত দিলীর বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য এতদিন আমাকেই কর্তৃতা দেকে পাঠাতেন। এবার সম্পাদক স্বয়ং দিলী এলেন আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। বঙ্গ-বাঙ্কবদের সঙ্গে দেখা করার অঙ্গায় সম্পাদক সাহেব আরো কয়েকটি অফিস ঘুরে ফিরে তাদের কাজকর্ম ও অফিসের বিধিব্যবস্থা দেখে নিলেন। তারপর আর আমাকে বলতে হল না, নিজেই উপলক্ষ্য করলেন আমার কাজ থেকে আরো বেশী ও ভাল কাজ পেতে হলে আমাকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

এডিটর সাহেব নিজেই বললেন, বাচ্চু, সব চাইতে আগে তোমার একটা গাড়ি চাই। গাড়ি ছাড়া এখানে কাজ করা রিয়েলি মুশ্কিল।

আমি বললাম, এখন প্রায় সব করসপনডেটদেরই গাড়ি আছে। গাড়ি না হলে ঠিক স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত ঘোরাঘুরি করা অসম্ভব।

এডিটর সাহেব বললেন, তাছাড়া আমাদের একটা অফিস দরকার।

শেষে বললেন, তুমি এবার ওয়েস্টার্ন কোর্ট ছেড়ে গ্রীন পার্কে চলে যাও। বাড়িতে একটা টেলিফোন নাও। গাড়ি আর টেলিফোন থাকলে বিশেষ কোন অস্বিধা হবে না।

আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম, তা ঠিক। তবে তাবছিলাম ফাস্টন মাসের পরেই গ্রীন পার্ক যাব।

‘কেন তুমি কি ফাস্টনে বিয়ে করছ?’

আমি মাথা নীচু করে বললাম, তাইতো ঠিক হয়েছে।

‘ছটো এস্ট্যাবলিসমেন্ট মেনটেন করতে অথবা তোমার কিছু

খৰচা হচ্ছে। যাই হোক এই ক' মাস তাহলে এখানেই থেকে  
যাও। কিন্তু গেট এ টেলিফোন ইমিডিয়েটলি।'

একটু পরে বললেন, আমাদের নিউজ পেপার সোসাইটি বিজ্ঞ-  
এ হয়ত একটা ঘৰ পাব কিছুকালের মধ্যেই। যতদিন না পাওয়া  
যায় ততদিন তুমি একটা পার্ট-টাইম স্টেনো রেখে দাও।

একটা মাস ঘূরতেই না ঘূরতেই সত্যি সত্যিই অফিসের পয়সায়  
আমি একটা গাড়ি কিনলাম। স্ট্যাণ্ডার্ড হেরল্ড! টু-ডোর!  
টেলিফোনও হল। একশ টাকা দিয়ে একজন পার্ট-টাইম মাদ্রাজী  
স্টেনোও রাখলাম।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক চৱম সঞ্চতের দিনে আমার  
ভাগ্য্যাকাশে এমনভাবে সৌভাগ্যের সূর্যোদয়, কোনদিন কল্পনাও  
করতে পারিনি। দিল্লীর যদি এতটা গুরুত্ব না বাঢ়ত, যদি কাগজে  
কাগজে প্রতিযোগিতা এত তীব্র না হত, তাহলে আমার ইতিহাসও  
অগ্ররকম হত। কিন্তু বিধাতাপুরুষের নির্দেশ কি ব্যর্থ হতে পারে?

তিলে তিলে বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে অজস্র দিনের পরিশ্রম দিয়ে,  
অসংখ্য দিনের অনাহার আৱ অনিজ্ঞার বিনিময়ে সেদিন যখন আমি  
কর্মজীবনে এতবড় স্বীকৃতি, এতবড় মর্যাদা, এতবড় সাফল্য অর্জন  
করলাম, তখন আমি নিজেই চমকে গিয়েছিলাম। কলকাতায় যে  
আমি দিনের পৰ দিন, মাসের পৰ মাস একবেলা এক আনার  
ছোলার ছাতু আৱ তু পয়সায় ভেলী গুড় খেয়ে কাটিয়েছি, যে আমি  
শুধু এক মুঠি অৱ আৱ ভদ্ৰভাবে বাঁচার দাবী নিয়ে কলকাতার পথে  
পথে ভিধারীৰ মত অসংখ্য মাহুষেৰ দ্বাৰে দ্বাৰে ঘূৰেছি, সেই আমি  
গাড়ি চড়ব? বিধাতাপুরুষেৰ কি বিচ্ছি খামখেয়ালি! আগে  
বিশ্বাস কৰতাম না কিন্তু অসংখ্য পৱীক্ষাৰ মধ্য দিয়ে বিচ্ছি  
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েৰ পৰ আজ বিশ্বাস কৰি এই দুনিয়ায় সবকিছু  
সম্ভব। ভগবানেৰ আশীৰ্বাদ পেলে পঙ্ক সত্যি সত্যিই গিৱি-পৰ্বত  
লজ্জন কৰতে পারে।

দেলাবৌদ্ধি, আজ বুঝেছি তগবান বড় বিচ্ছি। কখনো নির্মম, কখনো করুণাময়। তিনি সবাইকে কিছুতেই সবকিছু দেন না। যে কর্মজীবনে সাফল্য অর্জন করবে, বৃহত্তর সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে, অগণিত মালুমের হন্দয়ে ঘার আসন, সে ব্যক্তিগত জীবনে কিছুতেই স্মৃতি হতে পারে না। নিজের জীবনের চরম অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি এই সত্য উপলব্ধি করেছি।

আমার এই মেমসাহেবের কাহিনীর শেষ হতে আর বেশী বাকী নেই। তুমি আর একটু পরেই বুঝবে আমার এই সাফল্য সার্থকতার মধ্যেও বেদনা কোথায়। বুঝবে কেন আমি এত কিছু পেয়েও আজ লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলি। বুঝবে এত মালুমের সংস্পর্শে থেকেও কেন আমি নিঃঙ্গ। আর একটু জানলেই বুঝবে কেন আমি ঝাস্ত।

যাই হোক ভারতবর্ষের বিচ্ছি রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আমার সম্পাদকের দয়ায় আমার এই অভাবনীয় সাফল্যের পর মেমসাহেবকে লিখলাম, তুমি কি কোনদিন তন্ত্রসাধনা করেছিলে ? তুমি যদি জ্যোতিষী হতে তাহলে আমার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তোমার পক্ষে আমার ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান। সম্ভব ছিল না। একমাত্র তন্ত্রসাধনা করলেই কিছু না জেনেও অপরের ভবিষ্যৎ বলা যায়। আমার সম্পর্কে তুমি যা যা বলেছিলে, যা যা আশা করেছিলে তার প্রায় সবই তো সত্য হয়ে গেল। তাই আজ আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তুমি হয়ত তন্ত্রসাধনা করেছ।

গজানন রোজ গাড়িটাকে হু-হুবার করে পরিষ্কার করে। ড্রাইভারের গাড়ি চালান ওর একটুও পছন্দ ছিল না। বলত, না, না, ছেটাসাব, ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে দেবেন না। ওরা যা তা করে গাড়ি চালায়। আদাৰ ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর রাখতে হবে, কোনদিন ভাবিনি ! তাই গাড়ি চালান আগে শিখিনি। তোমাকে নিয়ে এই গাড়িতে ঘুরে বেড়াবার আগে নিশ্চয়ই ড্রাইভিং শিখতাম-

না কিন্তু গজানন রাজী হল না। বাধ্য হয়েই আমি গাড়ি চালাচ্ছি  
কিন্তু তবুও পিছনে বসে বসে গজানন আমাকে বলে, ছেটাসাব,  
আস্তে আস্তে গিয়ার দাও।

পরশু দিন সন্ধ্যাবেলায় গ্রীন পার্কে তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম।  
কথায় কথায় গজানন হতচ্ছাড়া কি বলল জান? বলল, বিবিজির  
কিসমৎ খুব ভাল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন রে? ও বলল,  
বিবিজির কিসমৎ-এর জন্মই তো আপনার সবকিছু হচ্ছে। আমি  
ওকে দাবড় দিয়ে বললাম, বাজে বকিস না। হতচ্ছাড়া বলল,  
ছেটাসাব, বিবিজি না থাকলে তোমার কিছুই হত না। ওর কথাটা  
আমার ভালই লেগেছিল কিন্তু মুখে বললাম, তুই তোর বিবিজির  
কাছে যা, আমার কাছে থাকতে হবে না।

ভাল কথা, সেদিন তোমার কলেজে ট্রাঙ্ককল করলে তুমি ঐ  
রকম চমকে উঠলে কেন? তুমি যত অস্বস্তি বোধ করছিলে আমার  
তত মজা লাগছিল। ঠিক করেছি প্রতি সপ্তাহেই তোমাকে ট্রাঙ্ককল  
করব।

শেষে কি লিখেছিলাম জান দোলাবৌদি? লিখেছিলাম, ফাল্তুন  
মাস তো প্রায় এসে গেল। এবার বল বিয়েতে তোমার কি চাই?  
লজ্জা কর না। তোমার যা ইচ্ছা, আমাকে লিখো। আমি নিশ্চয়ই  
তোমার আশা পূর্ণ করব।

মেমসাহেব লিখল, তোমার প্রত্যেকটা চিঠির মত এই চিঠিটাও  
অনেকবার পড়লাম। পড়তে ভারী মজা লাগল। তোমার এডিটর  
মে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের স্বপ্ন বাস্তব করে তুলবেন,  
আমি সত্য ভাবতে পারিনি। ভগবানকে শত-কোটি প্রণাম না  
জানিয়ে পারছি না। তাঁরই ইচ্ছায় সবকিছু হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।  
ইঙ্গিত দেখে মনে হয় ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের শুধী করবেন।

তুমি আমার গাড়ি নিয়ে খুব মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ভাবতেও  
আমার হিংসা হচ্ছে। আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছে, তুমি

গাড়ি চালিয়ে শুরে বেড়াচ্ছ। তুমি যখন গাড়ি চালাও তখন তোমাকে দেখতে নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগে। খুব স্মার্ট? খুব আগুসাম? খুব সাবধানে গাড়ি চালাবে। তোমাদের দিল্লীতে বড় বেশী অ্যাকসিডেন্ট হয়। তুমি গাড়ি চালাচ্ছ জানার পর আর একটা নতুন চিঞ্চা বাড়ল। সব সময় মনে রেখো আজ আর তুমি একলা নও। মনে রেখো তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনও ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে গেছে। স্মৃতিরাং তোমার ক্ষতি হওয়া মানে আমারও সর্বনাশ! ভুলে যেও না যেন, কেমন?

আচ্ছা সেদিন তুমি হঠাৎ ট্রাঙ্ককল করলে কেন বলত? কলেজের অফিসে তখন লোকজনে ভর্তি ছিল। প্রথমে প্রিজিপ্যালই টেলিফোন ধরেন। তারপর যেই শুনলেন দিল্লী থেকে আমার ট্রাঙ্ককল এসেছে তখন তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে তুমিই ট্রাঙ্ককল করছ। কারণ তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে, একথা কলেজের সবাই জানেন। প্রিজিপ্যালও শুনেছেন। তাছাড়া বের্কট থেকে কেনা জার্মান ফোলডিং ছাতাটা হৃ-একদিন ব্যবহার করায় উনি একথাও জানতে পেরেছেন যে তুমিই এনে দিয়েছ। তাই তো প্রিজিপ্যাল লাইনটা অফিসে দিয়েছিলেন এই ভেবে যে, আমি ওর সাথে তোমার সঙ্গে ঠিকমত কথা বলতে পারব না। কিন্তু কলেজের অফিস কি ফাঁকা থাকে? আমি তোমার কোন কথারই জবাব দিতে পারছিলাম না। তাছাড়া ওসব কি যা তা প্রশ্ন করছিলে? কলেজের অফিসে বসে বসে ঐসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়? তাছাড়া আমার এই সব একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় খবর জানার যদি এতই গরজ হয়, তাহলে একবার চলে এসো। আসবে হৃ-এক দিনের জন্য? এলে খুব খুশি হব।

বিয়ের সময় তুমি আমাকে কিছু উপহার দিতে চেয়েছ। শাড়ি-গহনার কথা বলছ? ওসব কিছু আমার চাই না। আজ আমার শুধু একটাই কামনা—সে কামনা তোমাকে পাওয়ার। মন-প্রাণ

দিয়ে তোমাকে আমি পেতে চাই। তাহলেই আমি খুশি। ঝী  
হয়ে আর কি কামনা, আর কি প্রত্যাশা থাকতে পারে? সত্যি  
বলছি তুমি আমাকে কিছু উপহার দিও না। আমি শুধু তোমাকেই  
উপহার চাই। দেবে তো?

মেজদি থাকতে ওকে যানেজ করে নানা রকম ধোঁকা দিয়ে  
তোমার কাছে গেছি ক'বার। এখন আর তা সম্ভব নয়। তাই  
বলছিলাম তুমি যদি আসতে তবে ভাঙ হত। তোমাকে না দেখে  
আমি থাকতে পারি না। তুমি কি আমার সে কষ্ট উপলক্ষ্মি করতে  
পার? যদি পার তবে দয়া করে অন্তত একটি দিনের জন্য দেখা  
দিয়ে যেও।

ভাল কথা, মেজদির বাচ্চা হবে। এইত ক'মাস আগে বিয়ে  
হলো! এরই মধ্যেই বাচ্চা? না জানি আমার অন্তিম কি  
আছে?

মেমসাহেবের এই চিঠির উত্তর তো পোস্টকার্ডে দেওয়া যায় না।  
কর্মব্যস্ততার জন্য তাই কদিন চিঠি দিতে পারিনি। তাছাড়া  
কদিনের জন্য সৌরাষ্ট্র গিয়েছিলাম। এমনি করে উত্তর দিতে বেশ  
দেরী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মেমসাহেবের আবার একটা চিঠি  
পেলাম। জানলাম, ইতিমধ্যে একদিন ভোর পাঁচটার সময় পুলিস  
এসে খোকনদের ফ্ল্যাট সার্চ করে গেছে। খোকনকেও ধরে নিয়ে  
গিয়েছিল। বিকেলবেলা ছেড়ে দিয়েছিল।

কলকাতার কাগজগুলো পড়ে বেশ বুঝতে পারছিলাম বাংলা  
দেশের রাজনৈতিক আকাশের ঈশান কোণে ঘন কালো মেঘ জমতে  
শুরু করেছে। দামামা আবার বেজে উঠবে। সত্তা-সমিতির পালা  
এবার শেষ হবে, শুরু হবে মিছিল, বিক্ষোভ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ।  
তারপর লাঠি, কাছনে গ্যাস, গুলী। আবার বিক্ষোভ, আবার  
মিছিল হবে। আবার চলবে লাঠি, গুলী। কিছু মাঝুষ হারাবে  
তাদের প্রিয়জনকে। তারা কানবে, সারা জীবন ধরে কানবে।

খোকন যে বেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সেকথা বুঝতে আমার  
কষ্ট হল না। এ নেশার ঘোর ওর এখন কাটিবে না। কিছু খেসারও  
না দিলে এ নেশা কাটে না। অনেকের কোন কালেই কাটে না।  
খোকনেরও কাটিবে কিনা ঠিক নেই।

মেমসাহেবের অবশ্য তাবছিল আমি কলকাতা গিয়ে খোকনকে  
বুঝিয়ে-সুবিয়ে একটা কিছু করি। কিন্তু কি করব? কি বোঝাব  
খোকনকে? বোঝাতে চাইলেই কি সে বুঝবে? আমারও  
মেমসাহেবকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছিল। তেবেছিলাম হৃতিম  
দিনের জন্য ঘূরে আসব। কিন্তু মেমসাহেবের পরের চিঠিতে  
খোকনের খবর পাবার পর ঠিক করলাম, না যাব না। মেমসাহেবকে  
লিখে দিলাম, সত্যি ভাষণ ব্যস্ত। এখন কোনমতেই যেতে পারছি  
না। যদি এর মধ্যে সময় পাই তাহলে নিশ্চয়ই তোমাকে দেখে  
আসব। শেষে লিখলাম রাজনীতি অনেকেই করে, খোকনও  
করছে। তার জন্য অত চিন্তা বা ধাবড়াবার কি কারণ আছে?  
তাছাড়া খোকন তো আর শিশু নয়। স্বতরাং তুমি অত  
ভাববে না।

খোকন সম্পর্কে আমার এই ধরনের মন্তব্য মেমসাহেব ঠিক  
পছন্দ করত না, তা আমি জানতাম। কিন্তু কি করব? আমি  
স্থির জানতাম খোকন আমার কথা শুনবে না। মেমসাহেবের কথাও  
তার পক্ষে শোনা তখন সম্ভব ছিল না। স্বতরাং আমি আর কি  
লিখব?

আমার চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেমসাহেব উত্তর দিল, যে  
কোন কারণেই হোক তুমি খোকন সম্পর্কে বেশ উদাসীন। হয়ত  
ওকে ঠিক পছন্দ করো না। জানি না কি ব্যাপার। তোমার সঙ্গে  
এ বিষয়ে তর্ক করব না। তবে জেনে রাখ খোকন সম্পর্কে আমার  
ও আমাদের পরিবারের ভীষণ দুর্বলতা।

আমি সত্যি কোন তর্ক করিনি। তর্ক করব কেন? মাঝুষের

স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে কি তর্ক করা উচিত? কখনই নয়। তাছাড়া যুক্তি-তর্ক শ্যায়-অশ্যায় বাচ-বিচার করে কি মাঝুষ ভালবাসতে পারে? না। তা আমি জানি। সুতরাং এই বিষয়ে মেমসাহেবকে কিছু না লিখে এবার খোকনকেই একটা চিঠি দিলাম। লিখলাম, তোমার মত ভাগ্যবান ছেলে এই পৃথিবীতে খুব কম পাওয়া যাবে। তার কারণ এই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর, বড় ক্রপণ। আপনজনের কাছ থেকেই ভালবাসা পাওয়া এই পৃথিবীতে একটা দুর্লভ ব্যাপার। সুতরাং অন্তের কাছ থেকে স্নেহভালবাসা সত্যি সৌভাগ্যের কথা। তুমি সেই অনন্য ভাগ্যশালীদের অন্তর্ম। অনেক সুখ, অনেক ‘আনন্দ ত্যাগ করে, অনেক কষ্ট, অনেক হৃৎ সহ করে, অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করে তোমার বড়মা ও দিদিরা তোমাকে মাঝুষ করেছেন। তোমাকে নিয়ে ওঁদের অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। তোমার গায় একটু আঁচড় লাগলে ওদের পাঁজরার একটা হাড় ভেঙে যায়। হয়ত এতটা স্নেহ-ভালবাসার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু তুমি তো জান তাই এই স্নেহ-ভালবাসা মাঝুষকে অঙ্গ করে দেয়। তোমার বড়মা ও দিদিরেও তাই অঙ্গ করে দিয়েছে। তুমি ওদের এই অমূল্য স্নেহ-ভালবাসার অর্ধাদা কোনদিন করবে না, তা আমি জানি। কিন্তু তোমার জন্য আজকাল ওঁরা বড় চিন্তিত, বড় উদ্বিগ্ন। তুমি কি এর থেকে ওঁদের যুক্তি দিতে পার না? আমার মনে হয় তুমি ইচ্ছা করলেই পার। যাঁরা তোমার জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর রাত্রি জেগে কাটিয়েছেন, যাঁরা তোমার কল্যাণে ব্রত-উপবাস করেছেন, কালীঘাটে পূজা দিয়েছেন, তারকেশ্বরে ছুটে গিয়েছেন, তুমি কি তাঁদের উৎকণ্ঠা দূর করতে পার না? পার না ওঁদের চোখের জল বন্ধ করতে? একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখ।

আমি একজন সাংবাদিক হয়ে তোমাকে রাজনীতি করতে মানা করব না। তবে আগে লেখাপড়াটা শেষ করলে ভাল হয় না?

লেখাপড়া শিখে সমাজের মধ্যে মাথা উচু করে দাঢ়িয়ে সশঙ্খনের একজন হয়ে রাজনীতি করা তাল না? রাজনীতি নিশ্চয়ই করবে, একশ'বাব করবে। যাধীন দেশের নাগরিকরা নিশ্চয়ই রাজনীতি করবে। কিন্তু তার আগে নিজে প্রস্তুত হও, তৈরী হও, উপযুক্ত হও।

তোমার ফাইশাল পরীক্ষা এসে গেছে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। একটু মন দিয়ে লেখাপড়া করলেই চমৎকার রেজাণ্ট করবে। তুমি তো জান তোমার বড়মার শরীর ভাল না, ছোড়দিও বড় একলা। ঝঁদের একটু দেখো। আর ভুলে যেও না তোমার বাবার কথা— যিনি শুধু তোমারই মুখ চেয়ে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করছেন। একটু ভাঙ্গাতাড়ি মাঝুষ হয়ে ঐ বৃক্ষ মাঝুষটাকে একটু শাস্তি দেবার চেষ্টা করো।

শেষে জানালাম, এ চিঠির উত্তর না দিলেও চলবে। তোমার বক্তব্য তোমার ছোড়দিকে জানিও। সেই আমাকে সবকিছু জানাবে। আর হ্যাঁ, তুমি যদি চাও তাহলে দিল্লী আসতে পার। যেদিন ইচ্ছা সেদিনই এসো। এবং এখানে এলে তোমার পড়াশুনা ভালই হবে। তাছাড়া আমিও তোমার সাহচর্য পেতাম।

এই চিঠি লেখার পরই আমি আবার বাইরে গেলাম। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের ঘরোয়া কোন্দণ প্রায় চরমে উঠেছিল। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন নিয়ে তুই দলে প্রায় কুরুক্ষেত্রের লড়াই শুরু করেছিলেন। এডিটরের নির্দেশে সেই কুরুক্ষেত্রের লড়াই কভার করতে আমি লক্ষ্মী চলে গেলাম। যাবার আগে মেমসাহেবকে জানাতে পারিনি। লক্ষ্মী পেঁচেও প্রথম ছ'দিন সময় পাইনি। তার পরদিন ওকে জানালাম যে, আমি দিল্লীতে নেই, লক্ষ্মী এসেছি।

এক সপ্তাহ লক্ষ্মী থাকায় পর লক্ষ্মীবাসী এক সাংবাদিক বৰু ও একজন এম-পি'র পাল্লায় পড়ে দিল্লী আসার পরিবর্তে চলে গেলাম

ନୈନୀତାଳ । ଠିକ ଛିଲ ଛ'ଦିନ ଥାକବ । କିନ୍ତୁ ଓଦେର ପାଞ୍ଚାଯ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିରିଲାମ ଏକ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଫିରେ ଅନେକଟୁଳୋ ଚିଠି ପେଲାମ । ମେଜଦିର ଚିଠିତେ ଜାନଲାମ ଶ୍ଵାତାଳ ଅଫିସାର କୋଚିନେ ବଦଲୀ ହେବେଣ । ଓଥାନେ ଏଥିନ କୋଯାର୍ଟାର ପାଞ୍ଚାଯା ଥାବେ ନା । ତାଇ ମେଜଦି କଲକାତା ଥାଚେନ । ଇତିମଧ୍ୟେ କୋଯାର୍ଟାର ପେଲେଓ କୋଚିନ୍ ଥାବେନ ନା, ଏକେବାରେ ଆମାଦେର ବିଯେ ଦେଖେ ତବେ ଫିରବେନ । ମନେ ମନେ ଭାବଲାମ ଚମଙ୍କାର ! ଆମି ମେଜଦିକେ ଲିଖିଲାମ, ଛି, ଛି, ଅତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କେଉ କୋ-ଚିନ ଥାଯ ? ଆରୋ ଏହି ଆକଶାଇ ଚୀନେର ବାଜାରେ ? ଏକେବାରେ ଖୋକନକେ ପେରାମୁଲେଟାରେ ଚଢ଼ିଯେ ବଙ୍ଗୋପମାଗରେର ଧାର ଦିଯେ ବେଡ଼ାତେ ବେଡ଼ାତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଚା ଥେଯେ, କୋନାରକେ କଫି ଥେଯେ, ଶ୍ରୀମତୀଟେଇର'ଏ କାଜୁ ଥେଯେ, ମାଝାଜେ ଦୋସା ଥେଯେ, କଟାକୁମାରିକାଯ ଭାରତ ମହାସାଗରେର ଜଳେ ଶୀତାର କେଟେ, ତ୍ରିବାନ୍ଦ୍ରମେ ନାରକେଳ ଥେଯେ କୋ-ଚିନ ଥାବେନ ! କେମନ ? ଦରକାର ହୁଯ ଆମିଇ 'ପେରାମୁଲେଟାର ଦେବ । କାରଣ ପରେ ଓଟା ତୋ ଆମାଦେରଓ କାଜେ ଲାଗବେ, ତାଇ ନା ?

ଖୋକନକେ ଚିଠି ଲେଖାର ଜଣ୍ଠ ମେମସାହେବ ଖୁବ ଖୁଣି ହେବେଛିଲ । ଏ-କଥାଓ ଜାନିଯେଛିଲ ଯେ ଖୋକନର ଏକଟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦିଯେଛେ ।

ଏବାର ଠିକ କରିଲାମ ଛ'ତିନ ଦିନେର ଜଣ୍ଠ କଲକାତା ଥାବ । ଏଡିଟରକେ ଚିଠି ଲିଖେ ଏକ ସଂଗ୍ରହେର ଛୁଟି ନିଲାମ । କଲକାତା ଥାବାର କଥା ମେମସାହେବକେ କିଛୁ ଲିଖିଲାମ ନା । ମେଜଦିକେ ଲିଖିଲାମ, କତକାଳ ଆପନାକେ ଦେଖିନି । ମନେ ହଚ୍ଛେ ଯେନ କତ ଯୁଗେ ଆଗେ ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବେଛିଲ । ଆମି ଆପନାକେ ନା ଦେଖେ ଆର ଥାକତେ ପାରଛି ନା । କାଜକର୍ମେ ମନ ବସଛେ ନା । ରିପୋର୍ଟ ଲିଖିତେ ଗିଯେ ବାର ବାର ଭୁଲ କରାଇ । ମୁଖେ କିଛୁ ଭାଲ ଲାଗଛେ ନା । ଏମନ କି ମଧୁବାଲା-ସୋଫିଯା ଲରେନେର ଫିଲ୍ ଦେଖିତେଓ ଇଚ୍ଛା କରାଇ ନା । ଆମାକେ ମାପ କରବେନ, ତାଇ ଆମି ଆଗାମୀ ମୋମବାର ମକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଲେ କଲକାତା ଥାଚିଛି ଆପନାକେ ଦେଖାର ଜଣ୍ଠ ।

## উলিশ

সেবারের কলকাতা যাওয়া আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। না, না, কোনদিন ভুলব, না। সেবারের কলকাতার স্মৃতি আমার জীবনের সব চাইতে মূল্যবান স্মৃতি। আজ আমার পার্থিব সম্পদ অনেক ভবিষ্যতে হয়ত আরো হবে। লক্ষ লক্ষ মালুষের সঙ্গে আজ আমার পরিচয়। কত ডি-আই-পি-র সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি দেশ-দেশান্তর। তাদের কত মিষ্টি, কত সুন্দর, কত চমকপ্রদ স্মৃতি আমার মনের সেফ ডিপোজিট ভলটে জমা আছে। কিন্তু সেবারের কলকাতা যাওয়ার স্মৃতির সঙ্গে অগ্র কোন স্মৃতির তুলনাই হয় না। একদিন হয়ত আমার সবকিছু হারিয়ে যাবে, হয়ত আমি অতীত দিনের মত একমুষ্টি অন্ধের জন্য, একটা লেখা ছাপিয়ে দশটা টাকা পাবার জন্য আবার কলকাতার রাজপথে ঘুরে বেড়াব। হারাবে না শুধু আমার স্মৃতি, মেমসাহেবের স্মৃতি, সেবারের কলকাতার স্মৃতি।

হাওড়া স্টেশনে মেজদি এসেছিলেন। মেমসাহেবকে না দেখে আমি একটু অবাক হলাম। মেজদিকে কিছু বললাম না। শুধু এদিকে-ওদিকে চাইছিলাম। ভাবছিলাম বোধহয় লুকিয়ে আছে। একটু মুচকি হেসে মেজদি বললেন, এদিক-ওদিক দেখে লাভ নেই। ও আসে নি।

আমি একটু জোরে হেসে বললাম, আরে না, না। ওকে কে খুঁজছে? আমার এক রক্ষুর আসার কথা ছিল। তাই দেখছি এসেছে কিনা।

মেজদি একটু ছাঁট হাসি হেসে বললো, ও আই সী!

প্লাটফর্ম থেকে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে যাবার পথে মেজদি বললেন,  
আজ রাত্তিরে আপনি আমাদের ওখানে থাবেন।

আমি থমকে দাঢ়িয়ে বললাম, সে কি ?

‘মার ছকুম’

‘রিয়েলি ?’

‘তবে কি আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি ?’

মেমসাহেব সেদিন সত্য স্টেশনে আসে নি ; চীফ অফ প্রোটোকল হয়ে মেজদি এসেছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। মেমসাহেবকে না দেখে মনে মনে একটু হতাশাবোধ করলেও আমার সামাজিক মর্যাদায় বেশ গর্ববোধ করেছিলাম।

রাত্রে নেমস্টোন থেতে গিয়েছিলাম। মেমসাহেবের দেওয়া ধূতি পাঞ্জাবী পরে সত্য প্রায় জামাই সঙ্গে শুরুরবাড়ি গিয়েছিলাম। মেমসাহেব আমারই অপেক্ষায় বসেছিল ড্রাইভারে। কিন্তু যেই আমি ‘বাজার’ বাজালাম, ও সঙ্গে সঙ্গে চিকার করে বললো, মেজদি ! দেখত, কে এসেছে। আমি বাইরে দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়েই ওর কথা শুনতে পেলাম। এমন একটা তাব দেখাল যেন ওর কোন গরজ নেই। আসল কথা লজ্জা করছিল।

মেজদি দরজা খুলেই চিকার করলেন, মা ! তোমার ছেট জামাই এসেছেন।

ভিতর থেকে মেমসাহেবের মার গলা শুনতে পেলাম, আঃ চিকার করিস না !

মেজদি ঘর ছেড়ে ভিতরে যাবার সময় ছকুম করে গেলেন, চুপটি করে বসুন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার প্রয়োজন নেই, এক্সুনি পাঠিয়ে দিছি।

মেজদির বিদায়ের প্রায় সঙ্গেই মেমসাহেব এলো। একটু এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে আমার পাশে এসে দাঢ়াল। আমি ওর হাত ধরে পাশ থেকে সামনে নিয়ে এলাম। তারপর হ'হাত দিয়ে

ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে আলতো করে মাথাটা রাখলাম।

ও আমায় মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, আঃ, ছেড়ে দাও। কেউ এসে পড়বে।

আমি ওর কথার কোন জবাব দিলাম না। অমনি করেই ওকে জড়িয়ে ধরে রইলাম।

ও আস্তে আস্তে আমার হাতছ'টো ছাড়িয়ে দিতে দিতে বললো, লস্তুটি ছেড়ে দাও, কেউ দেখে ফেলবে।

আমি এবার ওর হাতছ'টো ধরে মুখের দিকে চাইলাম। বললাম দেখুক না! কি হয়েছে?

ও একটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমার মুখে, কপালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, কেমন আছ?

‘ভাল।’

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেমন আছ?

‘ভাল না।’

‘কেন?’

‘কেন আবার? আমার আর একলা একলা থাকতে একটুও ভাল লাগছে না।’

আমি ওর ফোলা ফোলা গালছ'টো একটু টিপে ধরে বললাম, এইত এসে গেছে। আর তো হ'মাসও বাকি নেই।

সেদিন রাত্রে মেমসাহেবের মা সত্য জামাই-আদর করে খাওয়ালেন। ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে অত আদর-যত্ন পাওয়া কোনদিন অভ্যাস নেই। অত ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাসও কোনদিন ছিল না। আমি কোনটা খেলাম, কোনটা খেলাম না।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে ড্রাইংরুমে বসে বসে যেজদি আর মেমসাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। শেষে মেমসাহেবের

মাকে প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় উনি আমার হাতে একটা পাথর সেটকরা আংটি পরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, একি করছেন ?

‘বিয়ের আগে তো আর তুমি আসছ না। আশীর্বাদ তো বিয়ের আসরেই হবে। তাই এটা থাক।’

আমি আবার আপত্তি করলাম। উনি বললেন, মায়ের আশীর্বাদ না করতে নেই।

আর আপত্তি করলাম না।

পরের দিন মেমসাহেব আর আমি দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার পর আরতি দেখে নৌকায় চড়ে গিয়েছিলাম বেলুড়। পৌষ মাসের সন্ধ্যায় মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল গঙ্গার ‘পর’ দিয়ে। মেমসাহেব আমার পাশ-ঘেঁষে বসে আমার কাঁধে মাথা রাখল।

সেদিন সন্ধ্যায় বিশেষ কথাবার্তা হয় নি আমাদের। আনন্দ-তৃণ্টিতে দ্রুজনেরই মন্টা পূর্ণ হয়েছিল। বেশী কথাবার্তা বলতে কারুরই মন চায় নি।

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি আর এর মধ্যে কলকাতা আসবে না ?

‘না।’

‘একেবারে সেই বিয়ের সময় ?’

‘হ্যাঁ।’

একটু পরে আবার বলেছিল, ‘বিয়ের পর তুমি কিন্তু আমাকে তোমার মনের মতন করে গড়ে নিও। আমি যেন তোমার সব প্রয়োজন মেটাতে পারি।’

‘আমার সব প্রয়োজনের কথাই তো তুমি জান। তাছাড়া তুমিই তো আমাকে গড়ে তুলেছ। স্বতরাং আমি আর তোমাকে কি গড়ে তুলব ?’

‘আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার নিজের মধ্যে গুণ ছিল

বলেই তুমি জীবনে দাঢ়াতে পেরেছ। গুণ না থাকলে কি কেউ কাউকে কিছু করতে পারে?’

আমি বললাম, পারে বৈকি মেমসাহেব। শুধু ইট-কাঠ-সিমেন্ট হলেই তো একটা সুন্দর বাড়ি হয় না। আর্কিটেক্ট চাই, ইঞ্জিনীয়ার চাই, মিস্ট্রী চাই। সোনার তালের দাম ধাকতে পারে কিন্তু তার সৌন্দর্য নেই। ষ্ণৰ্গকারের হাতে সেই সোনা পড়লে কত সুন্দর সুন্দর গহনা হয়।

ওর মুখের পর মুখ রেখে বললাম, মেমসাহেব, তুমি আমার সেই আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী।

ও আমার এসব কথার জবাব না দিয়ে বললো, তুমি আমাকে বড় বেশী তালবাস। তাইতো তুমি আমাকে অক্ষপণভাবে মর্যাদা দিতে চাও। মুখটা ঘূরিয়ে নিয়ে বললো, তাই না ?

‘তোমার মত আমি তো ইউনিভার্সিটিতে পড়িনি। মহুয়া-চরিত্রের অতশ্চত বিশ্লেষণ করতে আমি শিখিনি।’

মেমসাহেব এবার যেন একটু অভিমান করে বললো, ওসব আজেবাজে কথা বলবে না তো ! হাজার হোক তুমি আমার স্বামী। আর তাছাড়া এম-এ পড়লেই কি সবাই পণ্ডিত হয়ে যায় ?

ও নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল, মোটেই না। তোমার জ্ঞান, বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতার কাছে আমি কি দাঢ়াতে পারি ?

দোলাবৌদি, মেমসাহেব শুধু আমাকে তালবাসত না, শ্রদ্ধা করত, ভক্তি করত। সোনায় যেমন একটু পান মিশিয়ে না নিলে গহনা মজবুত হয় না, সেইরকম তালবাসার সঙ্গে একটু শ্রদ্ধা, ভক্তি না মিশলে সে তালবাসাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মেমসাহেব আজ অনেক—অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু যত দূরেই যাক, যেখানেই ধারুক, আমি নিশ্চিত জানি সে আজও আমাকে ভুলতে পারে নি। আমি জানি, সে আজও আমাকে তালবাসে। প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতি আজও তার মনে আছে।

কলকাতায় আরো ক'দিন ছিলাম। এবার সবাইকে বলে  
দিলাম, আসছে ফাস্টনে মেমসাহেবের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। কেউ  
অবাক হলো, কেউ কেউ আবার বললো, আমরা আগেই জানতাম।

আমি কাকুর কোন মন্তব্য গ্রহণ করলাম না। গ্রহণ করব  
কেন? তোমরা কি কেউ আমাকে তালবেসেছ? কেউ কি  
আমার বিপদের দিনে পাশে এসে দাঢ়িয়েছে? কেউ তো একটা  
পয়সা দিয়ে বা এক কাপ চা খাইয়ে উপকার কর নি। স্বতরাং  
তোমাদের আমি থোড়াই কেয়ার করি। যখন যেখানে যার সঙ্গে  
দেখা হয়েছে তাকেই বলেছি, আমার বিয়ে। মেমসাহেবের সঙ্গে।  
কবে? এইত এই ফাস্টনেই। বহুজনকে নেমন্তন্ত্রণ করেছিলাম,  
আসতে হবে কিন্তু। বন্ধুবান্ধবদের বললাম, এবার যদি তোরা দিল্লী  
না আসিস তবে ফাটাফাটি হয়ে যাবে।

বিয়ের আগে আর কলকাতা আসা হবে না তবে বিয়ের কিছু  
কাজও করলাম কলকাতায়। দিল্লীতে ভাল পাঞ্জাবী তৈরী হয় না;  
ভবানীপুরের একটা দোকান থেকে তিন গজ ভাল সিঙ্কের কাপড়  
কিনে শামবাজারে মণ্ডু বাবুর দোকানে পাঞ্জাবী তৈরী করতে দিলাম।  
দিল্লীতে ভাল বাংলা কার্ড পাওয়া যায় না; স্বতরাং কয়েকশ' কার্ড  
কিনলাম। আর? আর কিনেছিলাম সিঙ্ক হাউস দোকান  
থেকে মেমসাহেবের জন্য ছুটো বেনারসী শাড়ি। দিল্লীতে  
বেনারসী পাওয়া যায় কিন্তু বড় বেশী দাম। তাছাড়া ঠিক  
ঝচিসম্মত পাওয়া প্রায় অসম্ভব। শাড়ি ছুটো কেনার সময়  
মেমসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম পছন্দ করবার জন্য। স্বাই  
কলারের বেনারসীটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, ওরও খুব ভাল  
লেগেছিল কিন্তু বার বার বলেছিল, কেন এত দামী শাড়ি কিনছ?

আমি বলেছিলাম, এর চাইতে কম দামের শাড়িতে তোমাকে  
মানাবে না।

ও জ্ঞ কুঁচকে একটু হাসতে হাসতে বলেছিল, তাই নাকি?

‘তবে কি ?’

শাড়ি কিনে দোকান থেকে বেঙ্গবার সময় মেমসাহেব বললো,  
তুমি আমার দেওয়া ধূতি-পাঞ্চাবী পরে বিয়ে করতে আসবে ।

‘সেকি ? আমি তো কাপড় কিনে পাঞ্চাবী তৈরী করতে দিয়ে  
দিয়েছি ।’

‘তা হোক । তুমি আমার দেওয়া ধূতি-পাঞ্চাবী পরে বিয়ে  
করবে ।’

সেন্ট্রাল এভিন্যুর খাদি গ্রামোগোগ থেকে মেমসাহেব আমার  
পাঞ্চাবীর কাপড় কিনে বললো, চল এবার ধূতিটা কিনতে যাই ।

ধূতি কিনতে গিয়ে আমি ওর কানে কানে ফিসফিস করে  
বললাম, প্লেন পাড় দেবে, না, জরি পাড় দেবে ?

আগে কতবার জরি পাড় ধূতি চেয়েছি পাই নি । এবার  
পেলাম । একটা নয়, একজোড়া ।

আমি জানতে চাইলাম, একজোড়া ধূতি পরে বিয়ে করতে  
যাব ?

‘অসভ্যতা করো না ।’ একটু থেমে বললো, তোমার তো মোটে  
হচ্ছে ধূতি । তাই একজোড়াই থাক ।

ধূতি কিনে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,  
তুমি তো আমার বিয়ের কাপড় দিলে, ফুলশয্যার জন্য তো কিছু  
দিলে না ?

ও আমার কথার জবাব না দিয়ে বললো, সেদিন যে তুমি কি  
করবে, তা ভাবতেই আমার গোয় জ্বর আসছে ।

‘তাই নাকি ?’ একটু থেমে আবার বললাম, বেশ, তাহলে শুধু  
বিয়েই হোক, ফুলশয্যার আর দরকার নেই ।

ও একটু বাঁকা চোখে হাসি হাসি মুখে বললো, ভূতের মুখে রাম  
নাম ?

কলকাতায় এমনি করে ক'টা দিন বেশ কেটে গেল । আমার

কলকাতা বাসের মেয়াদ শেষ হলো। দেহটাকে আবার চাপিয়ে  
দিলাম দিলী মেলের কামরায়। মন ? সে পড়ে রইল কলকাতায়।  
মেমসাহেবের কাছে।

দিলীতে ফিরে এসে আবার বেশ কাজকর্মের চাপ পড়ল।  
দশ-বারো দিন প্রায় নিঃখাস ফেলার অবকাশ পেলাম না। সমাগত  
কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য কংগ্রেস পার্টিতে দলাদলি চরম পর্যায়ে  
পেঁচল। কংগ্রেসের ঘরোয়া বিবাদ যত তীব্র থেকে তীব্রতর হলো,  
আমাদের কাজের চাপও তত বেশী বাড়ল।

এদিকে কলকাতার কাগজ পড়ে বেশ বুঝতে পারছিলাম অবস্থা  
স্থিধার নয়। গঙ্গোল শুরু হলো বলে।

মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশন কভার করতে গিয়েই খবর পেলাম,  
কলকাতায় গুলী চলেছে। দু'জন মারা গেছে। বাংলাদেশে,  
বিশেষ করে কলকাতা শহরে এই ধরনের রাজনৈতিক নাটক প্রায়ই  
অভিনীত হয়।

দিলী ফিরে এসে খবর পেলাম ডুয়ার্সে, কুফলগরে, তৃণাপুরে, আর  
বসিরহাটেও গুলী চলেছে। কিছু আহত কিছু নিহত হয়েছে। বেশ  
চিন্তিত হয়ে পড়লাম। না জানি খোকন আবার কি করে। গতবার  
কলকাতায় গিয়ে তো কত বুঝিয়ে এলাম কিন্তু সন্দেহ হলো। ওসব  
কিছুই হ্যাত ওর কানে ঢোকে নি। উপদেশ আর পরামর্শ দিয়ে  
যদি কাজ হতো তাহলে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিভাসাগর-  
বিবেকানন্দ-নেতাজীকে পাওয়া যেত।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের শাস্তি হিমালয় সীমাস্ত আরো অশাস্ত হয়ে  
উঠেছিল। সীমাস্ত নিয়ে অনেক আজগুবী কাহিনী ছাপা হচ্ছিল  
নানা পত্র-পত্রিকায়। স্বাতাবিক ভাবেই সরকার উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন  
এসব খবরে। তাছাড়া পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন এসে  
গিয়েছিল। এই সময় এই ধরনের খবর নিয়মিত ছাপা হলো  
পার্লামেন্টে অথবা খড় বয়ে যাবে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর

সরকার একদল জ্বালিস্টকে লাডাকে নিয়ে ষাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমি হেড কোয়ার্টার্সের ঠিক মত ছিল না ; কারণ, এই তীব্র ঠাণ্ডায় জ্বালিস্টদের লাডাকে নিতে হলে অনেক ঘৰ্ষণ। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারাও রাজী হলেন। দশজন দেশী-বিদেশী সাংবাদিক দলে আমিও স্থান পেলাম।

এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম। মেমসাহেবকে জানলাম, এক সপ্তাহের জন্য লাডাক যাচ্ছি। আমরা হওনা হবো ২রা ফেব্রুয়ারী। এখান থেকে জম্মু যাব। সেখান থেকে উধমপুর, কোর কমাণ্ডারের হেড কোয়ার্টার্স। একদিন উধমপুর থেকে যাব লে'তে। সেখানে একদিন থেকে যাব অপারেশন্টাল এরিয়া ভিজিট করতে। ফিরে এসে আবার একদিন লে'তে থেকে ফিরব দিল্লী।

১৪ই ফেব্রুয়ারী বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী বাজেট পেশ করা হবে। আমি ৪ঠা মার্চ কলকাতা রওনা হবো। বাবা বেনারস থেকে ২রা কি ৩রা কলকাতা পৌছবেন। ৬ই মার্চ বিয়ে হবার পর ৮ই মার্চ ডি-ল্যাক্স এক্সপ্রেস তোমাকে নিয়ে আবার দিল্লী ফিরব। ১৪ই মার্চ আমার ছুটি শেষ হবে। সুতরাং যদি কোথাও বাইরে বেড়াতে যেতে চাও, তাহলে এই ক'দিনের মধ্যেই যুরে আসতে হবে। পার্লামেন্ট শেষ হলে তোমাকে নিয়ে নিশ্চয়ই কোথাও বেড়াতে যাব। কেমন ? মত আছে তো ?

মেমসাহেব লিখল, তোমার চিঠিতে জানলাম, তুমি লাডাক যাচ্ছ। তুমি যখন সাংবাদিক, তখন তোমাকে তো সর্বত্রই যেতে হবে। অনেক সময় বিপদের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে। আমার মুখ চেয়ে নিশ্চয়ই তুমি সব সময় সাবধানে থাকবে। তবে আমি জানি, তোমাকে কোন বিপদ স্পর্শ করতে পারবে না।

তুমি লিখেছ লাডাকে এখন মাইনাস ১০—১২ ডিগ্রী টেম্পারেচার। কলকাতার বাড়ালী হয়ে আমাদের কল্পনাতীত। আমার তো ভাবতেও তয় লাগছে। উলের আগুরউয়ার, প্লোভস,

ক্যাপ ইত্যাদি নিতে ভুলো না। তুমি বালিন থেকে যে ওভারকেট্ট এনেছ, সেটা অতি অবশ্য নেবে। আমি জানি তুমি ভাল থাকবে কিন্তু তবুও চিন্তা তো হবেই। তাই যদি পার লে'তে পৌছবার পর একটা টেলিগ্রাম করো।

শেষে লিখেছিল, ৮ই মার্চ তোমার সঙ্গে দিল্লী যাবার পর ধূঃবেশী বেড়াবার সময় থাকবে কি? তুমি তো প্রায় সবকিছুই গুছিয়ে রেখেছ কিন্তু তবুও নতুন সংসার করার কিছু বামেলা তো থাকবেই। তাছাড়া তোমার ক'দিন বিশ্রাম চাই ত! এইত কংগ্রেস কভার করে ফিরলো। এখন যাচ্ছ লাডাক। ফিরে এসেই পালামেন্ট। তারপর কলকাতায় আসা-যাওয়া বিয়ে-থার জন্য তোমার কি কম পরিশ্রম হবে? সেজন্ত দিল্লী গিয়ে আবার কোথাও যাবার আমার ইচ্ছে নেই।

তোমাকে আর এর মধ্যে দেখতে পাব না। সেই ২০শে ফাল্গুন রাত্রে একেবারে শুভমুহূর্তে তোমাকে দেখব! ভাবতেও ভারী মজা লাগছে। তোমার ভাবতে ভাল লাগছে না?

মেমসাহেবের চিঠি পাবার পরদিনই ভোরবেলায় পালামের এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে এয়ার ফোর্সের এক স্পেশ্যাল প্লেনে আমরা চলে গেলাম জন্ম। সেখান থেকে মোটরে উধমপুর। এক রাত্রি উধমপুরে কাটিয়ে পরদিন তোরবেলায় জন্ম এয়ারপোর্টে এসে শুলাম লে'তে ভীষণ খারাপ আবহাওয়া। প্রতিং ফ্লাইটে একটা প্লেন গিয়েছে। যদি এ প্লেনটা ল্যাণ্ড করতে পারে, তাহলে সেই মেসেজ পাবার পর আমাদের প্লেন ছাড়বে। বেলা আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে আবহাওয়ার উন্নতি না হলে আজ আর যাওয়া হবে না।

সাড়ে আটটা পর্যন্ত কোন মেসেজ এলো না। প্রতিং ফ্লাইটে যে-প্লেনটি গিয়েছিল, সেটি ফেরত এলো নটা নাগাদ। কোর হেড কোয়ার্টার্স থেকে আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে মেসেজ চলে গেল, ব্যাড ওয়েদার এ্যারাউণ্ড লে স্টপ প্রতিং ফ্লাইট ফেল্ড স্টপ প্রেস পার্টি

হেন্ট-আপ। আমিও আমার হেড কোয়ার্টার্সে একটা টেলিগ্রাম করলাম, লে আগুর ব্যাড ওয়েদার, স্টপ নো ফ্লাইট টু-ডে স্টপ।

উধমপুরে একটা অতিরিক্ত রাত্রিবাস ভালই কেটেছিল। দুপুরে একটা চমৎকার লাঙ্ঘ ছাড়াও সন্ধ্যায় আমাদের সশ্বানে একটা কক্ষটেল দিলেন কোর কমাণ্ডার নিজে। পরের দিন তোরে রওনা হবার আগে আমরা ওয়েদার রিপোর্ট চেক-আপ করে জানলাম, লে'র আবহাওয়া ভালই। স্লুতরাং ফাস্ট' সার্ট' ফাস্ট' এয়ারক্রাফটেই আমরা রওনা হয়ে জন্মু থেকে লে এলাম।

লে'তে পৌছবার পর একটু বিশ্রাম করে শহরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মেমসাহেবকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করলাম, রিচড সেকলি।

লাডাকে আসার পর কলকাতার আর কোন খবর পেলাম না। সময়ও হতো না, স্মরণও হতো না। কলকাতার স্টেশন অত্যন্ত উইক। তাছাড়া এত ঠাণ্ডায় ব্যাটারীও ঠিক কাজ করে না। স্লুতরাং রেডিওতেও কলকাতার কোন খবর পেলাম না।

লে'তে একদিন কাটাবার পর আমরা ফরোয়ার্ড এরিয়া দেখতে রওনা হলাম। কোথাও জীপ, কোথাও হেলিকপ্টার। সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম চোদ্দ-পনের হাজার ফুট উপরে হিমালয়ের মরু অঞ্চলে। বিকেল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাটাতাম আমাদের বা অফিসারদের কোন-না-কোন মঙ্গলিয়ান টেক্টে বোথারীর পাশে।

ফরোয়ার্ড এরিয়া ঘুরে লে'তে ফেরার পর জানলাম, গত পাঁচদিন ধরে কোন প্লেন ল্যাঙ্ঘ করে নি। ব্যাড ওয়েদার। আবহাওয়া কবে ভাল হবে, সে-কথা কেউ জানেন না। পরের দিনও ভাল হতে পারে, আবার আট দশদিনের মধ্যেও না হতে পারে। শীতকালে লাডাকের আবহাওয়া এমনিই হয়। চিন্তিত না হয়ে পারলাম না, কিন্তু চিন্তা করেও কোন উপায় ছিল না।

শহরে গিয়ে পোস্টাফিস থেকে মেমসাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম, রিটার্নড ক্রম ফরোয়ার্ড এরিয়াস স্টপ ব্যাড ওয়েদার প্রোগ্রাম আনসার্টেন।

শেষপর্যন্ত এক সপ্তাহের পরিবর্তে, বারো দিন পর আবার পালামের মাটি স্পর্শ করলাম।

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এলাম ওয়েস্টার্ন কোর্ট। রিসেপশন কাউন্টারে আমার ঘরের চাবি ঢাইতেই বললো, ইওর সিস্টার-ইন-ল'...ইজ দেয়ার।

সিস্টার-ইন-ল ?

অবাক হয়ে গেলাম। দিদি ? মেজদি ? কিন্তু ওরা এখন আসবেন কেন ? বেড়াতে ? একটা খবর তো পাওয়া উচিত ছিল। জরুরী কোন কাজে ? লিফট-এ উঠতে উঠতে অনেক কিছু ভাবছিলাম। আবার ভাবলাম বিয়ে নিয়ে কোন গঙ্গোল হলো নাকি ? না, না, তা কেমন করে সন্তুষ্ট !

ঘরে চুকতে গিয়েই মেজদিকে দেখে থমকে গেলাম। হঠাৎ মেজদিকে অমন বিশ্রীভাবে দেখে মনে হলো বোধহয় মেজদিরই চৰম সর্বনাশ হয়ে গেছে। মনটা ব্যথায় ভরে গেল। এইত ক'মাস আগে বিয়ে হলো। এরই মধ্যে...

মেজদি আমাকে দেখেই হাউ-হাউ করে কেঁদে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ওর অপ্রত্যাশিত আগমন এবং ততোধিক অপ্রত্যাশিত কানায় আমি এমন ঘাবড়ে গেলাম যে আমার গলা দিয়ে একটি শব্দও বেরহতে চাইল না। মেজদি আমাকে এই ভাবে জড়িয়ে ধরে কতক্ষণ কেঁদেছিলেন তা আমার মনেনেই। তবে মনে আছে বেশ কিছুক্ষণ বাদে মেজদি হঠাৎ বলে উঠলেন, তুমি কিভাবে একলা একলা বাঁচবে ভাই ?

একলা ? একলা ? আমি ?

আমি এবার মেজদির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেই ওর হৃটো হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, মেমসাহেব কেমন আছে ?

‘মেষসাহেবের নাম শুনে মেজদি আৱ থাকতে পাৱলেন না। আবাৰ আমাকে ছ’হাত দিয়ে বুকেৱ মধ্যে জড়িয়ে ধৰে হাউ-হাউ কৰে কাঁদতে লাগলেন।

‘আমি আৱ সহ কৰতে পাৱলাম না। বেশ কড়া কৰে দাবড় দিয়ে বললাম, কি হয়েছে মেষসাহেবের ?

অস্পষ্ট স্বৰে মেজদি জবাৰ দিলেন, সে আৱ নেই ভাই।

মুহূৰ্তেৰ মধ্যে মনে হলো সারা পৃথিবীটা অঙ্ককাৰে ভৱে গেল। কাৱ যেন অকল্যাণ হাতেৰ ছোঁয়ায় পৃথিবী থেকে সবাৰ প্ৰাণশক্তি হারিয়ে গেল। মনে হলো পায়েৱ নীচেৰ মাটি সৱে যাচ্ছে আৱ আমি পাতালেৰ অতল গহৰে ডুবে যাচ্ছি।

দোলাবৌদি, আমি আৱ দাঢ়াতে পাৱলাম না। পাঁড় মাতালেৰ মত টলে পড়ে গেলাম সোফাৰ ‘পৰ। অত বড় একটা মহা সৰ্বনাশেৰ খবৰ শোনাৰ পৰ আমাৰ কিছু হলো না। মহা আৱামে ঘূমিয়ে পড়লাম। যখন ঘূম ভাঙল তখন দোখ ৱাত হয়ে গেছে আৱ আমাৰ চারপাশে অনেকে ভিড় কৰে দাঢ়িয়ে আছেন। প্ৰথমে আমি কাউকে চিনতে পাৱছিলাম না। খানিকক্ষণ পৱে চিনতে পাৱলাম ডাঃ সেন আমাৰ পাশে বসে আছেন।

আমাৰ মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডাঃ সেন জিজ্ঞাসা কৱলেন, কেমন আছেন ?

ঘূম ভাঙল পৰ ডাঃ সেনকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম বোধহয় বেড়াতে এসেছেন। তাই আমি পাল্টা প্ৰশ্ন কৱলাম, আপনি কেমন আছেন ?

‘আমি ভাল আছি। আপনি ভাল তো ?’

‘বড় ঘূম পাচ্ছি। কাল আসবেন।’ আবাৰ আমি ঘূমিয়ে পড়লাম। পৱেৱ দিন অনেক বেলায় আমাৰ ঘূম ভাঙল। গজানন চা নিয়ে এলো, ফিরিয়ে দিলাম। স্বান কৱতে বললো, কৱলাম

না। গজানন আবার কিছুক্ষণ পরে এসে অনুরোধ করল, আবার ওকে ফিরিয়ে দিলাম। আমি চুপচাপ বসে রইলাম।

এর পর মেজদি এসে অনুরোধ করলেন, নাও ভাই জ্ঞান করে একটু কিছু মুখে দাও।

আমি কোন জবাবই দিলাম না। আরো কিছুক্ষণ এমনি করে বসে ধাকার পর মনে হলো গ্রীনপার্কে মেমসাহেবের সংসারটা দেখে আসি। গজাননকে ডাক দিয়ে বললাম, গাড়ি তৈয়ার করো।

‘কাহা যানা ছোটাসাব?’ খুব মিহি গলায় গজানন জানতে চাইল।

‘গ্রীন পার্ক।’

কিছুক্ষণ বাদে গজানন এসে খবর দিল, গাড়ি তৈয়ার হায় ছোটাসাব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম।

গজানন বললো, এই নোংরা জামাকাপড় পরে বেরুবেন?

‘তবে কি সিক্কের পাঞ্চাবী চাপিয়ে বেরুব?’

একটা চুটি পায় দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেলাম। গজানন দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে পিছনের সীটে বসে পড়ল। মেজদিও নিঃশব্দে আমার পাশে এসে বসল।

সেদিন গাড়ি চালিয়েছিলাম বিহ্যৎ বেগে। কোন স্টপ সিগন্যাল পর্যন্ত মানিনি। গজানন বললো, এত্না তেজ মাত চালাইয়ে। আমি ওর কথার কোন জবাবই দিলাম না। মেজদি বললেন, একটু আস্তে চালাও ভাই, বড় ভয় করে।

‘কিছু ভয় নেই মেজদি। আমরা মরব না।’

সেদিন গ্রীনপার্কের বাসায় গিয়ে প্রথমে থমকে ঢাকিয়েছিলাম। চোখে জল এসেছিল। মুছে নিলাম। সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম, খুব ভাল করে দেখলাম। তারপর ড্রাইভিংমে এসে বুক সেলফ-এর পর থেকে মেমসাহেবের পোত্রেটটা তুলে নিলাম।

‘ব্যস ? আৱ আমি নিজেকে সংযত রাখতে পাৰিনি। হাউ হাউ কৰে, চীৎকাৰ কৰে কাঁদতে লাগলাম। এত ছেটবেলায় মা’কে হারিয়েছিলাম যে চোখের জল ফেলতে পাৰিনি। পৱনবৰ্তীকালে জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক আঘাত পেয়েছি কিন্তু তখনও চোখের জল ফেলাৰ অবকাশ পাই নি। তাইতো সেদিন গ্ৰীনপার্কেৰ বাসায় আমাৰ জমিয়ে রাখা সমস্ত চোখের জল বেৱিয়ে এলো বিনাবাধায়।

মেমসাহেব আমাৰ কাছে ছিল না, কিন্তু আমি হিৱ জানি সে আমাৰ কান্না না শুনে থাকতে পাৰে নি। আমাৰ সমস্ত জীবনেৰ চোখেৰ জলেৰ সব সঞ্চয় সেদিন গ্ৰীষ্ম পোড়ামুৰ্দিৰ জন্ম ঢেলে দিয়েছিলাম, ভবিষ্যতেৰ জন্ম একটা কোঁটাও লুকিয়ে রাখিনি।

মেজদি চুপটি কৰে পাশেৰ সোফায় বসে কেঁদেছিলেন। গজানন দৱজাৰ ধাৰে দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে কেঁদেছিল।

চোখেৰ জল থামলে মেজদিকে জিজাসা কৱলাম, মেমসাহেবেৰ কি হয়েছিল মেজদি ?

আৱ কি হবে ? সেই কলকাতাৰ চিৰস্মৰণ বামেলা আৱ খোকনেৰ বিপ্লব।

পাঁচই ফেৰুয়াৱী। সওয়া-তিনটায় ক্লাস শেষ হবাৰ পৱ মেমসাহেবেৰ কলেজ থেকে বেৱতে বেৱতে প্ৰায় পৌনে চারটে হলো। হাওড়ায় এসে পাঁচ নম্বৰ বাস ধৰল বাড়ি ধাৰাৰ জন্ম। আগেৰ কয়েকদিনেৰ মত সেদিনও বাস ডালহোসী হয়ে গেল না। যাই হোক বাসায় পৌছবাৰ পৱই খোকনেৰ এক ক্লাস ক্ৰেণ্ট বলাই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খৰ দিল, ছোড়দি, খোকনেৰ বুকে গুলী শেগেছে।

মেমসাহেব শুধু চিংকাৰ কৰে জিজাসা কৱেছিল, কোথায় ?

‘এসপ্ল্যানেড ইস্টএ।’

একমুহূৰ্ত নষ্ট কৰে নি মেমসাহেব। ট্যাঙ্গি নিয়ে ছুটেছিল

এসপ্লানেড। প্র্যাণি হোটেলের সামনে ট্যাঙ্গি ধামল। পুলিস  
আর এগুতে দিল না। মেমসাহেব ঔখন থেকে দৌড়ে গিয়েছিল  
এসপ্লানেড ইস্টে। তখন সেখানে কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলছে।  
মেমসাহেবও দৌড়ে দৌড়ে ঘূরে বেড়াচ্ছিল খোকনকে পাবার জন্ম।  
খোকনকে কি পাওয়া যায়? সে তো তখন মেডিক্যাল কলেজ  
হাসপাতালে। মেমসাহেব খোকনকে না পেয়ে পাগল হয়ে  
উঠেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ তার পাগলামি করতে হয় নি। ঐ চৱম  
বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে, টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ার অঙ্ককারের মধ্যে  
ছোট একটা রাইফেলের বুলেট এসে লেগেছিল বুকের মধ্যে।

আর খোকন? তার বুকে বুলেট লাগে নি, পায় লেগেছিল।  
ছোড়দিন মৃত্যু সংবাদে সেও উশ্বাদ হয়ে উঠেছিল। মেডিক্যাল  
কলেজের সমস্ত রোগীর আর্তনাদ ছাপিয়ে খোকনের কাঙ্গা শোনা  
গিয়েছিল।

হৃদিন পরে কলকাতার কাগজগুলো মেমসাহেবের মৃত্যু নিয়ে  
চমৎকার হিউম্যান স্টোরি লিখেছিল। একটা কাগজে মেমসাহেব  
আর খোকনের ছবি পাশাপাশি ছেপেছিল। রিপোর্টটা পড়ে মুরার  
মন খারাপ হয়েছিল। স্কুল-কলেজ, অফিসে, রেস্তোরাঁয়, ট্রাম-  
বাসে, লোক্যাল ট্রেনে সবাই এই স্টোরিটা নিয়ে আলোচনা  
করেছিলেন। পুলিসের লোকজনও পড়েছিল। সবাই ছঃখিত,  
মর্মাহত হয়েছিলেন।

মনে পড়ল অনেকদিন আগে আমি যখন কলকাতায় রিপোর্টারী  
করতাম, তখন আমিও এমনি কত হিউম্যান স্টোরি লিখেছি, পড়েছি  
কিন্তু যেদিন আমার মেমসাহেবকে নিয়ে কলকাতার সব কাগজে  
এত বড় আর এত সুন্দর রিপোর্টটা ছাপা হলো, সেদিন অনেক  
চেষ্টা করেও আমি সে রিপোর্ট পড়তে পারলাম না।

বুকের মধ্যে খবরের কাগজগুলো চেপে জড়িয়ে ধরে শুধু নীরবে  
চোখের জল ফেলেছিলাম।

## কুড়ি

তারপরের ইতিহাস আর কি বলব ? আমার জীবন-মধ্যাছেই  
এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবন-সূর্য চিরকালের জন্য ঘন  
কালো মেঘে ঢাকা পড়বে, কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি । কিন্তু  
কি করব ? ভগবান বোধহয় আমার জীবনটাকে নিয়ে লটারী  
খেলবার জন্তু আমাকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন । জীবনে যা  
কোনদিন কল্পনা করিনি, যা আমার মত অতি সাধারণ ছেলের জীবনে  
হওয়া উচিত ছিল না, আমার জীবনে সেইসব অসম্ভবই সম্ভব  
হয়েছে । যা বহুজনের জীবনে সম্ভব হয়েছে ও হবে, যা আমার  
জীবনেও ঘটতে পারত, ঠিক তাই হলো না ।

কেন, কেন আমার এমন হলো বলতে পার ? কে চেয়েছিল  
জীবনে এই প্রতিষ্ঠা ? অর্থ-যশ-প্রতিপত্তি ? কে চেয়েছিল স্ট্যাণ্ডার্ড  
হেরল্ড ? বছর বছর বিদেশ ভ্রমণ ? আমি তো এসব কিছুই  
চাইনি । তিন-চারশ' টাকা মাইনের সাধারণ রিপোর্টার হয়ে  
মীর্জাপুর বা বৈঠকখানাতেই তো আমি বেশ সুর্খে থাকতে পারতাম ।  
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অশ্রান্ত অনেকের মত আমিও তো পেতে  
পারতাম আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন-সাধনার মানসীকে । আমার  
প্রেয়সীকে, আমার জীবন-দেবতাকে, আমার সেই এক অদ্বিতীয়া  
অনশ্বাকে । ঐ পোড়ামুখী হতভাগী মেয়েটা আমার জীবনে এলে  
কি পৃথিবীর চলা থেমে যেত ? চন্দ্ৰ-সূর্য ওঠা বন্ধ হতো ?

মাঝে মাঝে মনে হয়, কালাপাহাড়ের মত ভগবানের সংসারে  
আগুন জালিয়ে দিই । মনে হয় মন্দির-মসজিদ-গীর্জাগুলো ভেঙে  
চুরমার করে দিই । আমাদের মত অসহায় মানুষের জীবন নিয়ে  
ছিনিমিনি খেলার অধিকার ভগবানকে কে দিল ? মায়ের কোল

থেকে একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নেবার অধিকার কে দিয়েছে ভগবানকে ? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের পাকা ধানে মই দেবার সাহস ভগবানের এলো কোথা থেকে ?

বিশে ফাস্টন, ৬ই মার্চ বিয়ের দিন আমি মেমসাহেবের দেওয়া ধূতি-পাঞ্জাবি পরে গ্রীন পার্কের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর ঐ পোট্টেটা কোলে নিয়ে এইসব আজে-বাজে কথা ভাবতে ভাবতে চোখের জল ফেলেছিলাম সারারাত। চোখের জল মুছতে মুছতে ঐ ফটোয় মালা পরিয়েছিলাম, সিঁদুর দিয়েছিলাম। আর ? আদর করেছিলাম, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিলাম।

শুধু সেই শুভদিনে নয়, তারপর থেকে রোজই আমি গ্রীন পার্কে যাই। কাজকর্ম শেষ করে রোজ সন্ধ্যার পর ওখানে গিয়ে মেমসাহেবের সংসারের তদারকি করি, মেমসাহেবকে আদর করি, সুখ-হৃৎখের কথা বলি। রোজ অস্ত একবার মেমসাহেবের কাছে না গিয়ে থাকতে পারি না। কোন কোনদিন কাজকর্ম শেষ করতে করতে অনেক রাত হয়, ক্লান্ত-আন্ত হয়ে চোখছটো ঘুমে তরে আসে। মনে হয় শয়েস্টার্ন কোর্টেই চলে যাই, শুয়ে পড়ি। কিন্তু কি আশ্চর্য ! গাড়ির স্টিয়ারিংটা ঠিক হেস্টিংস-তুগলক রোডের দিক ঘুরে সফদারজং এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে মেহেরলী রোড ধরে শেষপর্যন্ত গ্রীন পার্কে এসে হাজির হই।

লাদাক থেকে ফিরে এসে মেজদির কাছে যখন আমার চরম সর্বনাশের খবর শুনেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল আর বাঁচব না। প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় সব মানুষের মনেই এই প্রতিক্রিয়া হয়। আমারও হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমারও পরিবর্তন হয়েছে। মেমসাহেব নেই, কিন্তু আমি আছি। আমি মরিনি, মরতে পারিনি। আমি স্বৃষ্টি স্বাভাবিক মানুষের মতই বেঁচে আছি। আমাকে দেখে বাইরের কেউ জানতে পারবে না, বুঝতে পারবে না যে আমার বুকের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দুঃখ-আক্ষেপের হিমালয়

লুকিয়ে আছে। আমার হাসি-ঠাট্টা হৈ-হল্লোড় দেখে কেউ অনুমান পর্যন্ত করতে পারেন না এতবড় একটা বিয়োগান্ত নাটকের আমি হিংরো। আমার মুখে হাসি আছে, কিন্তু মনের বিহ্যৎ, প্রাণের উচ্ছ্বাস, চোখের স্বপ্ন চলে গেছে, চিরকালের জন্ম, চিরদিনের জন্ম চলে গেছে।

জান দোলাবোদি, যতক্ষণ কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ততক্ষণ বেশ থাকি। বুকের ভিতরের যন্ত্রণা ঠিক অনুভব করার অবকাশ পাই না। কিন্তু রাত্রিবেলা? যখন আমি সমস্ত হৃনিয়ার মাঝুষের থেকে বহুদূরে চলে আসি, যখন আমি শুধু আমার স্মৃতির মুখোমুখি হই, তখন আর স্থির থাকতে পারি না। নিজেকে হারিয়ে ফেলি। সমস্ত শাসন অমাঞ্চ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। মেমসাহেবের ফটোটাকে নিয়ে আদর করি, ভালবাসি, কথা বলি। ঘটার পর ঘটা কথা বলি। কত রাত হয়ে যায়, তবু ঘূর্ম আসে না। আর ঘূর্ম এলেও কি শাস্তি আছে? ঐ হতচ্ছাড়ী পোড়ামুর্দি আমাকে একলা একলা ঘূর্মতে দেখলে বোধহয় হিংসায় জলেপুড়ে মরে। আমার ঘূর্ম না ভাঙিয়ে ওর যেন শাস্তি হয় না।

ফীরাক গোরখপুরীর একটা ‘শের’ মনে পড়ছে—

‘নিদ আয়ে, তো খোয়াব আয়ে  
খোয়াব আয়ে, তো তুম আয়ে  
পর তুমহানি ইয়াদ মে  
ন নিদ আয়ে, ন খোয়াব আয়ে।’

চমৎকার! তাই না? ঘূর্ম এলেই স্বপ্ন আসে, স্বপ্ন এলেই তুমি আস কিন্তু যেই তুমি আস তখন না আসে ঘূর্ম, না আসে স্বপ্ন।

ফীরাক গোরখপুরীর জীবনেও বোধহয় আমারই যত কোন বিপর্যয় এসেছিল। তা না হলে এত করুণ, এত সত্য কথা, এত মিষ্টি করে লিখলেন কেমন করে? ফীরাক যা লিখেছেন তা বর্ণে

বর্ণে ক্ষত্য। যেই চোখের পাতাহটো ভারী হয়ে বুজে আসে, সঙ্গে  
সঙ্গে ও পা টিপে টিপে আমার ঘরে ঢুকবে। আমি বুঝতে পেরেও  
পাখি কিরে শুয়ে থাকি। ও আমার কাছে এসে ছমড়ি খেয়ে পড়বে,  
কিন্তু তবুও আমি ওর দিকে ফিরে তাকাই না। হতচাড়ী আমাকে  
আদর করে ভালবেসে ঠোঁটহটোকে শেষ করে দেয়। তারপর  
কিছুক্ষণ আমার বুকের 'পর' মাথা রেখে শোবে, হয়ত বা আমার  
মুখটাকে নিজের বুকের মধ্যে রেখে আমাকে জড়িয়ে শোবে। আর  
চুপ করে থাকতে পারে না। ডাক দেবে, শুনছ?

আমি শুনতে পাই কিন্তু জবাব দিই না। আবার ডাকে, শুগো,  
শুনছ?

আমি হয়ত ছোট্ট জবাব দিই, উঃ।

হাঁত দিয়ে আমাকে টানতে টানতে বলবে, এদিক ফিরবে না?

অস্কুটস্বরে একটা বিচ্ছি আওয়াজ করে আমি এবার চিং হয়ে  
শুই। ও এক টানে আমাকে ওর দিকে শুরিয়ে নেয়। আমি আর  
চুপ করে থাকতে পারি না। ওকে জড়িয়ে ধরি আর যেই দু'চোখ  
ভরে ওকে দেখতে চাই, সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘূম ভেঙে যায়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে  
মেমসাহেব রোজ রাত্রে আমার কাছে এসে ঘুমটা কেড়ে নিচ্ছে।  
আগে আমার কি বিক্রী ঘূম ছিল! বিশ্বরক্ষাণ্ড ওলট-পালট হয়ে  
গেলেও আমার ঘূম তাঁত না। ঘুমের জন্য মেমসাহেব নিজেই কি  
আমাকে কম বকাবকি করেছে? আর আজকাল? ঘন্টার পর  
ঘন্টা বিছানায় গড়াগড়ি করি, কিন্তু ঘূম আসে না। একেবারে  
শেষরাত্রের দিকে ও তোরবেলায় মাত্র দু'তিম ঘন্টার জন্য ঘূমাই।

জীবনটা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সবকিছু থেকেও  
আমার কিছু নেই। ঘর-সংসার থেকেও সংসারী হতে পারলাম না।  
তাছাড়া সংসারের জন্য কম করলাম না। স্বল্প স্বীকৃতি পরিবারের  
জন্য যা কিছু দরকার, তা সবই আমার গ্রীন পার্কের বাড়িতে আছে।

‘যখন যেখানে গেছি, সেখান থেকেই মেমসাহেবের জন্ত কিছু না কিছু এনে গ্রীন পার্কের বাড়িতে জমা করেছি। সোফা-কার্পেট-ফিজ থেকে শুরু করে রেডিও-ট্রানজিস্টার-চেপরেকর্ডার পর্যন্ত আছে। মেমসাহেবের তো খুব চুল ছিল, তাই একবার ওকে বলেছিলাম, তোমাকে একটা হেয়ার-ড্রায়ার দেব। বেডরুমের শুয়াড্রবের মীচের তাকে দেখবে আমি ওর জন্ত হেয়ার-ড্রায়ারও এনেছি। ওর খুব ইচ্ছে ছিল ও অগ্রান বাজিয়ে গান গাইবে। বছর-হই আগে জার্মান এস্বাসীর ফাস্ট’ সেক্রেটারী দিল্লী থেকে বদলী হবার সময় শুদ্ধের অর্গানিটা আমি কিনে নিই। - ড্রাইংরুমের ডানদিকে কোনায় অর্গানিটা রেখেছি। অর্গানের এক পাশে মেমসাহেবের একটা ছবি আর গীতবিতান। ডানদিকে চেক্ কাট-গ্লাসের একটা ফ্লাওয়ার-ভাস-এ ফুল রেখে দিই।

‘মেমসাহেবের স্বপ্ন দেখার কোন সীমা ছিল না।...‘ওগো, তুমি আমাকে একটা রকিং চেয়ার কিনে দেবে। শীতকালের ছপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া করে বারান্দায় রোদ্দুরের মধ্যে রকিং চেয়ারে বসে বসে ছলতে ছলতে আমি তোমার লেখা বই পড়ব।’...কবে আমি বই লিখব আর কবে ও আমার বই পড়বে, তা জানি না। তবে গ্রীন পার্কের বাড়ির সামনের বারান্দায় রকিং চেয়ার রেখেছি। শীতকালের ছপুরবেলা গ্রীন পার্ক গেলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, মেমসাহেব ওর লম্বা লম্বা চুলগুলো খুলে দিয়ে রকিং চেয়ারে ছলে ছলে আমার লেখা বই পড়ছে। ড্রাইংরুমে চুকলে মনে হয় অর্গান বাজিয়ে মেমসাহেব গান গাইছে, জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঢ়ায়ে।

আর কি লিখব দোলাবৌদি? আমি আর পারছি না। এসব কথা লিখতে আমার হাতটা পর্যন্ত অবশ হয়ে আসে। আমি ভাবতে পারি না মেমসাহেব নেই। রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে গিয়ে দূর থেকে একটু ময়লা, একটু টানা-টানা চোখের বিরাট খেঁপাওয়ালা

মেঝে দেখলেই মনে হয়, এই বুবি মেমসাহেবে। প্রায় ছুটে যাই তার পাশে। কোথায় পাব মেমসাহেবকে? ও এমন আড়াল দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে যে সারাজীবন আমি চোর হয়ে উকে খুঁজে বেড়াব কিন্তু পাব না। আমি খালি অবাক হয়ে ভাবি আমাকে এত কষ্ট দিয়ে ওর কি লাভ? ওর কি একটু দুঃখ হয় না? আমাকে একটু দেখা দিলে কি আমি ওকে গিলে খেতাম? আজ আর আমি কিছুই চাই না। শুধু মাঝে মাঝে ওকে একটু দেখতে চাই, দেখতে চাই ওর সেই ঘন কালো টানা টানা গভীর ছুটো চোখ, এই বিরাট খোপাটা, এই একটু হাসি। আর? আর কি চাইব? চাইলেই কি পাব? পাব কি আমার কপালে ওর একটু হাতের ছোঁয়া? আমি তাবতে পারি না ওকে আর কোনদিন দেখতেও পার না।

একসঙ্গে বেশীদিন আমি দিল্লীতে টিকতে পারি না। বছরে আটবার-দশবার ছুটে যাই কলকাতায়। ওর-আমার শুভি-জড়ান রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। সকালবেলায় রাসবিহারীর মোড়ে লেডিজ ট্রামটার জগ্য আর বিকেলবেলা এ্যাসেমলী হাউসের কোণে বা হাইকোর্টের ঐ ধারের রেস্টুরেন্টে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। ওকে দেখতে পাই না কিন্তু ওর ছায়া দেখতে পাই।

আরো কত কি করি! যেখানে যেখানে মেমসাহেবের শৃঙ্খল লুকিয়ে আছে, আমি সময় পেলেই সেখানে ছুটে যাই। ডায়মণ্ড-হারবার—কাকড়ীপ থেকে শুরু করে দার্জিলিং-এর পাহাড়ে, পুরীর সমুদ্রপাড়ে, জয়পুরের রাস্তায়, সিলিসেরের লেকের ধারে ছুটে যাই। বিনিময়ে? বিনিময়ে শুধু চোখের জল আর পাঁজর-কাঁপানো দীর্ঘনিঃখাস! ব্যস, আবার কি?

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ভুল, আমি মিথ্যা, আমি ছায়া, আমি অব্যয়! মনে হয় এমন করে নিজেকে বঞ্চনা করে কি লাভ? মেমসাহেব যদি আমাকে ঠকিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, তবে আমিই

বা তাকে মনে রাখব কেন? হতচাড়ীকে ভুলব বলে হোয়াইট হর্স বা ভ্যাট-সি আর্টিনাইনের বোতল নিয়ে বসে ঢক-ঢক করে গিলেছি। গিলতে গিলতে বুক-পেট জলে উঠেছেও আমি ব্রাতারিক থাকতে পারিনি, কিন্তু তবুও ওর হাসি, ওর গ্রি ছটো চোখ আমার সামনে থেকে সরে যায় নি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি লস্পট, বদমাইস, হুশরিত হবো; যথন যেখানে যে-মেয়ে পাব, তখন তাকে নিয়েই স্ফূর্তি করব, মজা করব, আনন্দ উপভোগ করব। মনে করেছি রক্তমাংসের এই দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলব। পারিনি দোলাবৌদি, পারিনি। স্মৃযোগ-স্মৃবিধা পেলেও পারিনি। সফিস্টিকেটেড সোসাইটির কত মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। কতজনের সঙ্গে আমি ঘুরে বেড়াই, সিনেমায় যাই, হোটেলে যাই, ক্লোর শো'তে যাই। কখনো কখনো বাইরেও বেড়াতে যাই। রক্ত-মাংসের একটু-আধটু ছেঁয়াছুইতে ওদের অনেকেরই জাত যায় না, তা আমি জানি কিন্তু পারি না। মনে হয় মেমসাহেবে পাশে দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে ঘূঢ়কি ঘূঢ়কি হাসছে।

মেমসাহেবকে ভুলি কি করে? ওকে ভুলতে হলে নিজেকেও ভুলতে হয়, ভুলতে হয় আমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কিন্তু সে কি সম্ভব? আমি যদি উন্মাদ না হই, তাহলে তা কি করে হবে? আমার জীবনের অমাবস্যার অঙ্ককারে ওর দেখা পেয়েছিলাম। কৃষ্ণক্ষের দীর্ঘ পথযাত্রায় ও আমার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। কিন্তু পূর্ণিমার আলোয় ওকে পাবার আগেই ও পালিয়ে গেল। ও আমাকে সবকিছু দিয়েছে। কর্মজীবনে সাফল্য, সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা, প্রাণভরা ভালবাসা—সবকিছু দিয়েছে। নিজে কিছুই তোগ করল না, কিছুরই ভাগ নিল না। সবকিছু রেখে গেল, নিয়ে গেছে শুধু আমার হংপিণ্টা।

এই বিরাট ছনিয়ায় কত বিচ্ছি আকর্ষণ ছড়িয়ে রয়েছে। মাছুমের মনকে প্রলুক করার জন্য সম্পদ-সম্ভোগের বশ্যা বয়ে যাচ্ছে

দেশে দেশে। কত নারী, কত পুরুষ তা উপভোগ করছে। আমার জীবনেও সে স্মরণ এসেছে বার বার, বহুবার। স্বদেশে, বিদেশে সর্বত্র। কিন্তু পারিনি। মনের মধ্যে এমন জমাট-বাঁধা কাম্লা জমে আছে যে, আনন্দে-বাসনের কাছে গেলে আমি আতকে উঠি। দিল্লী, বোম্বে, কলকাতায় কত রসের মেলা বসে রোজ সন্ধ্যাবেলায়। কত বঙ্গু-বাঙ্গুর ও বাঙ্গুবী সাদর আমন্ত্রণ জানান সে-উৎসবে, সে-রসের মেলায় অংশ নিতে। হয়ত সেসব উৎসবে উপস্থিত থাকি, হয়ত ঠোটের কোনায় একটু শুকনো হাসির রেখা ফুটিয়ে কাকলী রায় বা অনিমা মেত্রকে আর এক গেলাস শ্যাম্পেন বা ছইস্কি এগিয়ে দিই কিন্তু মেতে উঠতে পারি না ওদের মত। শুধু এখানে কেন? লগুন, প্যারিস, নিউ ইয়র্কে? ওখানে তো সন্ধ্যার পর মাঝুষ মাটিতে থেকেও অমরাবতী-অলকানন্দায় বিচরণ করে। পরিচিত-পরিচিতার দল আমাকে হোটেল থেকে টেনে নিয়ে যায়, একলা থাকতে দেয় না। কিন্তু পারি কি ওদের মত অমরামতী-অলকানন্দায় উড়ে যেতে? পারি কি নিজেকে ভুলে যেতে? পারি না দোলাবৌদি, পারি না। সব সময় মনে হয় মেমসাহেব থাকলে কত মজা হতো!

ওর কত ইচ্ছা ছিল আমার সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরবে। যখন ও আমার কাছে ছিল, তখন ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য আমার ছিল না। অকর্মণ্য বেকার সাংবাদিক হয়ে ওকে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় বেরুতেও ভয় পেতাম, লোকলজ্জায় পিছিয়ে যেতাম। আজ? আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আজ ঐ চিরপরিচিত কলকাতার রাজপথে আমি যে-কোন মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি। আমি জানি কেউ আমার সমালোচনা করবে না বা করলেও সে বিশ্ব-নিন্দুকদের আমি তয় করি না। কিন্তু আজ কোথায় পাব আমার মেমসাহেবকে? যে কলকাতার রাজপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছজনে স্বপ্ন দেখেছি ভবিষ্যৎ জীবনের, আজ আমি সেই পথ দিয়েই একা একা ঘুরে বেড়াই। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা

থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াই । . ক্লান্ত হলে এক কাপ চা  
বা এক পেগ ছাইকি নিয়ে বসে পড়ি, কিন্তু মেমসাহেবের স্মৃতি-  
বিজড়িত পথের আকর্ষণ কাটিয়ে ঘরে ফিরতে পারি না । ভাবি,  
নিম্নজ্ঞতাবে পথ চলতে গিয়েই একদিন মেমসাহেবের দেখা  
পেয়েছিলাম ডিডের মধ্য ওকে হারিয়ে ফেলেছি । হয়ত পথে  
পথে ঘুরতে ঘুরতেই আবার ওর দেখা পাব । আমি জানি এই  
পৃথিবীতে আর একটা মেমসাহেব পাওয়া অসম্ভব । যদিও বা  
সবকিছুর মিল খুঁজে পাই, ওর গ্রি অপারেশনের চিহ্ন তো পাব না ।

মেমসাহেবকে পেয়ে বোধহয় মনে মনে বড় বেশি অঙ্গকার  
হয়েছিল । বোধহয় সেই তরুণ প্রেমিকের মত ভেবেছিলাম—

‘জিন্দি পর ইনকিলাব আনে দে  
কম্বিনী পর শরাব আনে দে  
এ খুদা, তেরী খুদাই পলট ছঙ্গা  
জরা লব তক শরাব আনে দে ।  
মরনে আর জিনে কা ফয়সালা হোগা  
জরা উন্কা জবাব আনে দে ।’

হয়ত সেই তরুণ প্রেমিকের মত ভেবেছিলাম, আমার হৃদয়ে  
বিপ্লব আশুক, আমার গ্রি প্রাক-ঘূর্বতীর যৌবন আশুক, ওর ঠোঁটে  
ভালবাসা আশুক; তারপর ভগবানের ভগবানত ঘুচিয়ে দেব । ওর  
দেহে এই বিবর্তন আসার পর একবার বাঁচা-মরার ফয়সালা করে  
ছাড়ব ।

আমিও বোধহয় এমনি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, মেমসাহেবকে  
পাবার পর সারা হনিয়াটাকে একবার মজা দেখাব । আজ আমার  
পাশে মেমসাহেব থাকলে হজনে মিলে হয়ত সত্যি অনেক অসম্ভবকে  
সম্ভব করতাম । ভগবান নিজের মাতবরী বজায় রাখবার জন্য  
আমাদের সে-স্মর্যোগ দিলেন না । হিংসুটে ভগবান কেড়ে নিলেন  
মেমসাহেবকে । হতচাঢ়া ভগবান যদি আমাদের মত রঞ্জ-মাংসের

ତୈରୀ ହତେଲ, ତାହଲେ ଅନୁଭବ କରିଲେ ଆମାଦେର ଜାଳା-ଯଞ୍ଚଗା । କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାଗ ପାଥରେର ଏଣ୍ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍ଗୋ କି କରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆମାଦେର ସୁଖ-ତୁଃଖ, ହାସି-କାହା, ଜାଳା-ଯଞ୍ଚଗାର କଥା । ମାନୁଷେର ମନେର କଥା ବୁଝିବେ ନା ସଲେଇ ତୋ ଓ ପାଥରେର ମୂର୍ତ୍ତି ହୟେ ଆମାଦେର ଉପହାସ କରଛେ, ବିଜ୍ଞପ କରଛେ ।

କାଜକର୍ମ, ଦାୟିତ୍ୱ-କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥେକେ ଏକଟୁ ମୁକ୍ତି ପେଯେ ଏକଟୁ ଏକଳା ହଲେଇ ଏଇସବ ଆଜେବାଜେ ଚିନ୍ତା କରି । ମାବେ ମାବେ ସନ୍ଦେହ ହୟ, ହୟତ ମେମସାହେବକେ ନିଯେ ଅତ ଆନନ୍ଦ କରା ଆମାର ଉଚିତ ହୟ ନି । ଭଗବାନେର ବ୍ୟାକେ ଆମାର ଅନୁଷ୍ଟେଯେ-ପରିମାଣ ଆନନ୍ଦ ଜମା ଛିଲ, ଆମି ବୋଧହୟ ତାର ଚାଟିତେ ଅନେକ, ଅନେକ ବେଶ ଆନନ୍ଦେର ଚେକ କେଟେଛିଲାମ । ତାଇ ବୋଧହୟ ଏଥିନ ସାରାଜୀବନ ଧରେ ଚୋଥେର ଜଳେର ଇନ୍‌ସ୍ଟଲମେଟ ଦିଯେ ସେ ଦେନା ଶୋଧ କରତେ ହବେ । ଆବାର କଥନା କଥନ ମନେ ମନେ ସନ୍ଦେହ ହୟ ସେ, ଶ୍ରାମବାଜାରେର ମୋଡେ ଯେମନ ଫିରିପୋ ବା ଗ୍ର୍ୟାଣ୍-ଗ୍ରେଟେଇନ୍‌ଟାର୍ ହୋଟେଲ ମାନାଯ ନା, ଏସପ୍ଲାନେଡେର ମୋଡେ ଯେମନ ଛାନାର ଦୋକାନ ବେମାନାନ ହୟ, ତେମନି ଆମାର ପାଶେ ବୋଧହୟ ମେମସାହେବକେ ମାନାତ ନା । ଆଇ ଏକ ଏସ ବା ଆଇ ଏ ଏସ ବା ଟପ ମାର୍କେଟାଇଲ ଏକ୍‌ସିକିଉଟିଭେର ପାଶେ ଓକେ ଯେମନ ମାନାତ, ତେମନି କି ଆମାର ପାଶେ ସନ୍ତ୍ଵନ ହତୋ ? କିନ୍ତୁ ତାଇ ସଦି ହୟ, ତାହଲେ ତଗବାନ ଆମାର ଜୀବନେ ଓକେ ଆନନ୍ଦେନ କେନ ? କି ପ୍ରୋଜମ ଛିଲ ଏହି ରସିକତାର ?

ଏସବ କଥା ଭାବତେ ଗେଲେ ଆମି ଆର ନିଜେକେ ସାମଲାତେ ପାରି ନା । ମାଥାଟା ଘିମଘିମ କରେ, ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଅସହ ବ୍ୟଥା କରେ, ହାତ-ପା ଅବଶ ହୟେ ଆସେ । ମାବେ ମାବେ ଭାବି ଓ ହତଛାଡ଼ି ପୋଡ଼ାମୁଢ଼ିର କଥା ଆର ଭାବବ ନା, ଆର କୋନଦିନ ମନେ କରବ ନା ଓର ଶୁଣି । ଓର ଶୁଣିକେ ଭୁଲବାର ଜଣ୍ଠି ହୟତ ଛାଟ-ଏକଟି ବାନ୍ଧବୀର ସଙ୍ଗେ ଏକଟୁ ବେଶୀ ମେଲାମେଶା, ଏକଟୁ ବେଶୀ ମାତାମାତି କରେଛି କଥନା କଥନ । କିନ୍ତୁ ଏକ ପା ଏଗିଯେ ତିନ ପା ପିଛିଯେ ଏସେଛି । ଅନ୍ତ କୋନ ମେଯେର

সংক্ষেপে অমুসার অবিষ্টভা হেমসাহেব সহ করতে পার্বত্যনা। মন্তব্য  
অন্ধেয়া; তুমি অজ্ঞ কোন মেয়ের সঙ্গে বিশেষ হেমামেধা করো না।

‘আমি পরিজ্ঞান করতাম, কেন? আমি কি হারিতে থাইছি?  
‘তা জানি না; তবে আমার বড় কষ্ট হয়।’

‘সেই স্মৃতি, সেই কথা, হেমসাহেবের সেই মুখ্যানন্দ। কেবল অনেক  
পটে, সঙ্গে সঙ্গে আমি পালিয়ে আসি এসব বাক্ষবীর কাছে থেকে।  
তাহুড়া ও অন্ধি অন্ত ছেলেদের সঙ্গে একটু হাসি-ঠাট্টা বা গল্প-গুজৰ  
করত, তাইলে আমিও তো সহ করতে পারতাম না। সেবার  
দাঙ্কিঙ্গ-এ গিয়ে ও যখন আধুনিক কথা বলে ঘটা-হচ্ছি ধরে  
ইউনিভার্সিটির পুরান বঙ্গ-বাঙ্গবদের সঙ্গে আড়তা দিয়ে হোটেলে  
ফিরে এলো, তখন ওকে আমি কি ভৌবণ বকেছিলাম। ইতুবার  
অজ্ঞ আমার কি অধিকার আছে বনানী, চল্লাবলী বা অন্য কোন  
মেয়ের সঙ্গে ব্যতত্ত বিচরণ করবার? আমি যে অধিকার ওকে  
দিতে পারিনি, সে অধিকার আমি উপভোগ করি কোন মুখে?’

‘জাইতো ওঁদের সঙ্গীর কাছ থেকে, পালিয়ে আসি। পালিয়ে  
আসি গীৰ পার্কে। মেমসাহেবের সংসারে। ওৱ বিজে হাতে মাগান  
কাঠাপা গাছে একটু জল দিই, বারান্দায় ডেকচেয়ারটাকে ঠিক  
করে রাখি। ড্রাইংরুমে গিয়ে অর্গানিটাকে একটু পরিষ্কার করি,  
হেমসাহেবের পোত্তেটা একটু বাঁকা করে ঘূরিয়ে রেখে ওৱ মুখোযুথি  
বসে থাকি।’

আগে তাবত্য কাঙ্ককর্ম শেব করে বাঢ়িতে ফিরে এসে ঘটার  
পর ঘটা গান শুনব। তাবত্য, ছটো-একটা গান শোনাবার পর  
ও বলবে, সারাদিন বাদে বাঢ়ি ফিরলে। আগে স্বান করে  
খাঙ্গু-দাঙ্গু সেবে নাও। তারপর আবার গান শোনাব।

‘আগে তুমি গান শোনাও। পরে স্বান করব।’

‘অস্মীতি, আগে খাওয়া-দাওয়া সেবে নাও, পরে গান শুনো।  
খাওয়া-দাওয়ায় এত অমিয়ম করো। না।’









